কেশবলাল ঘোষ

মহাত্মা ও মানবতাবাদ

মহাত্মা ও মানবতাবাদ

কেশবলাল ঘোষ

প্রকাশক : অধ্যাপক কল্লোলশঙ্কর ঘোষ
কামিনী কুটীর
৪৪/৩৬, বি টি. রোড, কলিকাতা-৫০

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০

পরিবেশক : **কল্লোল প্রকাশনী**
এ ১৩৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : প্রিন্টস্মিথ :
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
১১৬, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

মূল্য : ছয় টাকা

সূচীপত্র

———

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশকের নিবেদন

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতাব্দী বর্ষের জন্য লেখা **মহাত্মা ও মানবতাবাদ** প্রকাশে কিছু বিলম্ব হল। ছাপাখানা ও অন্যান্য গোলমালের জন্য তা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তবে আক্ষেপের কথা হল গ্রন্থখানির কোথাও কোথাও কিছু কিছু অংশ বাদ পড়ে গিয়েছে তা অবশ্য সামান্য কিন্তু কোথাও কোথাও যে ভুল রয়েছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রতিবেদন

পঞ্চাশ বছর পূর্বে গান্ধী একটি নাম অতি অস্পষ্টভাবে কানে এসে ঠেকেছে কিন্তু তাঁর কাজ অপেক্ষাও নামটি অদ্ভুত যে লেগেছে তাই আবছা আবছা মনে পড়ছে। তারপর ১৯২০ সালে আগষ্টমাসে তিলকের নাম প্রথম শুনলাম। তাঁর মৃত্যুতে ছুটি দেওয়া হল না। লোকমান্য তিলক সম্পর্কে কিছুই জানিনা তখনও কিন্তু সবার সঙ্গে ছুটির দাবী করলাম। ছুটি দিল না বলে স্কুল হতে বের হয়ে গিয়ে সভা করলাম। এরপর ১৯২১ সালে বর্ষাকালে মহাত্মা গান্ধীর নাম আবার শুনলাম ; তিনি মৌলানা মহম্মদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছেন। ফেণীতে লক্ষ লোক এসে জড়ো হয়েছে দুদিন ধরে। কিন্তু রেল কতৃ‍র্পক্ষ জানালেন মহাত্মা গান্ধীর ট্রেন ফেণীতে থামবে না। যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছে, আমি ছিলাম তার অন্যতম। ক্যাপ্টেনের হুকুমে সবাই রেললাইনের উপর বসে পড়লাম। কর্তৃপক্ষ ট্রেন থামাবেন বলে জানালে রেললাইন হতে আমরা সরে এলাম। ফেণী ষ্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াল। নির্মিত মঞ্চের দিকে মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা মহম্মদ আলীকে নিয়ে যাওয়া হল। গাড়ী থেকে মঞ্চে যেতে যে জায়গার ওপর দিয়ে তাঁরা হেঁটে গেলেন সেখানকার ধুলোমাটি তুলে লোকরা কপালে দিতে লাগলেন। তাঁদের দুজনকেই প্রণাম করতে পারলাম বলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম। গান্ধীজির মাথায় টুপি, গায়ে সার্ট জাতীয় কিছু এবং পরনে কোঁচাহীন কাছা দেওয়া ছোট ধুতি।

কিছু পরে স্কুলে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছি। কংগ্রেস অফিস এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বাসস্থান—যার নাম তখনকার দিনে ছিল স্বরাজ আশ্রম, সেখানে ঘুরাফেরা করছি। সভায় বক্তৃতা করছি। মঞ্চের উপর যে টেবিল থাকত তার ওপর আমাকে তুলে দেওয়া হত আর আমি অন্য বয়স্ক কংগ্রেসকর্মীদের বক্তৃতা শুনে যা শিখেছিলাম তাই বলতে থাকতাম। এ প্রকার এক সভায় আমার পিতৃদেব স্বর্গত কামিনী কুমার ঘোষ কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, 'বাছুর যদি ছুটে যায় তবে গাভী থাকতে পারে না।' দরিদ্র শিক্ষক, চাকুরী ছেড়ে

দিয়ে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। তারপর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা নিয়ে গিয়ে নাটেশ্বর গ্রামে বয়ন শিক্ষালয় করলেন। চরকা প্রচারে লেগে গেলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ভাঁটার পর আমার শিক্ষা সম্পর্কে পিতৃদেবের উদ্বেগ বাড়লো। তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন। আমাকে আর গোলামখানায় পাঠাবেন না বলে স্থির করলেন। আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছি। শোভাযাত্রায় যোগ দিচ্ছি। কংগ্রেস ডাক ব্যবস্থা করেছে, ডাকের চিঠি বিলি করছি। সালিশী আদালতের সমন জারী করছি। আবার বস্ত্র বয়ন শিখছি। কিছুকাল এ অবস্থা চলছে। এরপর বাবা আমাকে নিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গেলেন। প্রথমে সেখানকার তাঁতের স্কুলের শিক্ষক, পরে স্কুলেও ভর্তি হলাম। এর ভিতর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। কিন্তু গান্ধীজির আবির্ভাবে তখন সারা দেশে প্লাবন এসে গিয়েছে। সাধারণ লোক গান্ধীজিকে দেবতা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। হিন্দুরা কল্কি অবতার আর মুসলমানরা ইমাম মেহেদী বলে বিশ্বাস করে প্রচার করতেন। বেল পাতাতে একপ্রকার পোকার সাদা দাগ পড়ল। মৌলবীরা সাফ বলে দিলেন, ওটা মহাত্মা গান্ধীর স্বাক্ষর। 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়'। গান্ধীজি, আলীভাই, দেশবন্ধু দাশ সারা দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন।

মাত্র যৌবনে পৌঁছেছি। এ সময় কুমিল্লায় অনুশীলন সমিতির এক সদস্যের সঙ্গে পরিচয় হল; বৈপ্লবিক আন্দোলনে মাদকতা আছে। অনুশীলন দলের প্রভাব আমার উপর এসে পড়ছে। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে খুব আহত হলাম। তারপর ১৯২৫ সালে গান্ধীজি বাংলায় সফরে এসেছেন। নোয়াখালীতে পৌঁছলেন। গান্ধীজির কাছে ছাত্রদের এক প্রতিনিধি দল গিয়েছিল। আমিও সে সঙ্গে ছিলাম, কি কথা হয়েছে মনে নেই। তবে দেখলাম তাঁর পরনে লজ্জা নিবারণ উপযোগী একখানা গামছার মত খদ্দরের শুভ্র বস্ত্র। অপূর্ব হাসিতে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। গান্ধীজির আগমনে লক্ষ লোকের সভায় শ্বেতাঙ্গ জেলা জজ যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনি সারা জেলার দূরবর্তী গ্রাম থেকে মাঠ ছেড়ে চাষী এসেছিল—এ দৃশ্য দেখেছি।

আমি তখনও বাত্যাপীড়িতদের জন্য কাজ করছি সর্বত্যাগী কর্মী স্বর্গত হারাণ চন্দ্র ঘোষচৌধুরির সঙ্গে। তারপর কিছুদিন খাদি প্রতিষ্ঠানে ঢুকে খাদি প্রচার করতে থাকি। এ সময় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির (A.B.S.A.) প্রেরণায়

নোয়াখালি জেলা ছাত্র সমিতি গঠিত হয়। আমি তিন বৎসর সম্পাদকের কাজ করবার পর সভাপতি নির্বাচিত হই, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে জেল হতে মুক্তি পাবার পর। প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হলে স্বর্গত হরদয়াল নাগ সহ বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করে বেড়াই এবং ছাত্রদের আন্দোলনে নিয়ে আসবার চেষ্টায় থাকি। দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পেশোয়ার দিবস উপলক্ষে আবার জনসভায় মুখ খোলার অপরাধে কারাগারে যাই। এ সময় আমার কলেজ জীবনের অবসান হয়। ছাত্রসমিতি বে-আইনী। কলকাতায় এলাম প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। গ্রেপ্তার হলাম, ছাড়া পেয়ে এখানেই কাজে লেগে গেলাম।

১৯৩২ সালের শেষভাগ হতে ১৯৬৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় সহ-সম্পাদক. পরে মুখ্য সহ-সম্পাদক রূপে কাজ করি। ১৯৩৪ সালে পাটনাতে পরে ভদ্রকে গান্ধীজির সান্নিধ্যে যাই। তাছাড়া কলকাতায়ও তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ হয়েছিল। আমি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তখন কিছুটা আসক্ত হয়ে পড়েছি। আমার সম্পাদকীয় বিভাগের সহকর্মীরা তা জানতেন বলে আমার উপর গান্ধীজির বক্তৃতা ও বিবৃতির অনুবাদের কাজটা চাপিয়ে দেওয়ায় একটা ঝোঁক থাকত। গান্ধীজির বক্তব্য ভাবের ব্যঞ্জনায় অপূর্ব এবং বাইবেলের ধরনের ইংরেজি ভাষায় সমৃদ্ধ। পড়তে খুব ভালো লাগত কিন্তু ভাবকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে অনুবাদ করতে খুবই কষ্ট হত। যারবেদা জেল হতে হরিজনদের সম্পর্কে যে সকল বিবৃতি ছাড়তেন তা রাত্রি দুটোর এদিকে আসতো না। অল্প সময়ের মধ্যে দৈনিক কাগজের জন্য তা বঙ্গানুবাদ করতে সহ-সম্পাদকরা হিমসিম খেয়ে যেতেন। এভাবে গান্ধীজির লেখনশৈলীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তারপর শ্রীসতীশ চন্দ্র দাশগুপ্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী কিছুকাল বাংলা হরিজনের জন্য তর্জমা করি। আমার অলক্ষ্যে গান্ধীজির ভাব আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। গোয়েন্দা পুলিশের টানাহেঁচড়ায় আমি তখন খুবই বিব্রত বোধ করতাম।

১৯৩৬ সালে এক বক্তৃতার জন্য আমি রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাদণ্ডিত হই। আগষ্ট বিপ্লবের কালেও দীর্ঘকাল আটক ছিলাম। সে সময় বিভিন্ন বিষয় সহ মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে আমার পড়াশুনা করার সুযোগ হয়। এ সময়ই আমি মানুষের প্রবণতা বা এষণা সম্পর্কে গভীর ভাবে বিচার সুরু করি

এবং প্রাণৈষণা (Struggle instinct) অন্নৈষণা (Nutrition instinct), যৌন এষণা (Sexual instinct) এবং মাতৃ এষণা (Maternal instinct) সম্পর্কে অনুধাবন করে গান্ধীজি যে মাতৃ এষণায় প্রবুদ্ধ তা আমার বোধিতে আসে। পরে গান্ধীজির আত্মদানের পর এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে ফেলি। সাংবাদিক-শিরোমণি গান্ধীজি বলেছেন : There are occasions, when a Journalist serves his profession by his silence. আমি এ প্রবন্ধগুলি লিখবার বহুদিন পর কয়েকজন গান্ধী ভাবের ভাবুকের সঙ্গে আলোচনা করি। কারণ, কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী মহাত্মাকে আমি সম্পূর্ণ নূতন করে দেখতে গিয়ে দেখেছি তিনি মাতৃ এষণায় উদ্বুদ্ধ, তিনি মানবতাবাদী। আমার ধারণা তাঁদের দৃষ্টিতে কতটা দাঁড়াতে পারে তাই আমি যাচাই করতে চেয়েছিলাম। তারপর সাংবাদিকতাকে আমি বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছি। গান্ধীজিও সাংবাদিক জগতের ভাস্কর। লুই ফিসারের ভাষায় A Journalist is an Engineer of souls with a keyboard of human instinct. সে দিক হতে মানব প্রকৃতি, গতি, প্রবণতা, এষণা সম্পর্কে গান্ধীজি যে অদ্বিতীয় সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হই।

সাংবাদিকের দায়িত্ব সম্পর্কে গান্ধীজির একটা লেখায় আলো পেলাম : 'What is really needed to make democracy to function is not knowledge or facts, but right education. And the true function of Journalism is to educate the public mind, not to stock the public mind with wanted and unwanted impressions. A Journalist has therefore, to use his discretion, as to what to report and when . As it is, the Journalists are not content to stick to the facts alone . Journalism has become the art of intelligent anticipation of events .'

প্রবন্ধ চারিটির মধ্যে প্রথমটি 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিকা' ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগষ্টের আনন্দবাজার পত্রিকায়, দ্বিতীয়টি, 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগষ্টের 'দেশ' এবং সেই সালের ঐ পত্রিকার ১৭ই সেপ্টেম্বর 'মুক্ত ভারতের রূপ' নামে আর একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ইতিহাসের আধ্যাত্মিক আকার'-নামক প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে ছাপা হয়নি। এ চারটি প্রবন্ধের সহিত আরও

তিনটি প্রবন্ধ জুড়ে দিয়ে এ গ্রন্থখানি প্রস্তুতের আয়োজন করেছি। 'মুক্ত ভারতের রূপে'র শেষের দিকের 'চরকাসূর্য ও অষ্টাদশ তারকা' এবং 'শেষ দলিল' ঐ প্রবন্ধ ছাপাবার কালে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 'মহাত্মা ও ভারতীয় সাধনা'র অধ্যায়টি কুড়ি বৎসর পূর্বে লেখা একটি প্রবন্ধের পূর্বাংশ। এবার শেষাংশ লিখে দিয়ে প্রবন্ধটিকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হল।

আমার এ লেখার প্রেরণা যাঁরা যুগিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁরা বহুবার বহুভাবে আমার ভাবগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তবে মানবপ্রেমী, পুরুষশ্রেষ্ঠ বাদশা খানের বাইশ বৎসর পর ভারত আগমন ও অনশন আমার হাতে কলম তুলে দিয়েছে। আমার কারাজীবনের সঙ্গী, পরে সাংবাদিক জীবনের সাথী, কল্লোল প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় এ গ্রন্থখানি প্রকাশে যে সাহায্য করেছেন, তা আমার নিজস্ব সম্পদ হয়েই থাকুক।

জীবনের সাংবাদিক চরিত্রের কিছুটা প্রতিফলন এ গ্রন্থে রয়েছে। এ-গুলি প্রতিবেদকের প্রতিবেদনেই, এছাড়া আমার নিজস্ব সম্পদ এতে কিছু নেই। গান্ধী ভাবধারায় পুষ্ট ব্যক্তিরা এ গ্রন্থের ভিতর দিয়ে যাবার সময় তাঁদেরই চিন্তার সহমর্মিতা উপলব্ধি করবেন। আমি গঙ্গা জল দিয়ে গঙ্গা পূজার আয়োজন করেছি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত এ প্রবন্ধ তিনটিকে চলতি বাংলায় রূপান্তরিত করেছি, আর অতি সামান্য অংশ সংযোজন করে বন্ধনীবদ্ধ করেছি। মোটামুটি দুই যুগ পূর্বের আমার ধারণাকে নতুন করে উপস্থিত করার চেষ্টা করিনি। গান্ধীজি 'আমার জীবনই আমার বাণী' বলে গিয়েছেন। দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল তিনি একদিকে কাজ করেছেন, আর একদিকে লিখেছেন। তাঁর চিন্তার সঙ্গে আচরণের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। তিনি এর বেগ সহ্য করে, নিত্য তপস্যা করে, একই ভাবে কাজ করে গিয়েছেন। সুতরাং সূর্যকে লণ্ঠন দিয়ে দেখবার চেষ্টা বৃথা। গান্ধীযুগের মানুষরা এত কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন বলে তাঁর সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট। কিন্তু মেঘ ঢেকে রাখলেও সূর্যের আলো আমাদের কাছে আসে। তবে ধাক্কায় প্রতিধাক্কায় যে অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে সেখানে, উন্নততর মানুষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। অনাগত যুগের মানুষদের জন্য আমি রেখাচিত্র টেনেছি—শুধু সে মহামানবের প্রতি তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের উদ্দেশ্যে। তিনি জীবনভোর মুঠোয় মুঠোয় আমাদের অকৃপণ হাতে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সে দান

গ্রহণের মত শক্তি আমার নেই তা আমি জানি, কিন্তু আত্মতৃপ্তির জন্যই আমার এ নৈবেদ্য।

জীবনে অসহযোগ হতে আগষ্ট বিপ্লব পর্যন্ত প্রতিবার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। যিনি আমাকে এবং আমার মত অতি সাধারণকে মানব জীবনের এ শ্রেষ্ঠ সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমরা প্রণামের বিনিময়ে অঞ্জলি পেতে রয়েছি। বাড়ির সামনের সব জঞ্জালকে সার করে ব্যবহার করে জমিকে উর্বর করেন যে চাষী, সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর। গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, ছাত্র সত্র, আরও নানাপ্রকার গঠনমূলক কাজ করার উৎসাহ যেখানে পেয়েছি, তারও উৎস ছিল এখানে। বারে বারে কারাগারে ঢুকেছি তাঁর প্রেরণায়, তাঁর প্রেমে, তাই তাঁর সংগে আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। জঞ্জাল আর সারের, সারের আর জমির, জমির আর চাষীর এ সম্বন্ধ।

আমরা এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেছি, যে যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মর্ষি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি। আমি আর এক বিস্ময়কর মানুষকে দেখেছি, যিনি সকলকে সহ্য করেছেন, কাকেও উপেক্ষা করেননি, কারও উপর বিরক্ত হননি, তিনি শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর; তিনি মুক্তরাজ। তিনিই 'মহাত্মা গান্ধীর মত নির্ভীক হতে' বলেছেন। মহাত্মাজী এসেছেন সাধারণ বেশে, কিন্তু এ দেহে দেহীর পরিপূর্ণ প্রকাশে অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় দেখেছি তাঁর এক একটি কথায় কি শক্তি ছিল এবং কি অঘটন ঘটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্থূল দেহে যা করবার তা তিনি করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু যত দূরে যাবেন ততই তিনি উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবেন, খাঁটি সোনার মত আগুনে পুড়ে পুড়ে এ মানুষগোষ্ঠি যখন তাদের পশু-সত্বাকে উত্তীর্ণ করে মানব মহত্বের দিকে ছুটতে থাকবে সেদিন এ জ্যোতির্ময় পুরুষ তাদের পথের দিশারী হবেন। কয়লা ও হীরা আসলে একই জিনিষ কিন্তু একটি আর একটির রূপান্তর-মূর্তি। তেমনি সাধারণ মানুষ এ মানুষকে দেখেই দিব্যজীবনের সন্ধানলাভ করবে। আজকের অন্ধকার, মধ্যরাত্রের অন্ধকারকে উত্তীর্ণ করে যাবে তখনই অরুণালোকের সন্ধান মিলবে। বুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভূতির উপলব্ধি দিয়ে আমরা একে লাভ করব। তাই সে পথের পরিচয় গান্ধী-জীবনের মধ্যে রয়েছে বলে আমার এ উদ্যোগ। গবেষকদের

জন্য এ গ্রন্থ নয়। অভিনেতাদের জন্যও নয়। ভগবান নিত্য, তার সঙ্গীও নিত্য।

গান্ধীজির কর্মবহুল জীবন ও জীবনব্যাপী তপস্যা গবেষকের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করবে। আমার মত সাধারণ লোক গান্ধীজিকে যেভাবে দেখেছি, বুঝেছি তাই আমার আত্মজনের জন্য আমার এ প্রয়াস। আমার মনে সাংবাদিকের সাধনা নিত্য জাগ্রত ছিল এ লেখার কালে, তাই গান্ধীজির ভাষাতেই জানাচ্ছি: The press was called the Fourth Estate. It was definitely a power but to misuse that power was criminal. He was Journalist himself and he would appeal to fellow Journalists to realise their responsibilities and to carry on their work with no idea other than that of upholding the truth.

আমার নিজের অক্ষমতার জন্য তাঁকে যাতে বিকৃত না করি সে ভয় আমার ছিল। গুজরাটি গান্ধীজির মাতৃভাষা কিন্তু সে মাতৃভাষার মতই তিনি হিন্দী ও ইংরেজীকে ব্যবহার করে বিশ্ব সাহিত্যে অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কোথায়ও তাঁর উদ্ধৃতিগুলির বাংলা অনুবাদ দিয়েছি, কিন্তু কি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত ইংরেজী ভাষায় তিনি লিখেছেন, তা রসপিপাসু সত্যানুসন্ধানীর জন্য হুবহু রাখবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বিবর্তনের পথে গান্ধীজির সত্যলোকে উত্তরণ এবং সমস্ত জীবকেই সেখানে একদিন পৌঁছতে হবে। গান্ধী-জীবনে এ বিবর্তনের পথের পরিচয় পরিষ্কার হয়ে দেখা গিয়েছে।

গান্ধীজি স্বল্পায়ু নিয়ে আসেননি। বহু, বহু যুগ তিনি মানুষের ভিতরে থাকবেন। তাই এ কালজয়ী পুরুষের কথা আলোচনা করতে আমি তাঁর মুখের অথবা লেখাগুলি তুলে দিয়েছি। পণ্ডিত মুখস্থ বলেন, আর জ্ঞানী আত্মস্থ করেন। এ গ্রন্থখানি জ্ঞানীর জীবনের সহায়ক হলে আমার উদ্যোগ সার্থক হবে। গান্ধীজির উদ্ধৃতিগুলি ইয়ং ইণ্ডিয়া, হরিজন, যারবেদা মন্দির, হিন্দ স্বরাজ্য, তাঁর আত্মজীবনী, বক্তৃতা, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি হতে তুলে দিয়েছি। পাণ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি গান্ধীজিকে আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে বিচরণশীল মানুষ বলে জেনেছি, বুঝেছি।

অধ্যাত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম, স্থূল মনের পক্ষে পুনরুক্তির ত্রুটি থাকতে পারে বলে আমি ক্ষমা-প্রার্থী। সকল মানবের ভিতর তিনি ভগবানকে দেখে তাদের আজীবন সেবা করে গিয়েছেন। নিঃস্ব, নিপীড়িত, নির্বিরোধী মানবের পীড়ায় তিনি ছিলেন কাতর, তাই তিনি মহাত্মা আর এ মানবের দুঃখের অংশভাগী ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বলে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, তাই 'মহাত্মা ও মানবতাবাদ'—সকলের হাতে তুলে দিয়ে সবাইকে প্রণাম করে যাচ্ছি।

২২শে: অক্টোবর '৬৯ **কেশবলাল ঘোষ**

গান্ধীজি ঃ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ

কবন্ধ পিশাচ মুক্তি পেল সত্যের স্পর্শে, আবার অহংসর্বস্ব রাক্ষস রাবণ মিলিয়ে গেল জ্যোতির্ময়ের শিখায়, আর ত্রিপুরাস্থর স্বরূপের ছোঁয়ায় মুক্ত হলেন। জড়, প্রাণ মন সত্যে লয় হল। জীবের এ সনাতন পথেই ভারতের চিত্তে জেগেছে মহাশিব। সকল কলুষকে বিনাশ করে পরম কল্যাণকে গ্রহণ করলেন ভারতের তপস্বী। সেদিন কল্যাণের দেবতার আবির্ভাবে ভারত জনতার জীবন প্রোজ্জ্বল হল। মোহ-ভীতি-পাপ-শঙ্কা দূর করার দিন দূরে নহে। "আজ আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এ দারিদ্র-লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে। মানুষের চরম আশ্বাসের কথা, মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।"

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দর বা স্থদামাপুরীতে ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে এক নবজাতকের আবির্ভাব। নাম রাখা হল—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বহু, বহু বছর পুর্বে এ ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর ঘোর নিশীথে কংসের কারাগারে নেমে এসেছিলেন—কংসনিস্থদন শ্রীকৃষ্ণ। সেই গুজরাটেরই দ্বারকাতে। নিবর্তন বিবর্তনের চিরন্তন পথে তাঁরাও এলেন এ ভারত ভূমিতে। বিশ্বাতীত থেকে বিশ্বে নামলেন। ভারতবর্ষ জ্যোতির দীক্ষা লাভ করল। ঋষির আবেদনে প্রসন্ন প্রস্থন হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে অপিহিত সত্যের স্বরূপ বারে বারে অপাবৃত করে দিয়েছিলেন। ঋষিভুমি ভারত তার সে আগ্রহ ও উপলব্ধি নিয়েই যাত্রা স্থরু করেছিল স্থষ্টির প্রথম দিন থেকে। সেই পথ পরিক্রমার ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস। ভূঃ হতে ভূমাতে পৌছবার সেই চিরপরিচিত পথই সকল জীবের মত এ শিশুরও পথ। শতাব্দীর পর শতাব্দী অসীম আগ্রহে ও ধৈর্যে অপেক্ষা করে থাকে ইতিহাস যাঁদের আশায়, ইনিও তাঁদেরই একজন।

গান্ধীজীবন নব মহাভারত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অপূর্ব সৌরভের শুভ্র ফুলের মালা। তাই এখানে গান্ধী আলোচনা গেমুখী হতে গঙ্গাসাগরে পৌছবার পথের রেখাচিত্র। প্রারম্ভে কোন বৈশিষ্ট্য মেলেনি। সাধারণ, অতিসাধারণ—শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, ভীরু, মুখচোরা। নদী পর্বতগুহা হতে মানচিত্র নিয়ে বের হয় না, ধাক্কায় প্রতিধাক্কায় গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে সে চলে মোহনার দিকে। কাবা

গান্ধী ও পুতলীবাঈর সন্তান মাতৃগর্ভ হতে যাত্রা শুরু করেছে, তার বিরাম নেই। তিনি ছুটে চলেছেন, সে পথের ইতিহাসই হয়ে থাকবে আগামী দিনের ইতিহাস।

পিতৃভক্ত শ্রবণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে বাঁকের দুধারে তুলে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ দেখে গান্ধীর শ্রবণের মত সন্তান হবার ব্যাকুলতা। আর হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখে সত্যের জন্য হরিশ্চন্দ্রের বিপদবরণের দৃশ্যে গান্ধীর চোখে জল আসত। গান্ধীজি বলেছিলেন—হরিশ্চন্দ্র ও শ্রবণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হোন বা না হোন, আমার কাছে তাঁরা জীবন্ত সত্য—আমার হৃদয়ে তাঁরা চিরকালের জন্য স্থান পেয়েছেন। স্কুলে কুসঙ্গে পড়ে বিড়ি টেনে অনুশোচনা, শিক্ষকের ইঙ্গিত সত্ত্বেও অশুদ্ধ বানান শুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি, পিতামাতাকে না জানিয়ে মাংসাহার করে মনঃপীড়া, দাদার হাতের সোনার বাজুর অংশ লুকিয়ে কেটে বিক্রি করবার অপরাধবোধে মর্মজালা এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার কাছ হতে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করার ঘটনা হতেই তাঁর মনের পরিচয় মিলছে। আত্মিক অনুভূতি ও সত্যানুরাগের পরিচয় তখনই পাচ্ছি। ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে উপনিষদের ঐ দুই পাখীর মত।

. আলফ্রেড স্কুল বা ভবনগর শ্যামলদাস কলেজের শিক্ষা এবং পরে বিলাতে তিন বছর থেকে ব্যারিস্টারীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে গান্ধীজির জীবনে ছাপ অস্পষ্ট কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশী করে গান্ধীজির মনে হরিশ্চন্দ্রের ও শ্রবণের প্রভাব রয়েছে। বিলাত যাবার কালে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তা রক্ষা করতে গিয়ে দুদিক থেকে টানাটানি। একদিকে ইংরেজী সভ্যতায় অভ্যস্থ হয়ে ব্যারিষ্টার হবার আকাঙ্ক্ষা, আবার সহজ সরল স্বাবলম্বী জীবন গ্রহণে আগ্রহ। গান্ধীর বাবা মা ছিলেন বৈষ্ণব, শিবের মন্দিরে রামজীর মন্দিরে তাঁরা যেতেন। বাবার কাছে জৈন সাধু এবং তাঁর মুসলিম ও পার্শী বন্ধুরা এসে ধর্মচর্চা করতেন। গান্ধীর জীবনে সে প্রভাব চিরমুদ্রিত। তিনি তাঁর মায়ের কথা বলেছেন: "মা ছিলেন সাধ্বী স্ত্রী, অত্যন্ত ধর্মভীরু, পূজাপার্বণ না করে কখনও খেতেন না।" তেরো বছরে সাড়ে তেরো বছরের মেয়ে কস্তুরবাকে গান্ধীজি বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের মূল কথা কি তাও তিনি তখন বুঝতেন না। তাই তিনি বাল্যবিবাহ প্রথাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি কখনও। কিন্তু এ মহীয়সী মহিলা মানবিক মহত্ত্বের চরমে পৌঁছে এক কালজয়ী মহামানবের সঙ্গে ছায়ার মত

তাঁকে যেমন নিঃশেষে বিলিয়ে গিয়েছেন, তেমনি স্বামীকেও সর্বদিক হতে সাহায্য করে জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা

গান্ধীজি ব্যারিষ্টার হয়ে এসে রাজকোটে—বোম্বেতে আইন ব্যবসা করতে গেলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁকে নিয়ে চলল—দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে, ডারবানে। ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাবার পথে মরিৎসবার্গে প্রথম শ্রেণীর টিকেট থাকা সত্ত্বেও কালা আদমী বলে তাঁকে ট্রেন হতে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দেওয়া হল। এখানে তাঁর অভয় মন্ত্রের দীক্ষা—সংগ্রামী জীবনের সুরু। তিনি অপমানিত মনুষ্যত্বের বেদনায় চঞ্চল। তিনি ভারতীয়দের আত্মসম্মানের লড়াইতে লেগে গেলেন মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি নেতা ও আইনজীবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য ভারত থেকে পরিবার নিয়ে ফিরলেন। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। যতই আক্রমণ চলল গান্ধীজির শক্তি কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে লাগলো। বুয়োর যুদ্ধে তিনি সেবার কাজ চালিয়েছিলেন। তারপর জুলু বিদ্রোহের সময়ও গান্ধীজি শুশ্রূষাকারী দল গঠন করেছিলেন। গান্ধী দেখলেন যে জুলুরা বিদ্রোহ করেনি, খাজনা বন্ধের আন্দোলন করছে। আর তাদের ওপর এমন ভাবে বেত মারা হচ্ছে, তাতে এদের দেহে পচন ধরেছে, আর সেই অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গরা তাদের সেবা করতেও অস্বীকার করছে।

তারপর গান্ধীজি দেশে ফিরবার উদ্যোগ করছেন। এমন সময় সংবাদপত্রে দেখলেন, ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য এক বিল আনা হয়েছে। তিনি ভারতীয়দের তা জানালেন এবং বিলের প্রতিবাদ করবার জন্য এক রাত্রে যে স্মারকলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, তা মানুষের ইতিহাসে এক অপূর্ব দলিল। বিলে ভারতে ভারতীয়দের ভোটাধিকার নেই বলে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে না বলা হয়েছিল। গান্ধীজি এ স্মারকলিপিতে লিখলেন: ভারতীয়রা যখন ভোটাধিকার প্রয়োগ করত তখন ইংলণ্ডের টিউটনদেরও সে অধিকার ছিল না। মহীশূরে ১৮৯১ সালেও নির্বাচন মাধ্যমে

গঠিত ৭৫৫টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৮৯২টি লোকাল বোর্ড রয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজী আইনজ্ঞ ফ্রেডারিক পিনকুট বলেছেন যে ভোটাধিকারে বিচারবুদ্ধি বা সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, তা ব্রিটিশদের চেয়ে ভারতীয়দের কোন অংশে কম নয়। বৃটিশরা যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, তখনও ভারতীয়দের ভোটদান ব্যবস্থা ছিল। স্যার জন বার্ডউড বলেছেন যে ভারতীয়রা ইংরেজদের অপেক্ষা যে উন্নত জাতি বিশ্লেষণ করলে তাই দেখা যায়। স্যর টমাস মন্‌রোর বক্তব্যে আছে যে ভারতীয়রা কৃষি বিদ্যায় দক্ষ এবং সর্বজনের প্রতি ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার ও আতিথেয়তায় সকলেরই প্রশংসাভাজন। ম্যাকসমুলার বলেছেন: যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কোন্ দেশে মানুষ তার সর্বোত্তম বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে এবং কোথায় কাণ্ট ও প্লাটোর মত দার্শনিকদের চিন্তা ও দর্শন ভালো ভাবে উপলব্ধি করা হতে পারে, আমি অসঙ্কোচে নাম করব ভারতবর্ষের। এভাবে গান্ধীজি একে একে বক্তব্য রেখে বিলটি প্রত্যাহার করার আশা প্রকাশ করলেন। ফলাফল যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু গান্ধীজির এ স্মারকলিপিতে আগামী দিনের ইঙ্গিত ও কর্মনৈপুণ্যের স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে।

১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ডারবানে বসে গান্ধীজি এ চিঠি লিখেছিলেন এবং তা নাটালে ইউরোপীয়দের ভিতরও প্রচার করা হয়েছিল। এ স্মারকলিপি বা খোলাচিঠিতে গান্ধীজি মঁসিয়ে লুই জাকালতের উক্তি উল্লেখ করেছেন। এতে বলা হয়েছে: 'হে ভারতের প্রাচীন ভূমি, হে মানবতার লালনক্ষেত্র, তুমি ধন্য! হে শ্রদ্ধেয়া সুনিপুণা ধাত্রী, বহু শতাব্দীর বহু বর্বর অভিযান তোমাকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করতে পারেনি। তুমি ধন্য! হে ধর্মের, প্রেমের, কাব্যের ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তুমি ধন্য! তোমার অতীত আমাদের পাশ্চাত্যের ভবিষ্যতের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হোক।'

এ চিঠির উপসংহারে গান্ধীজি লিখেছেন: 'ভারতই একজন বুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। অনেকে মনে করেন মরলোকে কোনও মানুষের পক্ষে যতখানি সুন্দর ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন সম্ভব বুদ্ধই তা করতে পেরেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, একমাত্র যিশুর জীবনের পরেই তাঁর জীবনের স্থান। ভারত একজন আকবরেরও জন্ম দিয়েছে—এ আকবরের নীতি ব্রিটিশ সরকার অতি অল্প পরিবর্তন করেই অনুসরণ করেছেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের

একজন পার্শী বেরোনেটের মৃত্যু হয়েছে ; এ বেরোনেট তাঁর মুক্তহস্ত দানে শুধু ভারত নয় ইংলণ্ডকেও বিস্মিত করেছিলেন। ভারত কৃষ্ণদাস পালের মত সাংবাদিককেও জন্ম দিয়েছে, বর্তমান বড়লাট লর্ড এলগিন তাঁকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের সমকক্ষ বলে তুলনা করেছেন। ভারত বিচারপতি মহম্মদ ও ও বিচারপতি মথুকৃষ্ণ আয়ারের মত বিচারকদের জন্ম দিয়েছে। এরা ভারতীয় হাইকোর্টের বিচারপতি ও এদের রায়গুলি ভারতের বিচারালয়ের ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের রায়ের ভিতর সর্বাপেক্ষা সুনিপুণ বলে ঘোষিত হয়েছে। সর্বশেষে ভারত বদরুদ্দিন তায়েবজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং ফিরোজশাহ মেহতার মত বাগ্মীদেরও জন্ম দিয়েছে।

অন্য ব্যাপারকে উপলক্ষ করে এ উক্তি করা হলেও এ চব্বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণের ভিতর ভারত এবং ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে।

গান্ধীজি এ বিলের প্রতিবাদে এই সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। বহু ভারতীয় সহ তিনি কারাগারে গেলেন। বর্ণবিদ্বেষী উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ সরকার বিলকে সংশোধন করতে বাধ্য হলেন। গান্ধীজি বললেন 'নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহ দুদিকে ধার যুক্ত তরবারি। যে কোন ভাবেই একে ব্যবহার করা যেতে পারে। যে একে প্রয়োগ করে তারও কল্যাণ হয় এবং যার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তারও মঙ্গল হয়। পরবর্তী যুগে দেখা গেল একদিকে যেমন ভারত পরাধীনতা হতে মুক্ত হয়েছে, আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে গ্লানি হতেও রেহাই দিয়েছে। গান্ধীজি ভারতেও প্রবাসী ভারতীয়দের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। স্মাটস-গান্ধী চুক্তির পর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফল সমাপ্তি হল। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গোখলের ইচ্ছানুসারে গান্ধীজি বিলাত হয়ে দেশে ফিরলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাঁর ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির অধ্যায় রচিত হয়েছিল।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

গান্ধীজি তাঁর ৪৬ বৎসর বয়সে ভারতে ফিরলেন। তাঁর ললাটের রাজতিলক তপস্যার ভস্মে আবৃত। তাই এলেন—অনাড়ম্বরে, অনায়াসে ও সহজভাবে। ট্যাঙ্ক কামান বেষ্টিত পরিরক্ষিত ভূমিতে নহে। তাঁর প্রবেশ শান্ত নিভৃত আশ্রমভূমিতে। দক্ষিণ আফ্রিকা হতে এসে গুজরাটে কোন আশ্রম করে জীবন কাটাবেন জানালেন। তিনি যে ভারততীর্থে আশ্রমবাসী বুঝা গেল। দেখলাম, তাপসের মূর্তি। অতীতের ভারত বা সত্যিকারের ভারতবর্ষের রূপ। এ ভারতবর্ষই আশ্রম। যেখানে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রম গৃহাশ্রয়ী সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভারত প্রতিষ্ঠিত সেখানে তিনি ঘর বাঁধবার সংকল্প নিলেন।

গান্ধীজি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জন্মস্থান পোরবন্দরের দিকে চললেন। ব্যারিষ্টার ও নেতা গান্ধী ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ধরা পড়ল—তিনি কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীরই একজন। সেদিন এ পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর আর একটা দিকও ধরা পড়েছিল। বীরামগাঁও শুল্কবিভাগের অত্যাচারের কথা যখন একজন সমাজসেবী গান্ধীজিকে জানালেন তখন তিনি তাঁকে জেলে যেতে প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, আর সে সমাজসেবীও সমগ্র ভারতের পক্ষে হতেই জেলে যেতে প্রস্তুত বলে উত্তর দিলেন। এখানে আর এক ইঙ্গিত মিলছে।

তারপর একমাসের ভিতরেই ভারতের ঋষিকবির আশ্রমে—শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির আগমন। ইহা অর্থবহ। ঋষিদের অশরীরী আশীর্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা উদগ্র। এরপর হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়। এ হরিদ্বারে, হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে গ্রহণ করলেন চিরতপস্বীর ব্রত—সংযমের মহৎ সঙ্কল্প।

আমরা ম্যাজিনিকে, নেপোলিয়নকে, লেনিনকে, হিটলারকে, মুসোলিনীকে স্তালিনকে দেখেছি, মাও সে-তুংকেও দেখছি। অতীতের ও বর্তমানের বহু নেতাকেও জানি। রাজশক্তি, সৈন্যদল এবং পার্টির প্রভুতশক্তিতে শক্তিশালী হয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের ক্ষেত্রে এসেছিলেন। কিন্তু এ লোকটির আগমন একেবারেই

একা, ভীড়ের ও জনতার ভিতর থেকেও তিনি নিঃসঙ্গ। এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জননাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, যিনি বিশ্বের ঈশান ও বিধাতা একমাত্র তাঁকে নিজের অন্তরে অন্তর্যামী, উপদেষ্টা ও চালকরূপে জেনে ও মেনে নিয়ে নিজের ক্ষীণ অঙ্গুলি ইঙ্গিতে মানব ইতিহাসকে যন্ত্রের মত চালিয়ে গিয়েছেন, আইনস্টাইন একে অলৌকিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন কিন্তু ভারত জানে—যে শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধৃত, সেই শক্তিই এ ব্যক্তিত্বে ব্যক্ত।

বিংশ শতাব্দীর দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ—গান্ধী ও লেনিন। দুজনেরই প্রস্তুতির অধ্যায় রচিত হয়েছিল নিজেদের জন্মভূমিতে নয়। উভয়েই প্রবাসী। দুজনেই এলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। একজন ১৯১৫ সালে আর একজন ১৯১৭ সালে। ভারত ও রাশিয়ার স্রষ্টা দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের মহৎ অধিকার ও কঠিন দায়িত্ব পালন করতে এলেন দুই বিপরীত পথে। সত্যাগ্রহ ও শ্রেণীসংগ্রাম, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ, ধর্মনীতি ও অর্থনীতি, সমন্বয় ও সাম্য—এই পথ। দুয়ের মৃত্যুর মধ্যেও মিল রয়েছে। জীবনাদর্শের দিক হতেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না। গান্ধীজি রুশ বা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনীতা ও জনগণের বা প্রোলেটারিয়েট ডিকটেটরসিপের অনুমোদন করেননি। বিশেষভাবে এ বিপ্লবের হিংস্র পন্থার বিরোধিতা করেছেন। তিনি একে 'an evil' বলেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও লেনিন মহাত্মা গান্ধীকে বিপ্লবী বলেই স্বীকার করেছেন, কারণ 'an ally in the great task of bringing a better world into existance.' সুখী ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠনের মহৎ দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত বিপ্লবী। আবার গান্ধীজি রুশ বিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে বলেছেন : After all its goal is the establishment of a classless society surely an idea worthstriving for. There is no doubt that the ideal of the Bolseviks is backed by the sincerest selfsacrifice of innumerable man and woman, who have given their all for its realization. Though I believe that nothing gained by violance can last, an ideal sanctified by the sacrifice of such great spirits as Lenin cannot be in vain.

লেনিন রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে স্বদেশে এলেন আর গান্ধী এ স্বদেশে স্বজাতির ভিতর আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন—'ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব

তোমারি উত্তরীয়' —আপনজনের ভিতরে এলেন দেশের ধূলা ঝেড়ে তার আপন সত্ত্বাকে তুলে ধরতে। রাশিয়ায় বলসেভিক পার্টি লেনিনকে ডিকটেটর রূপে বরণ করে নিল। আর ১৯১৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র ভারতের হয়ে গান্ধীকে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধনা জানালেন 'মহাত্মা'—I hope that Mahatma and Mrs. Gandhi arrived in Bolpur. আর এর চব্বিশদিন পূর্বে ২৬ শে জানুয়ারী গুজরাটের গোন্দালি রাজ্যের অধিপতির উদ্যোগে আহূত সম্বর্ধনা সভায়, "ভগবান কৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শিব জগদ্বন্দনীয় মহাত্মাকে আশীর্বাদ করুন" বলে মানপত্রে উল্লেখ করা হল। অবশ্য ১৯৪৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সমগ্র জাতির পক্ষ হয়েই গান্ধীজিকে 'জাতির জনক' রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের এ স্বীকৃতি ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান ও কালজয়ী পুরুষের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন গান্ধীজি। যিনি সব সহ্য করেন তিনিই তো ভগবান আর যিনি সহ্য করার শক্তি পেয়েছেন তিনিই তো মহাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'যে সয় সে রয়, যে না সয় তার নাশ হয়।'

আমেদাবাদের কাছে খোসরাবে পঁচিশজনকে নিয়ে গান্ধীজি আশ্রম গড়ে তুললেন। প্রবাস হতে ফেরবার চার মাসের ভিতরই সবরমতীতে নিজের আশ্রমে বাস করতে শুরু করেন। অভয়, অসংগ্রহ, অস্তেয়, অহিংসা, সত্য, পরমতসহিষ্ণুতা অর্থাৎ সর্বধর্মে সমান শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ আশ্রমের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্থান পেল। অষ্টাঙ্গ যোগেরই অংশগ্রহণ করা হল। এ আশ্রমের কর্মতালিকায় আরও দেখছি— শারীরশ্রম, স্বাদসংগ্রহ, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতাবর্জন ও মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের ব্রত। এ স্বদেশী ভাবীকালে চরকাসূর্য রূপ নিয়েছে এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জন অষ্টাদশ তারকার অন্যতম হরিজন আন্দোলনে প্রকাশ পেয়েছে। আর কিছু পরই ১৯১৮ সালে সমর সম্মেলনে বড়লাটের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে গান্ধী হিন্দীতে বক্তৃতা করছেন। সেই গান্ধীই ১৯৩১ সালে অর্ধনগ্ন ফকিরের বেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্ধত সম্রাটের সঙ্গে বাকিংহাম প্রাসাদে করমর্দন করলেন।

১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাঁদরেল ব্যক্তিদের সামনেই গান্ধীজি বললেন : If I found it necessary for the salvation of India that English should be driven out I would not hesitate to declare that they should have to go and I hope, I would be prepared to die in defence of that belief

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তিনি যে সঙ্কল্প করলেন আর তারই পঁচিশ বৎসর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ১৯৪২ সালে ভারত ছোড়' 'Quit India' মন্ত্র দিয়ে সে সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেশ ও জাতির প্রতি মহৎ দায়িত্ব পালন করলেন।

গান্ধীজি চললেন বিহারের চম্পারণের দিকে। এখানে তিনি চাষীদের আপনজন। এর পূর্বে ভারতের কোন নেতাই কৃষকদের দুর্দশা মোচনের জন্য এগিয়ে আসেননি। তিনি নীলকরদের অত্যাচার হতে একশ বৎসর পর কৃষকদের মুক্ত করলেন। তিনিই ভারতের কৃষক আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা। এখানেই তাঁর গ্রামসেবার উদ্যোগ সুরু হয়। ছয়টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে নিরক্ষরদের আক্ষরিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নঈ তালিমের ইঙ্গিতও এখানে মিলছে। তিনি কৃষকদের সাথে মিশে গিয়ে বলছেন: 'যে মুহূর্তে আপনি ভারতীয় কৃষকদের সাথে কথা বলবেন এবং তারা কথা বলতে সুরু করবে, শুনবেন তাদের মুখ হতে জ্ঞানের কণা ঝরছে। বাইরে তাদের কঠিন আস্তরণ ভিতরে আধ্যাত্মিকতার গভীর আধার।'

এরপর গান্ধীজি গুজরাট সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে গেলেন। সেখানে তিনি বললেন: 'I cannot forget that India is not Europe, India is not Japan, India is not China…I feel that India's mission is different from that of others.' ভারতের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতও এখানে পাচ্ছি। এখনও ভারতের মুক্তিদাতার স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। ভারতকে নিয়ে যে ব্যক্তি মায়াবীর মত ঐন্দ্রজালিক খেলা খেলবেন, আজও তিনি আড়ালে। কিন্তু বাউলের মত তিনি ছুটছেন ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। ঘুরে দেখছেন সারা ভারতবর্ষকে। যেখান থেকে ডাক এসেছে, সেদিকে তাঁর যাত্রা। আবার ফিরে আসছেন আশ্রমে। দেখলাম, কলকাতায় সমাজ সেবা সঙ্ঘের সভাপতিরূপে।

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমেদাবাদে মিল মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ দেখা দিল। গান্ধীজি শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি শ্রমিক ধর্মঘটের নির্দেশ দিলেন কিন্তু ধর্মঘটীদের সর্ত দিলেন: (১) শান্তিভঙ্গ করা চলবে না, (২) যে ধর্মঘট করবে না তার উপর জুলুম চলবে না, (৩) ভিক্ষার অন্ন খাবে না, (৪) ধর্মঘট চলা কালে শক্ত থাকবে, পয়সার অভাব হলে অন্য কাজ করে খাওয়া পরা চালাবে। তিনিই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের জনক।

এখানে শ্রমিকদের তিনি জয়ের পথে নিয়ে যান। তারপর গুজরাটের খেড়া জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের নিয়ে খাজনা বন্ধ আন্দোলন করলেন।

আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলন এবং চম্পারণে কৃষক আন্দোলনের সাফল্য গান্ধীজির মনে কিষাণ মজদুর রাজের প্রেরণা এল। এখনও তিনি শোষণ বলছেন না। অবিচার, সামাজিক সুবিচার ও সমানাধিকারের কথাই বলেছেন, গণতন্ত্র নয় রামরাজ্যের কথা বলছেন। তাঁর আদর্শ অপরিগ্রহ বলে নিজের জন্য কোন সঞ্চয় নেই। তিনি সুসংস্কৃত জীবনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদকে অবাঞ্ছিত বলে ত্যাগ করেছেন। সম্পদের আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগের জন্য বলেছেন। আবার খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। নিরামিষ ভোজনের উপযোগিতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মদ্যপানের মত সাংঘাতিক পাপ আর নেই বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপানের অভিশাপ হতে মুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের লাল রুটি, কমলালেবু ও আঙ্গুর খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতেও পরামর্শ দিচ্ছেন। গো-সেবার কথা বলেছেন। তখনও বলে চলেছেন: 'জড়বাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি ধ্বংসের ভয়ঙ্করতম অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন, অরাজকতার ভয়াবহ বিস্তার, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি এবং তথাকথিত বিজ্ঞানের নামে নিরপরাধ মূক প্রাণীদের উপর যথেচ্ছ পৈশাচিক অত্যাচার এ সব কথা সুবিধামত ভুলে গিয়ে একে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, তার সমালোচনা করেছেন।

গান্ধীজি বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। আজও কোন বাঁধা ছক মিলছে না। ফুলের মত পাপড়ির পর পাপড়ি খুলে আসছে। পরিব্রাজকের বেশে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহাসাধকের তপস্যা ও সাধনায় রচিত অতীতের ভারতকে গান্ধীজি দেখে নিলেন কিন্তু তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই চলেছেন—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। কুঁড়ির ভিতর ফুলের আভাস দেখেছি, ফুলকে আজ ফলের তলার দিকে দেখতে পাচ্ছি। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে মুচি মেথরকে ভাই বলে ডাক দেবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যাকে খুঁজেছেন সেই উত্তর সাধককে দেখা যাচ্ছে। জাতি তার নেতার সন্ধান পেল। সূর্যকে যে পেয়েছে তার আর রাত্রির ভয় নেই।

নেতৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় ভারতকে শুধু নিঃস্বই করে ছাড়ছে না, তার মান মর্যাদা, শুধু ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছে না, নিপীড়ন নির্যাতনে জাতিকে জর্জরিত করে তুলেছে। মানব মহত্বের মহিমায় দীপ্ত, আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ শান্ত জাতির অন্তর্লোককে দেউলিয়া করে ফেলেছে। এ সময় ভারত ভাগ্য-বিধাতা গান্ধীজিকে নিয়ে চলেছেন সেখানে, যেখানে সকলেরই একে একে আনত শিরে এসে মিলতে হবে। ১৯১৯ সাল নব ভারতের উষাকাল। মহাতাপস সন্ন্যাসী বাউল গান্ধী আজ নিজের ভিতর অমিত-তেজ প্রাণশক্তির স্পর্শ পেয়েছেন, 'The idea came to me last night in a dream, that we should call upon the country to observe a general hartal'. মাদ্রাজে রাজাজীর বাড়ীতে মহাত্মাজি জাতির মুক্তির চাবিকাঠি পেলেন।

জাতির প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে যোগ হল। প্রবাসী গান্ধীজি গৃহে ফিরেছেন। এতদিন তাঁর বিভিন্ন প্রকাশই দেখা গিয়েছে। এ বছরই তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের—ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতসারেই এসে পড়লেন। রাউলাট কমিটির রিপোর্ট বের হল, গান্ধীজি প্রতিবাদ করলেন। তবু তা আইনে পরিণত হল। এ অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্রোহ ঘোষণা করল। গভীর নিদ্রাতেই ভারতের ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ পেলেন। গভীর নিদ্রায় তো মনের প্রকাশ নেই, প্রাণের প্রকাশ।

সারা দেশে হরতাল, সাধারণ হরতাল ঘোষণা করা হয়েছে। ৩০শে মার্চ দিল্লিতে হরতাল, পুলিসের গুলি, অমৃতসর ও লাহোরে গুলি চালনা, অত্যাচার, পীড়ন। গান্ধীজি বোম্বেতে, তাঁর উপস্থিতিতেই হরতাল। তিনি এখানে আইন অমান্যের সঙ্কল্প করলেন। তখনই ১৯৩০ সালের ডাণ্ডী মার্চের ভূমিকা রচিত হল। মহাত্মা গান্ধী দিল্লি ও অমৃতসরের দিকে চললেন। পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। তিনি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন। তাঁর গ্রেপ্তারে সারা দেশ রোষে ক্ষোভে গর্জে উঠল। জনতা নাদিয়াদে রেল লাইন তুললে সামরিক আইনজারী করা হল।

গান্ধীজিকে মুক্তি দেওয়া হল। ১৩ই এপ্রিল গান্ধীজি জনতার হিংসাত্মক কাজের জন্য তিন দিন উপবাসের সঙ্কল্প নিলেন। তিনি জনতার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তিনি বলতেন: 'মদ্যপ পিতার জন্য যেমন পুত্র উপবাস

করে তেমনিভাবে যার সাথে প্রীতির সম্বন্ধ, চাপ না দিয়ে তার সংশোধনের জন্য উপবাস করা যেতে পারে। যারা আমাকে ভালবাসে, তাদের সংশোধনের জন্যই আমি উপবাস করছি। উপবাস যদি ঈশ্বর অনুগ্রহের ফল স্বরূপ না হয় তবে তা নিরর্থক অনাহার মাত্র অথবা তা অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্টতর।'

অত্যাচারিত ও শৃঙ্খলিত জাতির সামান্যতম হিংসায় জাতির নেতার উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত, আর তারই সামনে বিদেশী সরকারের পাঞ্জাবে নরকাগ্নির ধূম্রশিখা। এরই আলোকে গান্ধীজিকে দেখলাম। আর দেখলাম এক সুপ্রাচীন সভ্যতার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পাশাপাশি দৃশ্য। গান্ধীজি বললেন—'Himalayan miscalculation'. আর পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ও-ডায়ার এ নারকীয় তাণ্ডবের নায়ক ডায়ারকে বাহবা দিয়ে টেলিগ্রাম করলেন—'Your action correct'. আর গান্ধীজির লেখনীতে, 'সিংহ যখন রাগে তখন কেশর নড়ে।'

সারা ভারত রক্তে স্নান করে উঠল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় সারা দেশে দাবানল জ্বলে উঠল। গান্ধীজি ২৪শে নভেম্বর নিখিল ভারত খেলাফৎ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করলেন। সম্মেলনে বিদেশী কাপড় বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হল। সম্মেলনের সভাপতি বললেন—'Non co-operation' 'অসহযোগ'। একটি শব্দ দিয়ে তিনি সমগ্র জাতির অবরুদ্ধ বেদনাকে ভাষা দিলেন। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষণ হতেই ভারতে বক্তৃতা, সংবাদপত্র তথা ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। বেঙ্গল রেগুলেশন, মাদ্রাজ রেগুলেশন, বোম্বে রেগুলেশন, অস্ত্র আইন, প্রেস আইন, দেশ রক্ষা আইন এবং অন্য সকল প্রকার জুলুমমূলক স্বৈরাচারী আইন জাতির কণ্ঠরুদ্ধ করে রেখেছে। গান্ধীজির অন্তরের অন্তস্তল তা বেঁধে রয়েছে। তারপর অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। গান্ধীজির উপর কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনার ভার পড়ল। তাঁরই রচিত গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে কংগ্রেস স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত চলেছিল; তারপরও মৃত্যুর পূর্ব দিন তিনি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনা করে যান। তা আর গৃহীত হয়নি। গান্ধীজির নেতৃত্বের কালে তিনি ভারতের সনাতন পথেই জাতীয় কংগ্রেসকে তপোবন, মিশন বা আশ্রমে পরিণত করেছিলেন। আর তাঁর দেহত্যাগের পর সেই কংগ্রেসই সেবা ও ত্যাগের আদর্শ বর্জিত পাশ্চাত্যের অনুকরণে দলে পরিণত হল। যোগক্ষেমের স্থলে ভোগক্ষেমে রূপান্তরিত হল।

এই প্রথম কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীজির প্রবেশ। গোখলে রচিত কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের পরিবর্তে গান্ধীজি রচিত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে কংগ্রেস চলল।

তবে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে আদর্শ ও উদ্দেশ্য 'সত্য ও অহিংসার' পরিবর্তে 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণস্বরাজ' বলা হল—গান্ধীজি এজন্য কংগ্রেসের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি জাতির ও কংগ্রেসের মহানায়ক। কলকাতায় কংগ্রেসে বিশেষ অধিবেশনে **এবং** পরে ১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই দুই অধিবেশনেই অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এখান হতেই কংগ্রেস ও গান্ধীজি একাত্মক। বিশ্বের বিস্ময়কর ইতিহাসের আবির্ভাব এখানে। একমাত্র অমোঘ ব্যক্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে এ বিস্ময়কর মানব ছুটলেন অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির মহান্ ব্রতে। বললেন: 'Freedom is the gift of God—the right of every nation. You may claim it. But if you claim it by any means that are repugnant to God, it will not be a blessing for us'.

গান্ধীজি সত্য ও অহিংসাকে জাতির মুক্তি ও মানবমুক্তির অস্ত্র বলে জানলেন। সত্য বলতে তিনি বুঝলেন—যা নিত্য, যার ক্ষয় নেই। যিনি অক্ষয় অব্যয়, তিনিই সত্য। অসত্য হল অনিত্য, আছে পরে নেই—ক্ষয় আছে। 'ভগবানই সত্য' না বলে 'সত্যই ভগবান' বলতেন তিনি। কোন অভাব নেই বলেই তিনি ভগবান। ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ যঃ ইহ ভগবান। ঐশ্বর্য ছাড়লেই অভাবে পড়তে হয়। ভগবানের নামে মানুষ নিষ্ঠুরতা করছে, ব্যভিচার করেছে। সত্য এক ও অদ্বৈত বলে তিনি জেনেছেন। গান্ধীজি মনে করেন যে, সত্যানুসন্ধিৎসু বলেই নাস্তিক প্রচলিত ভগবানকে অস্বীকার করেন। এ সত্য একমেবদ্বিতীয়ম আর ইসলামও তাঁকে এক বলে জেনেছেন, মেনেছেন। গান্ধীজির প্রাণরূপে, আত্মারূপে যিনি দেহমন্দিরে রয়েছেন তাঁকেই ভগবান বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি অহিংস বলতে বুঝতেন প্রেম। সমস্ত জীবন প্রবাহে নিজেকে খুঁজে পেলেন। সে প্রেমকে কামজ অর্থে ব্যবহার করে, নিকৃষ্টতম স্থানে রাখতে হয়েছে বলেও ক্ষোভ করতেন। রবীন্দ্রনাথও বলছেন; 'আমরা প্রেমকে: চাই। কখন সে প্রেম চাই? যখন বিচ্ছেদ মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না বরং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না; দুই যখন এক সঙ্গে থাকে অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না, তারা পরস্পরের সহায় হয়।'

গান্ধীজি বললেন: 'আধ্যাত্মিকত্ব পরে প্রথম প্রয়োজন নির্ভীকতার, ভীরুরা কখনও নৈতিক শক্তি সম্পন্ন হতে পারে না।······রোগ ভয়, দৈহিক আঘাতের ভয়

অথবা মৃত্যুর ভয়, অধিকার চ্যুতির ভয় অথবা কাকেও অসন্তুষ্ট করবার ভয় বা এরূপ বাইরের সর্ব প্রকারে ভয় হতে মুক্তির নামই নির্ভীকতা।'

গান্ধীজির আধ্যাত্মিক চেতনা নিত্য জাগ্রত কিন্তু তা বলে বাহির সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সাংবাদিক চেতনায় জাগ্রত মানুষটি বললেন: 'One of the objects of newspaper is to understand the popular feeling and give expression to it, another is to arouse among the people certain desirable sentiments and the third is fearless ness to expose popular defects'. এ চেতনা তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রেও জেগে রয়েছিল বলে মানব অন্তরকে তিনি গভীরভাবে নাড়া দিয়ে তুলতেন।

জাতির অভয় মন্ত্রে দীক্ষা

১৯২১ সালে গান্ধীজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। এ আন্দোলনকে তিনি জনজাগৃতির আন্দোলন বললেন। এ আন্দোলনের ভিতর দিয়েই তিনি ভারতবাসীদের 'অভয় মন্ত্রে' দীক্ষিত করলেন। ভয় হতে জাত আতঙ্ক হতে জাতিকে মুক্ত করলেন, একটা ভীরু জরাজীর্ণ জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করলেন। তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করলেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে 'শয়তান সরকার' বলে অভিহিত করলেন। ঐ সময় তিনি বললেন: 'Submission to state law is the price a citizen pays for his personal liberty. Submission, therefore, to a state, wholly or largely, unjust, is an immoral barter for liberty'.

১৯৩০ সালে গান্ধীজি সমগ্র দেশে আইন অমান্য আন্দোলন করলেন। তিনি দরিদ্র দেশবাসীর নুন তৈরীর দাবি নিয়ে ডাণ্ডী যাত্রা করলেন আর বললেন, 'হম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উতল হো যায়গে।' কি অলৌকিক ঘটনা ভারতে ঘটে গিয়েছে, সেদিনের ভারতবাসীরা তা জেনেছে। তাঁর নেতৃত্ব সকলের কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলে মনে হয়েছে। কোথা হতে কেমন করে শক্তি সঞ্চয় করে সে শক্তিকে অব্যর্থভাবে প্রয়োগ করে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির বজ্রবন্ধন শিথিল করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সন্ধি করল। ইহাই গান্ধী-আরুইন চুক্তি বলে পরিচিত। গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পূত আদর্শে দীক্ষা নিয়েছিল।

মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে নিবেদিত কংগ্রেসসেবীদের নিগ্রহভোগ ও বীরোচিত স্বার্থত্যাগ সমগ্রদেশের জনমনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার উদাত্ত ও সকরুণ কণ্ঠ প্রতি ভারতবাসীর মনে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সেদিন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বর্বরোচিত অমানুষিকতা শুধু ইংরেজ নয় সমগ্র ইউরোপীয় জাতিকে বিপর্যয়ের মুখে অনিবার্যরূপে নিয়ে গিয়েছিল।

মহাভিক্ষুক দেশের মুক্তি কামনায় গেলেন বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে, ফিরলেন শূন্য হাতে। তারপর অপমানিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩২ সালে সমগ্র দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইহাই দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন। কিন্তু কোথায়ও কোথায় অত্যাচারিত জনগণ হিংস্রপথ গ্রহণ করলে মহাত্মা গান্ধী এ আন্দোলনও প্রত্যাহার করলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে গান্ধীজি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করলেন। তারপর ক্রীপস মিশন এলো। ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা ত্যাগে টালবাহানা চলল আর ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লব বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যকে ইতিহাস হতে উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনার মত ছুড়ে ফেলে দিল। এ বিপ্লব হল 'ভারত ছোড়' আর তার মন্ত্র হল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। মহানায়কের মহামন্ত্র জাতির শত শত বছরের বন্ধনকে ছিন্ন বিছিন্ন করে দিল। মহাকবি বলেছিলেন—'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।'

মহাত্মা গান্ধী বললেন: 'মনে কোন তিক্ততা না নিয়ে, আত্মা অবিনশ্বর আর কিছুই অবিনশ্বর নয়—এ পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পার্থিব যে কোন শক্তির কাছে জানু নত না করার যে দৃঢ় অস্বীকৃতি তা অপেক্ষা মহত্তর বীরত্ব নেই'।—এ বোধিই গান্ধীজিকে অপরিমিত শক্তিতে বলীয়ান করে তুলেছিল এবং সে শক্তি নিয়েই তিনি মানবতার মুক্তি সংগ্রাম করেছেন। এজন্যই পার্লবার্ক বলেছেন 'গান্ধীজিকে যথাসাধ্য বুঝবার চেষ্টা করার ফলে আজ আমি ভারতবর্ষকে কতকটা বুঝতে ও চিনতে পেরেছি'। গান্ধী ও ভারত সমার্থক দেখছি। ঋষির তপোবনে যে ভারতকে দেখেছি, রাজর্ষি জনকের বিদেহ সাম্রাজ্যে যে ভারতকে পাই, তার দুটোকেই গান্ধীজির মধ্যে দেখতে পেলাম। আমরা বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধের

মধ্যে যে ভারতকে দেখেছি, সম্রাট অশোকের মধ্যে যে ভারতের রূপ পেয়েছি গান্ধীজির মধ্যে তাও মিলেছে। স্মরণাতীত কালের ভারত সহস্র যুগ পরেও গান্ধীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর বহু সাধনার ধারা গান্ধীজির জীবনে মিলিত হয়েছে। গান্ধীজি কোন মতবাদ প্রচার করেননি। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। সমাজ চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধি সত্যোপলব্ধির অন্তরায়। বুদ্ধির সীমাবদ্ধক্ষেত্রে গতাগতি। দেশকাল কার্য কারণ অনেক কিছুই তাকে একটা শক্তি নিগড়ে বেঁধে রাখে বলে এর দ্বারা মতবাদ সৃষ্টিই সম্ভব হয়। এর বাইরে যাবার ক্ষমতা তার নেই। সত্যকে পেতে হলে মন বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যেতে হবে। অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। মন বুদ্ধির কোন কাজ সেখানে নেই।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন করল ১৯২১ সালে। আবার ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে উৎখাত করেছে। ১৯২২ সালে গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচোরাতে একজন দারোগা সহ একুশ জন কনেষ্টবলকে পুড়িয়ে মেরে ফেললে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। সেদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কেহ কেহ তাঁর নেতৃত্বের উপর অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। আবার ১৯৩০, ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের কালে হিংস্র মনোভাব দেখা দিয়েছিল বলে তিনি ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আগষ্ট বিপ্লব

১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের পূর্বে সারা দেশ বারুদাগারে পরিণত হয়েছিল। গান্ধীজি 'আমার বুকে আগুন জ্বলে' বলে তাঁর হরিজন পত্রে লিখলেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বে অধিবেশনে 'ভারত ছোড়' বা Quit India প্রস্তাব গৃহীত হলে গভীর রাত্রে ব্রিটিশ শক্তি তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এক মুহূর্তে সমগ্র দেশের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। মহাত্মাজিকে আগা খাঁ বন্দী নিবাসে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আমেদনগর দুর্গে

বন্দী করে রাখা হলো। আগা খাঁ বন্দীশালাতেই গান্ধীজির জীবনসঙ্গিনী কস্তুরবা এবং ভক্তশিষ্য মহাদেব দেশাই-এর জীবনান্ত হয়েছিল। পূর্বাহ্নে নেতারা গ্রেপ্তার হলে প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই তাঁর নেতা হবেন গান্ধীজি বলে রেখেছিলেন। সেদিন গান্ধীজির বাণীই সার্থক হল। প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামী সেদিন দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর সুমহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করেছিলেন।

পূর্ণ স্বরাজের রূপ

গান্ধীজি মানুষকে বড় বা প্রধান বলে জেনেছেন এবং অন্য সব কিছু তার প্রয়োজনে কিম্বা গৌণ বলে মেনেছেন। মানুষকে সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী অর্থাৎ পরের মুখাপেক্ষী না করার আগ্রহ ছিল। সে বোধ হতেই তিনি গ্রাম স্বরাজ এবং এ ভাবে স্তরের পর স্তর সাজিয়ে রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বরাজ চেয়েছেন। ব্যক্তির স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, ব্যক্তিকে পরাধীন বা দাস করতে চান নি। ব্যক্তির সম্পূর্ণ মর্যাদা চেয়েছেন যা সে একা করতে পারছে না, কিম্বা তার গ্রাম পরে জেলা এর পরে রাজ্য করতে পারে না, তাই রাষ্ট্রকে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্র তার উপর খবরদারি করবে তা চলবে না। ব্যক্তিও শুধু তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা হ্রাস করছে সমাজ বা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে, সেজন্য রাষ্ট্র বা দেশের জনগণের শাসন করার ন্যাসরক্ষক হল দেশের সরকার। দেশের জনগণের সরকার হল জনসেবক। জনগণ না চাইলে কোন সরকারের দেশ শাসন করার অধিকার তো দূরের কথা, ক্ষমতাও থাকে না। ভারতে এখন যে প্রকার গণতন্ত্র চলছে তা ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নহে। এ একপ্রকার উচ্ছিষ্ট গণতন্ত্র। উহা মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ভোট সংগ্রহের মতলবে চেঁচামেচি করে চাপ সৃষ্টির এক কৌশল। এতে দেশ রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হচ্ছে ; এটা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, গান্ধীজি বলেছেন : 'The European democracies are, to my mind a negation of democracy.' ভারতীয়দের অন্তরে যে অধ্যাত্ম বা প্রজ্ঞাবোধ রয়েছে তাকেই জাগ্রত করতে হবে এবং সেভাবের কাজই গান্ধীজি চেয়েছিলেন।

গান্ধীজির স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র, নিরস্ত্র মানবতার এক শক্তিশালী অস্ত্র। সে অস্ত্র শাসিত ও শাসকের অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ের কল্যাণ করে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ ও জ্যোতিষ্মান কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রাধান্য মানবপ্রেম

তাঁর মনের সমুদয় কিছু এই কেন্দ্র শক্তির অনুগত। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক. তার সমস্ত কর্মপ্রয়াস মানবপ্রেমে নিয়ন্ত্রিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও চিন্তানায়ক আরনলড্ জোসেফ টয়েনবি লিখেছেন, 'I am conscious of the possibility that I may be prejudiced, because in my judgement Gandhi was as great benifactor of my country as he was of his own. Gandhi made it impossible for the British to go on ruling India, but at the sametime he made it possible for us to abdicate without rancour and without dishonour' গান্ধীজি শাসক শাসিত সকলকে গ্লানিমুক্ত করে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিকে স্বাধীন বা স্বাবলম্বী করেই তাকে মর্যাদাতেই শুধু অভিষিক্ত করেননি, তাকে মৃত্যুহীনের সন্ধান দিয়ে দুর্জয় করে তুলেছেন। গান্ধীজির এই অপরাজেয় ব্যক্তিই হলেন সত্যাগ্রহী, সসম্পূর্ণ মানুষ।

মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ এ মহাজীবন মানুষের জন্য কল্যাণ চিন্তা করে গিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা ও চর্যায় ব্যক্তি বা সমষ্টির স্বাধীনতা, মানুষের প্রকাশ ও বিকাশের স্থান ছিল ওতপ্রোতভাবে। তাই কি স্বাধীনতা সংগ্রামে কি তাঁর সমাজ কল্যাণব্রতে তিনি মানুষকে বলিষ্ঠ জীবন গ্রহণের জন্য পরিচালিত করেছেন। জীবনের এমন কোন দিক ছিল না, যেখানে তাঁর মঙ্গলস্পর্শে পুষ্টিলাভ করে নি। গান্ধীজি সেবার আদর্শ নিয়ে দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'The duty of the journalists is same as that of the historian—to seek out the truth, above all things and to present to his readers not such things as statecraft, would wish them to know but the truth as near as he can attain it.'

এ মানবপ্রেমী মানুষটি উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ (পাকতুনিস্থান) থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত ভারতবর্ষে চক্রের মত সারাজীবন ঘুরেছেন। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে কোটি কোটি দরিদ্র, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত মানুষের সহিত মিশে গিয়েছিলেন। তাই এদের বেদনায় বিদীর্ণ মানুষটির অন্তর্লোকের ভাষা শুনলাম: 'লক্ষ লক্ষ লোক যা ভোগ করতে পায় না, তা অর্জনের দৃঢ় অস্বীকৃতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান। অস্বীকৃতির এ ক্ষমতা আমরা হঠাৎ লাভ করব না। লক্ষ লক্ষ লোককে বিত্তসম্পদ বা সুযোগ

সুবিধা বঞ্চিত বা লাভ না করবার মনোভাব অনুশীলন করতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে জীবন গঠন করতে হবে।……অপরিগ্রহ—ধনসম্পদ অধিকারে না রাখা বা অচৌর্য একই নীতির দ্বারা পরস্পর যুক্ত। প্রয়োজন না থাকলে যদি কেহ কোন জিনিস রাখে তা অপহৃত সম্পত্তিই। পরিগ্রহের অর্থ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সঞ্চয় বুঝায়। সত্যের সাধক প্রেমের বিধানের অনুসরণ করবে। সেজন্যই পরের দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখবে না, ভগবান কখনও পরবর্তী দিনের জন্য ব্যবস্থা করেন না। সুতরাং আমরা যদি ভগবানে বিশ্বাস করি তবে তিনি যে আমাদের প্রতিদিনের আহার্যই উপযুক্ত পরিমাণে দিবেন সে সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। —Perfect fulfilment of non-possession requires that man should like the birds, have no clothing and no stock of food.'

নিঃস্ব মানুষের প্রতি প্রেমই সুস্থ সমাজ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর মনে এসেছিল। সুস্থ সমাজের জন্য সুস্থ মানুষ এবং সুস্থ মানুষের জন্য কেন্দ্রবিমুখ সমাজ বা রাষ্ট্র সৃষ্টির তাগিদেই তিনি চরকাকে এনেছেন। মানুষের সৃজনীশক্তিকে নষ্ট করে যে যন্ত্রযুগকে ডেকে আনা হচ্ছে তাতে বেদনাক্লিষ্ট হয়েই গান্ধীজি বলেছেন: 'It is tragedy of the first magnitude that millions have ceased to use their hands. Nature is revenging herself upon us with terrible effect for this criminal waste of the gifts, she has bestowed upon us as human beings.'

গান্ধীজি ব্যষ্টির মুক্তির ভিতর দিয়েই সমষ্টির মুক্তি চেয়েছেন এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ব্যক্তিকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। যন্ত্রযুগের চরম বিকাশের সময় বলেছেন: 'I would not weep over the disappearance of machinery or consider it a calamity. But I have no design upon machinery as such.' তিনি বর্তমান সভ্যতার রাক্ষসমূর্তি দেখে সতর্ক করে পথের সন্ধান দিয়েছেন: 'Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary reduction of wants,' ভণ্ডামি, ধাপ্পাবাজি, ঈর্ষা ও মৌখিক আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির রাজনীতির পরিবর্তে সত্যাশ্রয়ী রাজনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করে গিয়েছেন। গান্ধীজি বলতেন যে, তাঁর জীবন দর্শনে উপায় ও লক্ষ্য মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ ছাড়া কিছু নয়। তিনি জানতেন, ক্ষমতা মানুষকে কলুষিত করে ও

যদি মনুষ্যত্ব গ্রাস করে। এ ক্ষমতার মোহ, 'In its quest for means of hanging on to power, the congress may lose sight of its ends as well as of the people.'—কংগ্রেস ক্ষমতার মোহে তার আদর্শ ও জনগণকে ভুলে যেতে পারে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসে ধাপ্পাবাজরা ঢুকে পড়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মম্ভরী, ধূর্ত ব্যক্তিরা কংগ্রেস হতে সৎ সরল দেশমাতৃকার বেদীতলে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের উৎখাত করে কংগ্রেসকে নিজের ঘৃণিত স্বার্থসাধনের জন্য ব্যবহার করছে।

কালজয়ী এ পুরুষ সম্পর্কে কবিগুরু বলেছেন : 'কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করবো। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জগদ্দল পাথরকে যে নাড়িয়ে দিয়েছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেলো। ইনি আসবার পূর্বে দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সঙ্কোচে অভিভূত ছিলো, কেবল ছিলো অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার, আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।······সাময়িক যে সব ব্যাপার তিনি জড়িত, তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে—কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে, কালের পরিবর্তনে তাঁকে বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এ যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এ যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি—এ তাঁর সহজাত কবচের মত ; এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্য পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হল, তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।'

গোমুখীতে যেমন পিছনে অদৃশ্য গঙ্গা সঞ্চিত এবং সামনের ভাবী গঙ্গা বিধৃত, গান্ধীজির জীবনধারায় তাইতো মিলেছে। তবু যেন আরও কিছু রয়ে গেল, তাই বললেন : 'My work will be finished if I succeed in carrying conviction to the human family that every man or woman however weak in body, is the guardian of his or her self-respect and liberty.' 'কবে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ, আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।'

গান্ধীজি আজ তার চরম পরিণতির দিকে চলেছেন। তাঁর আজন্ম সাধনার স্বপ্ন সৌধ ভেঙ্গে পড়েছে। হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুরূপে বাস করুক—ভগবান হয় আমার এ স্বপ্ন সার্থক করুন, না হয় আমাকে তুলে নিয়ে যান। হিন্দু এক অংশে আর মুসলমান আর এক অংশে বাস করবে, তা আমি দেখতে পারব না। এ মর্মান্তিক অবস্থা অসহ্য। দেশ ব্যবচ্ছেদের দিন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট গান্ধীজি বললেন : 'My heart has dried up ; and on this day of Independence and partition I have nothing to say to anybody. Let others rejoice. Leave me alone to shed my tears.' ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দিন জাতির মুক্তিদাতার কণ্ঠ হতে নিস্থত বাণী কি মর্মস্পর্শী !

গান্ধীজি জানেন, যার নিজের দেহের ওপরই কর্তৃত্ব নেই, এ পৃথিবীতে এ মর্তলোকে এ দেহের সহিত সম্পর্কিত মানুষের সহিত কি সম্পর্ক ? তাই আজ জয় পরাজয়, লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় বোধ শিথিল ; কর্তৃত্বের অভিমান যে ভুল, তা বুঝতে চেয়েছেন। 'এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক্ ; চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি ভেদ করি কুহেলিকা সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।' রাজ সমারোহে এ আগমন হয় নি। তপস্বীর শান্ত নিঃশব্দ পদক্ষেপে এ আগমন, তাই প্রথমদিন তাঁর আশ্বাসবাণী শুনতে পাই নি, কিন্তু তা ঋষি কবি জানতেন বলেই সেদিন 'স্বাগতম, হে মহাত্মা' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন আর মহাত্মাজিও কবিগুরুর ভাষাতেই তাঁর জীবন দেবতার কাছে আকুতি জানান :

'আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।'

কবিও এ পৃথিবীর বরণীয় ও স্মরণীয়দের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছেন :

'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—'

আর এক মহামনীষী আইনষ্টাইন গান্ধীজি সম্পর্কে বলে উঠলেন : Generations to come, it may be will scerce believe that such one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.'

তিনি পরবর্তীকালের লোকদের এ প্রশ্নের উত্তরও রেখে দিয়েছেন : 'Simply on the convincing power of his personality.'

দেশ ব্যবচ্ছেদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস স্তূপে পরিণত হতে চলেছে। সুদীর্ঘকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের পর জাতির জন্ম যন্ত্রণার অবসান আসন্ন। বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লবের কালে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সঙ্গে গ্রন্থকারের দেখা হয়। তখন তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন : 'রাজা যখন নীতি ভ্রষ্ট তখন তাঁর আর কিছু থাকে না—যেমন কংসের হয়েছিল। ইংরাজরাও শুধু তাদের বাড়ী নিয়েই থাকবে।'—তবে আমি এক প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীর কাছে শুনেছিলাম যে, ঠাকুর নাকি আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে তাঁর এক ভক্তের উত্তরে বলেছিলেন—'আপনারা তো স্বরাজ পাবেন না, ক্ষয়রাজ পাবেন।' সাম্রাজ্যবাদ লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনা ফেলে চলেছে। আর ফেলে চলেছে 'বিস্তীর্ণ পঙ্ক শয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে।' আজ আর গান্ধীজির প্রয়োজন নেই। ১৯৩৪ সালের ৭ই জুন কংগ্রেস হতে দলাদলি দূর করবার উপায় বলতে গিয়ে তিনি আমাদের 'অসলী মা কোন হ্যায়' গল্পটি বলেছিলেন। ধনীর স্ত্রী ও গরীবের স্ত্রীর মধ্যে সন্তানের দাবি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে কাজী বাচ্চাটিকে দু টুকরো করে কেটে দিতে উদ্যত হলেন। তখন গরীবের স্ত্রী সন্তানের দাবি ছেড়ে দিল। বাচ্চাটিকে তো দেখতে পাবে এই ভরসায়। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দু টুকরো করছেন। গান্ধীজি বেদনাকাতর কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাম তো খতম হো গিয়া।' ভারতবর্ষ দু টুকরো—ভারত ও পাকিস্তান হয়ে গেল।

গান্ধীজির মহান নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে ভারতের জাতীয়তা। এ জাতীয়তাকেই হনন বা পরাজয়ের সর্তে জাতির নেতারা স্বাধীনতা গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হলে তিনি মাউণ্টবাটনের ভারত ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা দেখে বললেন : 'Let it not be said that Gandhi was a party to Indian vivisection. But every one today is impatient for Independence. Congress has practically decided to accept partition. They have handed an wooden loaf in this new plan. If they eat it, they die of colic, if they leave it they starve. I have been a fighter all my life. I am come to Delhi to fight a loseing battle.'

ভারতের জাতীয়তা বলতে ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলের সংহত প্রকাশ। জাতীয়তাকে বিসর্জন এবং ভারতের ইতিহাসের ঐক্যকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা গ্রহণ করা হল। গান্ধীজি বললেন, 'We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of independence gained of this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it.' মহাত্মাজিকে ভারতের জাতীয়তার প্রতীক রূপেই জাতি জেনেছিল। ভারতের সংগ্রাম ও সাধনার তিনি ছিলেন সংহত মূর্ত প্রতীক বা বিগ্রহ। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল জাতি ও জাতির নায়করা চালিত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সামনে এসে ও ক্ষমতা লাভের উগ্র আগ্রহে জাতি নহে, জাতির নায়করাই তাঁদের গুরু ও মহানায়ককে পরিত্যাগ করলেন। গান্ধীজির পরমপ্রিয় সহকর্মী খান আবদুল গফুর খাঁ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র সদস্য ছিলেন, যিনি শেষ পর্যন্ত এ দেশ ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পরম দুঃখে চলে গেলেন তাঁর জন্মভিটা নবসৃষ্ট পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের (পাকতুনীস্থান) উৎমানজাইতে।

জীবনাঙ্কের শেষদিক

১৯৪৮ সালের ২০ শে জানুয়ারী গান্ধীজির প্রতি বোমা ছোড়া হল। তিনি পরদিন প্রার্থনা সভায় বললেন, 'যে তরুণ ভুলপথে চলে এ কাজ করেছে, তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নয়। একমত না হলেই অন্য মতাবলম্বী দুর্জন হবে কেন, এটা তরুণটির বুঝা উচিত।' আর একবার ১৯৩৪ সালে হরিজন আন্দোলনের সময় পুনায় তাঁর প্রতি বোমা ছোড়া হলে তিনি এ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন: 'পৃথিবী থেকে একজন পাপিষ্ঠকে অপসারিত করবার জন্য যদি কেউ আমাকে গুলী করে, সে গুলীতে গান্ধী নিহত হবে না। যাকে আক্রমণকারী পাপিষ্ঠ বলে মনে করছে, সেগুলী আততায়ীকেই বধ করবে। আমাকে যারা দোষারোপ করছে, আমি যেন তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হই এবং তাদের হাতে মৃত্যু হলেও তাদের যেন অকল্যাণ চিন্তা না করি—ভগবান আমাকে এ শক্তি দিন।' যীশুর অন্তিমবাণী 'Father, forgive them.' আবার শুনলাম কিন্তু সে কালান্তক দিন এলো—

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। তিনটি গুলী। প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর এ মানুষটি সারাদিন কর্মব্যস্ত ছিলেন। কোন কাজই অসমাপ্ত রেখে যেতে চাইলেন না। জাতির জনকের বাঞ্ছিত লোক—সত্যলোকে যাত্রা ভূমাতে উত্তরণ।

গান্ধীজির মরলোকে জীবনাঙ্কের শেষদিকে বলেছেন: 'আমি এখন যা বলছি তা কারও হৃদয় স্পর্শ করে না। আমি এখন সেকেলে ও বাতিল হয়ে গিয়েছি। তা নাহলে এ সকল ব্যাপার কখনও হতো না।…আমাকে হিমালয়ে চলে যেতে এবং পৃথিবীর কার্যকলাপ হতে অবসর নিতে বলা হচ্ছে।…কিন্তু এটা এতই সহজ, আপনাদের দুঃখ কষ্টে ফেলে কি করে যাই।' তাঁর মরদেহ পঞ্চভূত মিশে গিয়েছে। তাঁর বাণীমূর্তিও বিলীয়মান গোধূলিতে।

পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হতে চলেছে। আজ জাতির মুক্তিদাতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। তাঁর পরামর্শ এখন আর কেউ গ্রাহ্য করে না। যে ধূলোকে তিনি সোনায় রূপান্তরিত করেছেন, আজ তা চড়া দামে বিকোচ্ছে। একদিন যাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও উদ্যম ঊর্ধ্ব মহাকাশের শূন্যতায় বিমূর্ত অবাস্তব তত্ত্ব ছিল না, আজ তা অপ্রয়োজনীয়। গান্ধীজি কিছুদিন অপেক্ষা করার যে পরামর্শ দিলেন তা অগ্রাহ্য। দেশ ব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। তবু মহাত্মাজি তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি প্রত্যাহার করেন নি। 'There are subjects where reason cannot take us and we have to accept things on faith. Faith then does not contradict reason but transcends it. Faith is a kind of sixth sense which works in cases which are without the purview of reason' তাঁর চরখার মধ্যে যে দৈববাণী ছিল তাকেও অগ্রাহ্য করে আমরা পাশ্চাত্যের রথচক্রে ভারতকে বেঁধে দিলাম। তবু তিনি বিশ্বাস হারাননি। আত্মাহুতির কয়েকদিন পূর্বে মৃত বন্ধুর পুত্রকন্যাদের উপদেশ দিয়ে পত্র লিখেছিলেন: 'মৃতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত বা সার্থক করে তোলার মধ্যেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি।' আমরা যেন তাঁর এ ইঙ্গিত বুঝতে ভুল না করি।

আজ জাতীয় নেতারা তাঁর কাছ হতে দূরে চলে গিয়েছেন। তাঁরা গদীতে বসে গিয়েছেন, আর দুহাতে অনুগ্রহ বিলাচ্ছেন। গান্ধীজি বললেন: 'My mind rebels against many things that our leaders are doing. Yet Ido not feel like actively opposing them.' তাঁর কণ্ঠে স্বর—

'হাম তো খতম হো গিয়া।' মহাসমুদ্রের গর্জন আজ তীরে শান্ত ; ঊর্মিমালা তীরে মৃদু। স্বাধীনতা লাভের ছয় মাস পরেই সেই 'খতম' শারীরিক ও বাস্তব আকারে দেখা দিল। কত বড় ও ভয়াবহ বিশ্বাস হনন—তলিয়ে দেখলেই একটু ধরা পড়ে। এ শুধু গুরুত্যাগ নয়—গুরুহত্যা।

হত্যা হলেও গান্ধীমৃত্যু আত্মাহুতি, কারণ মহতের মৃত্যু বা হত্যা নেই। এদের ক্ষেত্রে মৃত্যু প্রাণদান। জাতীয়তা বিসর্জনের ভিত্তিতে ভারত ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তা শুধু প্রাণ হত্যা নয়, তারও অধিক। তা মানবাত্মারই হনন। পশুর হাতের ছোরা পিতাকে, মাতাকে, ভাইকে, বোনকে—মানব সম্বন্ধের সকলেরই মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্বের অশরীরী দীর্ঘশ্বাস ও নিঃশব্দ কান্নায় আজও দেশের বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত ; এই তপ্তশ্বাসে দেশের আকাশ ও বাতাস হতে সুখ ও আনন্দ লেহন করে নিয়েছে। এ অভিশাপকেই শান্ত ও সমিত করতে গান্ধীজি শান্তি ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে ছুটছেন নোয়াখালির গ্রামের পথে, ধ্বংসের পর ধ্বংসস্তূপের দিকে। সেখানে তিনি বললেন—'জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের বেদনার যোগ হোক—সেই হলো বাঁচবার পথ, অজ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির গ্রন্থি বাঁধা পড়লে আমাদের সমাজ রক্ষা পাবে না। আমি এসেছি জানতে। আমি চাই জানাতে'। নির্যাতিত মানবের বেদনা নিজে তুলে নিলেন। নোয়াখালী পল্লী পরিক্রমা মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করবার সাধনা।

নোয়াখালীর প্রতিবাদে বিহারে দাঙ্গা—এরপর পাঞ্জাবে। বাদশা খাঁকে নিয়ে পীড়িত মানুষের ভিতর গান্ধীজি ঘুরে বেড়ালেন। তারপর দিল্লীতে, সেখানে তাঁর আত্মাহুতি। কিন্তু তাতেও এ ভয়াল ও বিরাট অভিশাপ শান্ত ও বিদূরিত হয় নি। দেশের শিয়রে নিত্য জাগ্রত এক অভিশাপকে বসিয়ে রেখে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার অশুভ ও বুভুক্ষু দৃষ্টিপাতে আমাদের সর্ব আয়োজন ও প্রচেষ্টা নিষ্প্রভ, নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এ অভিশাপ হতে রক্ষা পেতে হলে যে বিরাট যজ্ঞের আবশ্যক, সে যজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা ও ব্রাহ্মণের অপেক্ষায় রয়েছি। তাঁরই আবির্ভাব দেশের আকাশ হতে অভিশাপ, অমঙ্গল ও হতাশার যত কালিমা পলকে মুছে যাবে। আমরা গান্ধীজিকে উপেক্ষা করেছি ; শ্রীঅরবিন্দকে অস্বীকার করেছি আর দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—'ভারত যদি বিভক্ত হয় তা হলে কি রাজনীতি, কি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, সবদিক থেকেই ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে।' এও ভুলে গিয়েছি। তাইতো ব্রহ্মর্ষি শ্রীঅরবিন্দ

আশ্বাস দিয়েছেন : 'India if she remains divided will not herself be sure of her safety. It is therefore to the interest of all that union should take place. Only human imbecility and stupid selfishness could prevent it. Against that it has been said, even the Gods strike in vain, but it cannot stand for ever against the necessity of nature and divine will.' ঋষির ধ্যানে যা ভেসে উঠেছে, তা ব্যর্থ হবে না এবং গান্ধীজির আজন্ম সাধনা একদিন বাস্তবায়িত হবে।

সত্যের—নিত্যের প্রসাদ

মহাত্মাজির স্থূলদেহ রাজঘাটে ভস্ম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে চিতানলে তাঁর সূক্ষ্ম দেহকে ভস্ম করা সম্ভব হয় নি। 'মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়ে' বলে আমরা ধ্বনি তুলেছিলাম সেদিন। তাঁর মৃত্যু নেই। বুদ্ধের আড়াইশ বৎসর পর অশোক এলেন। যিশুর একশ বৎসর পর খৃষ্টধর্ম মানুষের অন্তরকে জয় করল। গান্ধীজি আছেন, থাকবেন। স্থূল দেহে নহে রাস্তায় বা পারকে নহে। তিনি ষাট বৎসর অজস্র লেখায় রয়েছেন। মানুষের ভিতর কাজ করে গিয়েছেন। মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখেছেন। তাঁকে মুছে ফেলা অসম্ভব। সঙ্ঘ তো বন্ধন। এ বন্ধনের বাইরেই এ মুক্ত প্রাণের সন্ধান মিলবে। বুদ্ধকে জানতে হলে যেমন বিহার চৈত্য থেকে বের হয়ে আসতে হবে, খৃষ্টকে জানতে হলেও চার্চ থেকে সরে না এলে তাঁদের জানা যায় না বোঝা যায় না। গান্ধীও তাঁর কাল হতে যত দূরে যাবেন ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবেন। উন্নততর মানুষের কাছেই তিনি ধরা পড়বেন। তাঁর কালকে ভাবীকালই জয় করবে। সেদিনই তাঁর জন্ম হবে।

তিনি ছিলেন এক হলেন বহু। তিনি বিশ্বাতীত। এলেন বিশ্বে। আবার স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য বিবর্তনের পথে তৃণ গাছ কীট পাখীরা এলো। ছেড়ে ছেড়ে সে পেয়ে গেল মন। মন আছে বলেই তো সে মানুষ। নরমাংস ভুখ, যাযাবর সমাজবদ্ধ মানুষের স্তরে স্তরে পৌঁছা ছাড়া বা বিবর্তনের পথ। এ ক্রমবিবর্তনের পথে নর নারায়ণ হবেন। তাঁর চ্যুতি নেই তাই তো তিনি অচ্যুত। তিনি নরকে অয়ন বা আশ্রয় করে নারায়ণ—সত্যকে অয়ন বা আশ্রয় করে সত্যনারায়ণ। নরের পূর্ণতা এখানেই। পুরুষোত্তম বা পরমহংস অথবা অতিমানসেই তার পরিণতি। কালো কয়লা আগুনের স্পর্শে জলন্ত বা লাল কয়লার রূপ ধরে শক্তিতে রূপান্তরিত

হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। তেমনি মানুষ সদগুরুর আশ্রয়ে শক্তিধর বা সত্যবানে রূপান্তর বা জন্মান্তর লাভ করলে মন সহ জড়দেহ ভস্মে পরিণত হয়ে থাকে। জীবের এ চরম পরিণতি পরম সত্য। গান্ধীজি 'India's case for swaraj' এ বলেছেন: "আমি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি। আমি মহাসাগরের উপমা দিয়ে বুঝাতে চাই, জলবিন্দুসমূহের সমষ্টিই মহাসাগর। প্রত্যেক বিন্দুই পৃথক সত্তাবিশিষ্ট, তথাপি তারা সমগ্রের অংশ—এক অথচ বহু। জীবনের এ মহাসমুদ্রে আমরা বারিবিন্দু। আমার ধারণা—জীবনের সঙ্গে বা যার প্রাণ আছে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিব এবং ভগবানের সান্নিধ্যে জীবনের মহিমার অংশভাগী হব। এ প্রাণের সমষ্টি তো ভগবান।" এটাই মানুষ গান্ধীজির সত্যিকারের পরিচয়।

তাই যে বিবর্তন সুরু হয়েছে সৃষ্টির প্রারম্ভে তা থেমে যায় নি, থেমে যাবে না। গান্ধীজির স্থূল দেহ নেই কিন্তু যে পথে চলেছেন সে পথে তো বিশ্ব মানবের চিরন্তন পথ। বিশুদ্ধ চিন্তায় আপন সত্ত্বারূপা নাম পেয়েছেন। তাঁর কাছে এ সত্ত্বারূপা নামই হল—'রাম'। সদাচারী অনুশীলনে এ 'রাম' নাম পেয়েছেন। এ তো আত্মার গান। অনন্তের কাছে নিত্য এ নিবেদন করাই হচ্ছে—আত্মার মুক্তি। এ নাম পেলে তো জন্মমৃত্যু থাকে না। তাঁকে অনন্য মনে ডেকেছেন। তাই তাঁর কাছে সত্যের—নিত্যের প্রসাদ উপস্থিত হয়েছে। প্রয়াণ কালেও ডেকেছেন। এইখানেই তো আমরা এ মহাতীর্থের মহাযাত্রীকে দেখলাম। তৃণ পশু মানুষের পথ অতিক্রম করেই দেবত্বে পৌছবে। না পৌছা পর্যন্ত জীবের বিরাম নেই। তার যেদিন সাধ থাকবে না, সেদিন তার সাধনার সিদ্ধি। সেদিন বসনহীন হবে—বন্ধনহীন হবে—আবরণ মুক্ত হবে—সেদিনই তো সে সত্যের সন্ধান পাবে। সত্য লোকে পৌছবে। গান্ধীতো এখানেই। এখান হতেই তিনি ডাক দিয়েছেন। তাই তো তাঁর নিবর্তন এবং সেখান থেকে বিবর্তন। এ চতুর্দশ ভুবন অতিক্রমের পথে আদিত্য লোক যাত্রা। মহামানব গান্ধীর এখানেই উত্তরণ। প্রশান্ত মনে গ্রহণই ভোগদান। সহ্য করবার শক্তিই ভোগদান ; গান্ধীজি প্রসন্ন মনে ভগবানের দান গ্রহণ করেছেন, সহ্য করেছেন বলে স্বরূপ আনন্দ পেয়েছেন।

গান্ধীজির পথ সে সনাতন পথ। জড়দেহ খুঁজেছে—বেদের অর্থ, উপনিষদের অন্নময় কোষ, তন্ত্রের ধনং, মনস্তত্ত্বে প্যাভলক। আমরা দেখেছি অন্বেষণ।

উদ্ভিদ প্রাণ—বেদের কাম, উপনিষদের প্রাণময় কোষ, তন্ত্রের রূপ, মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েড ; আমরা দেখেছি যৌনএষণা।

মানুষ—বেদের ধর্ম, উপনিষদের মনোময় কোষ, তন্ত্রের যশো, মনস্তত্ত্বে এডলার, আমরা পেলাম প্রাণৈষণা।

পরমহংস—বেদের মোক্ষ, উপনিষদের বিজ্ঞানময় কোষ, তন্ত্রের দ্বিষোজহি, মনস্তত্ত্বে ইয়ুং, আমরা দেখলাম মাতৃ-এষণা। এরই বিচারে গান্ধীকে খুঁজে দেখলে পাই তিনি মাতৃ-এষণায় প্রবুদ্ধ।

মাতৃ-এষণা ভারতবর্ষের নিজস্ব সুর। আত্মার উপলব্ধির মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ নিজেকে জেনেছে এবং অপরকে বৃহৎ ও মহতের সন্ধান দিয়েছে। মহাজ্ঞানী রাজা অজাতশত্রু গর্বিত ব্রাহ্মণ দার্শনিক বালাকিকে নিয়ে চললেন ঘুমন্ত লোকের কাছে। কত নামে একে ডাকা হল। সাড়া দিল না। তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে তুললে রাজা বললেন, লোকটি যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন কোথায় ছিল, আবার কোথা হতে এলো। রাজা বললেন—মানুষের হৃৎপিণ্ডের ভিতর ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গায় তখন আত্মা সমস্ত শক্তি নিয়ে চলে যায়। তখন ইন্দ্রিয়রা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মাকড়সা যেমন নিজের জালের সুতো ধরে চারিদিকে চলতে পারে। আত্মাও তেমনি নিজের চারিদিকে ইন্দ্রিয়দের ছেড়ে দেয় এবং বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করে। আগুন হতে যেমন স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আত্মার চারদিকে এ জগৎ ছড়িয়ে রয়েছে। এ জগতের মূল সেই আত্মা। এ জন্যই তাকে সত্যের সত্য বলে। এ আত্মাই শ্রেষ্ঠ। এ জগতে নানাভাবে এ আত্মার প্রমাণ হচ্ছে।

মাতৃ-এষণা মানবপ্রেম। তাইতো গান্ধীজি বলেছেন : 'The law of love governs the world. Life persists in the face of death. The universe continues inspite of destruction incessantly going. মানুষ বাঁচতে চায় কিন্তু জীবনকে জয় করবার পথের সন্ধান মিলেছে মাতৃ-এষণায়। পারমাণবিক বোমাকে সে স্বীকার করে নিবে না। তার এ অস্বীকৃতি রয়েছে মহাত্মাজির ভাষায় : 'I have found that life persists in the midst of destruction and therefore there must be a higher law than that of destruction only under that law would a well ordered society be intelligable and worthliving,' গান্ধীজি এ সমাজ প্রতিষ্ঠারই সাধনা করেছেন। এ এষণাই তাঁর মাতৃ-এষণা, মানবতাবাদ।

মাতৃ-এষণায় প্রবুদ্ধ গান্ধী

প্রাণধর্মের স্বাভাবিক গতি—জীব বা মানুষ বাঁচতে চায়। সে আক্রমণ করেই হউক, নিজের দুর্বলতা থাকলে পালিয়েই হউক, অথবা অনশনে থেকে হউক, বাঁচবার জন্য চেষ্টা করে—(struggle instinct) ইহাই প্রাণৈষণা। এই প্রাণৈষণার পরই মানুষ পুষ্টির সন্ধানে থাকে ; পুষ্টি দিয়ে, অন্ন দিয়ে, দেহকে পুষ্ট করে—ইহাই (nutrition instinct) অন্নৈষণা। মানুষের প্রধান ও প্রাথমিক দাবী বা এষণা—প্রাণৈষণা অন্নৈষণার পর সীমায়িত দাবী—যৌন-এষণা (sexual instinct) বা পুনঃ সৃষ্টি কিংবা প্রজননের আকাঙ্ক্ষা অথবা উপনিষদের ভাষায় পুত্র এষণা এবং সন্তানের বা সংস্পর্শে আগতদের প্রতি মমতা বোধ বা মাতৃ-এষণা (maternal instinct) রয়েছে। উপনিষদ অন্নৈষণাকেই প্রাণৈষণারই অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং পরলোক এষণার কিংবা আধ্যাত্মিক বা আত্মিক উৎকর্ষের আবেগের মধ্যেই মাতৃ-এষণার স্থান হয়েছে।

ব্যক্তির জীবন যেমন এই প্রবৃত্তির আবেগে চালিত, সমাজ বা মানবতার জীবনও এই প্রবৃত্তির রাজ্যেরই শাসনাধীনে চালিত হয়। এদের প্রকাশ ব্যক্তির জীবন যেমন অবস্থাভেদে আসে, সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতার জীবনেও অবস্থাভেদে আসে। প্রকৃতির বাঁধাধরা নিয়মপথেই প্রকৃতির রাজ্যের শাসনব্যবস্থা চলেছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিচয়ের জন্যই আমাদের মনা এবং দৃষ্টি সংশয়াচ্ছন্ন। মানুষের জীবন যেমন তাঁর অংশ বিশেষকেই নিয়ে পূর্ণ হয় না, তার সমগ্র জীবনের গ্রহণ ও বর্জন, যোগ ও বিয়োগ, সাফল্য ও অসাফল্য, সমগ্রকে নিয়েই তার জীবনের পূর্ণতা হয়, তার অংশ বিশেষকে দেখলে যেমন জীবনের সমগ্রকে দেখা যায় না, তেমনি প্রকৃতির রাজ্যে সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতাকে দেখতে হয়, তার সমগ্রতাকে নিয়ে। উহাই তার গতিশীল বা জীবন্ত ছবি। গতিশীলতাই জীবনের লক্ষণ। জীবন যেখানে এসে স্তব্ধ হয়ে থাকে, ত তো মৃত্যু। জীবন অর্থ গতিশীলতা (dynamism) আর তার বিপরীত হল স্থাণুত্ব (statism)। এর পটভূমিকায় আমাদের সমস্যাগুলি সমাধানের পথ পাওয়া যায়।

ফরাসী বিপ্লব ও সমাজদেহে বিবর্তন

সেই আদিমযুগের পুরোহিত, সর্দার বা রাজতন্ত্রের বিভিন্নরূপের পর মানুষের সমস্যা সমাধানের পথের সন্ধান ইদানীংকালে মিলে—ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাবিলাসী সামন্ততন্ত্র রাজা বা সম্রাটের অন্যায়, অবিচার অত্যাচারে পীড়িত মানবতা বেপরোয়া হয়ে তার বাঁচবার পথ বের করল—ফরাসী-বিপ্লবের অগ্নিনালিকা হতে। সে বের করল মানবমুক্তির জন্য—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। সে বুঝল—মানুষে মানুষে বিরোধ দুঃখের মূল, মানুষের উপর কর্তৃত্ব কিংবা মানুষের দাসত্বই মূল। এর প্রতিকারের দ্বারাই সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতার জীবনে সুখ, শান্তি এবং আনন্দ আনা যেতে পারে। এই সুখ, শান্তি ও আনন্দ সকল সভ্যতারই মূলকথা। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের তপস্যালব্ধ এই মহৎ সম্পদকে স্বার্থপর সমাজ, রাষ্ট্র ব্যর্থ করে দিল। এরই আওতায় শিল্প দানব এসে উপস্থিত এবং এরই আশ্রয়ে সবল রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে পদানত করল ; শোষণ করবার ব্রতে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা (colonial administration) প্রবর্তন করল। নিজ রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ব্যক্তি সমগ্র জনগণকে শোষণ করে যে সম্পদ সঞ্চয় করল, সেই সম্পদকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তার রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা নিজ হাতে রাখবার প্রয়োজন হল।

এই ধনের অধিকারী ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী (capitalist) বা বৈশ্য শক্তি নিরানব্বই জনকে শোষণ করে ফেঁপে উঠে। এই শোষণ করবার যে রীতি আছে, তারই পথে এই ধনতান্ত্রিকরা মানুষের সমস্ত মহতী বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলে। মানুষের এই বৃত্তিগুলি সে যদি ধ্বংস না করে, তা হলে নির্মমভাবে শোষণ করতে পারে না। সমাজের বা রাষ্ট্রের বহুকে সে অগ্রাহ্য করে তুচ্ছ করে তার এক জানোয়ারি মানসিকতা গড়ে উঠে। এই ধন সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য সেদিন সে রাষ্ট্রশক্তি তার হাতে রাখে। এই ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার পথে সে যেমন তার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলে, তেমনি অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শিক্ষাহীন, রুগ্ন মানবতাও মনুষ্যত্ব বঞ্চিত হয়। ধন সম্পদ পুঞ্জীভূত করা গোময় পুঞ্জীভূত করার মত। পুঞ্জীভূত গোময় যেমন দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে অস্বাস্থ্য আনে, অকল্যাণ আনে, আবার পুঞ্জীভূত গোময়কে ছড়িয়ে দিলে উহা তেমনি ভূমির উর্বরাশক্তি আনে, মানুষের কল্যাণ করে। এও তেমনি ব্যাপার। এই ধনসম্পদকে রক্ষা করবার জন্য ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কেন্দ্রাভিমুখী করে ফেলে।

এই কেন্দ্রাভিমুখী করার দ্বারা অপর দুটি গোষ্ঠীর মতই সমাজ বা রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি অবিশ্বাস সূচিত হয় এবং এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শিক্ষাহীন, রোগপীড়িত মানবতা এক অবিশ্বাসের কুয়াসাজালে পড়ে জড়পিণ্ডে পরিণত হয় ; তার সেদিন মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এর সুযোগে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী তাকে শাসন ও শোষণ করে। গান্ধীজি বলেছেন : 'When production and consumption both become localised, temptation to speed up production indefinitely and at any price disappeares. All the endless and problems that our present day economic system presents, too, would then become to an end···. There would not be unnatural accumulation of hoards in the pockets the few and want in the midst of plenty in regard to the rest.' বর্তমান সমাজে যান্ত্রিকতার আধিপত্য রয়েছে বলে মানুষ যন্ত্রের তালে বাঁধা পড়েছে। এ যান্ত্রিকতাই মানুষ ও সমাজকে বিশেষ কেন্দ্রে ক্ষমতা সংহত করতে চেয়েছে। এই অতিকেন্দ্রিকতার বিপদ গান্ধীজিকে উদ্বিগ্ন করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে ধন কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আবার সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের শক্তি বা রাজনীতিক ক্ষমতা দল বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সংহত হয়েছে। দুইই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রকারভেদ। ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে স্বাধীনতা বিপন্ন হবেই ও নানা প্রকার নিষ্ঠুরতা নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

এই ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী বস্তুতান্ত্রিকতারই (materialism) উপাসক, কিন্তু নিজের মানসিক দুর্বলতার জন্য ধর্মধ্বজীও হয়। বস্তুতঃ যাদের মনুষ্যত্ব ঘুণে ধরে কিংবা মনুষ্যত্ববোধ ভোঁতা বা শিথিল হয়ে যায়, তারা বিশ্বশক্তির পরিচয় কিভাবে পাবে ? তারা আত্মিক বিজ্ঞান (science of spirit) কিভাবে বুঝবে ? আত্মার সঙ্গে আত্মার পরিচয়ই প্রধান পরিচয় ; যারা মানুষকে শোষণ করে ও ধ্বংস করে তৃপ্তি পায়, তারা সমগ্র সৃষ্টি জগতের সহিত কিভাবে আত্মীয়তার সন্ধান পাবে ? সুতরাং এদের ধর্মপ্রীতি নিছক ভণ্ডামি বা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নহে। এদের মনের উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে না। এরা ধন লুটবার পথে নিজদিগকে ধ্বংস করে এবং যাদের ধন লুটে সেই বঞ্চিত মানুষকে অনশনে রেখে দুঃখ দৈন্যে ফেলে, তাদের মনুষ্যত্ব বিকাশে কণ্টক সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করে

দিয়েছেন : 'সভ্যতা-সাধনায় গোড়াকার কথাই ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সঙ্কীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বুদ্ধি বহু লোককে বহু বন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রকাশ হওয়া চাই'। এই ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিপতি গোষ্ঠী তাদের স্বার্থকে কেন্দ্র করে রাক্ষস গণতন্ত্র (democracy) আমদানী করেছে। এই গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ধন পুঞ্জীভূত করতে সাহায্য করে ও শোষিত জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে পুষ্ট করে তোলে। এই ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায়ে পীড়িত মানবতা বেপরোয়া হয়ে আবার বাঁচবার পথের সন্ধান করল।

রুশ বিপ্লব ও সমাজদেহে সামঞ্জস্য

ব্যক্তিজীবনে বা পারিবারিক জীবনে যেমন সামঞ্জস্যের (adjustment) অভাব হলে বিরোধ দেখা দেয়, সমাজ বা রাষ্ট্রের জীবনে যখন বিপ্লব বা যুদ্ধ দেখা দেয়, তখনও সামঞ্জস্যের অভাবেরই ইঙ্গিত মিলে। সামঞ্জস্যেরও অভাবও হয় তখন, যখন পরিবারে লোক বৃদ্ধি ও অনটন হেতু ছন্দ ভেঙ্গে পড়ে, তারপর বিরোধের অবসান হয় ও সমন্বয় (synthesis) করা হয়। কিছুদিন এর ভিত্তিতে চলবার পর আবার লোক বৃদ্ধি ও সম্পদের অভাবের জন্য আবার বিরোধ দেখা দেয়, আবার সামঞ্জস্য করা হয়। এইভাবে চক্রগতিতে (cyclic order) এই অবস্থা চলছে, তেমনি পথে সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতাও চলে। প্রথম বিশ্ব মহাসমর সমাজব্যবস্থার ত্রুটিরই প্রকাশ এবং ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়, তারা বিপ্লবের সমস্ত দাবীকে পূরণ করেই এসেছে। ফরাসী বিপ্লবে যে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা আসে, উহা ব্যক্তির জীবনের মত সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতার জীবনে প্রাণৈষণারই প্রকাশ। এর মধ্যেই সে বাঁচবার সন্ধান করেছিল, কিন্তু মানবতার দেহে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, যুদ্ধ, বিপ্লব সেই প্রাণৈষণার তাগিদকে এড়িয়ে অন্বেষণার তাগিদ এনেছে।

রুশ বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ হতে সামাজিক সাম্য (social eqality) এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (economic security) পথ বের হয়ে এসেছে। এই সামাজিক, সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ফরাসী বিপ্লবের দান— সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করে আসেনি। এই সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার পরিপূরক রূপেই এসেছে যেমন আসে জীবনের গতি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন

বা প্রৌঢ়ত্বকে বাদ দিয়ে যেমন বার্ধক্য আসে না, তারা জীবন ধর্মের পথে স্তরে স্তরে এসে উপস্থিত হয়। সমাজ বা মানবতার জীবনও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পর সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পথ এসে উপস্থিত হল। রুশ বিপ্লব মানবতার বা সমাজের জীবনে ফরাসী বিপ্লবের পর এক শ্রেষ্ঠ দান। উহা মানবতার জন্য এক আশা ও আলোর বাণী নিয়ে এলো। মানুষ বুঝল যে সমাজে বিত্তশালী ও নিঃস্বের মধ্যে যে ব্যবধান ও বিভেদ রয়েছে, তাহাই সকল দুঃখের মূল। রক্তের কৌলিন্য, বংশের কৌলিন্য, বিত্তের কৌলিন্য, পদের কৌলিন্য, বিদ্যার কৌলিন্য অকুলীনদের অর্থাৎ সাধারণদের বা বঞ্চিত জনগণের সহিত পার্থক্য সৃষ্টি করে, তাই সকল বিরোধ, সকল অশান্তির মূল। এই বঞ্চিতদের ঘরে মায়ের গর্ভে সন্তান আসবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আড়ালে জনকজননীর যে উদ্বেগ আসে, সেই উদ্বেগ হতেই অসহিষ্ণুতা আসে, নিজের উপর ধিক্কার আসে মানুষের মন হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার উপর বিরূপ হয়ে উঠে। আত্মপীড়ায় শোষকের উপর তার হিংস্রভাব জেগে উঠে। রুশ বিপ্লব মানবমুক্তির জন্য শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধান করে আনল। কিন্তু ক্ষমতাবিলাসী শক্তি বা দল এর অপপ্রয়োগ করে বসল। এই সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রয়োগ করতে গিয়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করল, তা সমাজের উপর বিষক্রিয়া করেছে। এতবড় সম্পদকে প্রয়োগ করবার জন্য যে বৃহৎ মন ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, তার অভাবেই এই বিপদ ঘটেছে। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহৎ বা উদার পন্থার আবশ্যক। কার্যসিদ্ধির উপায় যদি নিকৃষ্ট হয়, তার ফলও নিকৃষ্টই হবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে উহার ক্ষমতাধিকারীরা ক্ষমতা হাতে রাখবার মতলবে জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে একপ্রকার সাম্যবাদী গণতন্ত্রের আমদানী করেছে।

মানুষ স্বতন্ত্র একটা জীব নয়। তার প্রত্যেক কাজ আচরণ সমাজের অন্য মানুষের জীবনের সুখ দুঃখকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সমাজেরই অংশ। এ বোধের অভাবই উঁচুনীচুভাব আনে। এ পার্থক্য বা অসাম্য দূরের কথাই হল—সমাজ-তন্ত্রবাদ। শাসকরা এ সমাজের প্রতিভূ হিসাবে রাষ্ট্রশাসন করবে। কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক যুক্তি হতে সমাজতন্ত্রবাদকে দেখেছেন এবং অর্থনীতিই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করেন। এক শ্রেণীর লোক জিনিস উৎপাদন করে অন্য শ্রেণীর লোক কিনে দাম দেয়। ক্রেতার চাহিদানুযায়ী জিনিসের দাম কমে বাড়ে। এ ছাড়া রয়েছে জিনিস তৈরির খরচ। এ জিনিসের দাম যদি তৈরি খরচের থেকে

কম হয় তবে প্রস্তুতকারী বা উৎপাদকের লোকসান হয়। মূল কথা তৈরির খরচই জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ করে। এ জিনিস তৈরি করতে মূলধন যন্ত্রপাতির দাবী মিটিয়ে শ্রমিকের মজুরির কথা বিবেচনা করা হয়। এতে সে বাঁচবার মত সামান্য কিছুই পেয়ে থাকে। মার্কস একে অসঙ্গত ব্যবস্থা বলে মনে করেন। যাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে এ জিনিস তৈরি হয় তারাই জিনিসের সব দামের প্রাপক বলে মনে করেন। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে কারখানা দখলের জন্য বলেন এবং সে অবস্থায় মানুষে মানুষে বিভেদ থাকবে না।. সমাজই হবে রাষ্ট্রের প্রভু ও রাষ্ট্রের কল্যাণই হবে আদর্শ। এক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রী সাম্যের এ আদর্শে পৌছতে বিপ্লবের পথ দেখিয়েছেন। অন্য কোন উপায়ে ধনিক শ্রমিকের পার্থক্য দূর হবে না বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। এটা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের কথা। রাশিয়ায় এ বিপ্লবই (revolution) সার্থক হচ্ছে বলে মনে করা হয়। তবে বিবর্তনের পথে সমাজ-তন্ত্রের সাফল্য সুনিশ্চিত বলে অন্য মতাবলম্বীরা মনে করেন। অসংযত বিদ্রোহে বা বিপ্লবে সমাজের মূল ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায় তখন নূতন সমাজ ব্যবস্থা পতন অসম্ভব হয়। তারা বিবর্তনের (evolution) পথই শ্রেষ্ঠ বলেন।

মার্কসের আদর্শকে রূপায়িত করতে পার্টিকেই লেনিন গুরুত্ব দিলেন। এটা মার্কসের আদর্শের পরিপন্থী। পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক সমাজ বিপ্লব করলেন। কিন্তু অসংখ্য কৃষক এমনকি ট্রটস্কি সহ পার্টির যারা কোন সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেন নি তাঁদের পর্যন্ত হত্যা করা হল। সেটা নাকি অনিবার্য ছিল। ষ্টালিনের আমলে একনায়কতন্ত্র সর্বহারা শ্রেণীর নয় পার্টির হল। সে পার্টি মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই কবজায় রইল। এই কাপালিক গণতন্ত্র জনগণের বিকাশ ও প্রকাশকে রুদ্ধ করে তাদের ক্ষমতা-মাতালদের হাতের মুঠায় রেখে দিয়েছে। রুশ নেতৃবর্গ বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তি ভূমিতে ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংসব্রতে যেদিন সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থায় যে প্রচণ্ড আঘাত করল, সেই আঘাতের প্রত্যাঘাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ইনজেকসনের সূচের ত্রুটির জন্য ঔষধ দায়ী নয়, কিন্তু সূচের ত্রুটি দেহকে বিষাক্ত করে দিল। আগুন গৃহ দগ্ধ করে মানুষের দুঃখ আনে, মানুষকে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু সেই আগুনই খাদ্য রন্ধন করে, শীতে শরীরকে তাপ দেয়। প্রয়োগের উপরই তার কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে।

জীবনধর্মকে অস্বীকার

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পূর্বতন সমাজব্যবস্থা বা ধারণা ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু নূতন সামাজিক কৌলিন্যও পাশে গজিয়ে উঠেছে। জেনারেলের জীবনযাত্রা আর সাধারণ সৈনিকের জীবনযাত্রার সহিত ব্যাপক ব্যবধান এসে গিয়েছে। কারখানার ম্যানেজার ও মজুরের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিকসাম্য আজও অজ্ঞাত বা অবাস্তবই হয়ে আছে। সামাজিক অসাম্য রয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই ভেদাভেদেই বিরোধের বীজ রইল। তারপর মাতৃগর্ভ হতে সন্তান হাসপাতালে ভূমিষ্ট হল, সে নার্সারী বা শিশু সদনে, বিদ্যালয়ে তারপর অবস্থাভেদে লালফৌজে কিংবা কারখানা অথবা রাষ্ট্র-পরিচালন যন্ত্রের স্বার্থে অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়ে অর্থনৈতিক উদ্বেগ হতে জনকজননীকে মুক্তি দিয়েছে, সেও মুক্তি পেয়েছে। দৃশ্যতঃ দেখা গেল অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে সোভিয়েট রাষ্ট্র মানব সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়েছেন। তাঁরা সব ভেঙ্গেপিটে এক ছাঁচে গড়তে চলেছেন। কিন্তু: মানব প্রকৃতির কথা ইহা নহে।

মানুষের জীবনে শুধু অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নহে। আজ এই সকল ব্যবস্থার অভাব বলেই এদের দাবী বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মাত্র। অর্থনৈতিক দিক হতে মানুষের জীবনের যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন উহা অসত্যও নহে কিন্তু জীবন সম্পর্কে নীটসে কিংবা ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাও অগ্রাহ্য করা চলে না। আবার শরীরতত্ত্ববিদ কিংবা মনোবিজ্ঞানী যখন জীবনের বিশ্লেষণ করেন, তখনও তা অস্বীকার করবার কিছু থাকে না। জোতির্বিদ যখন জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রতিক্রিয়ার কথা বলেন তখনও আমাদের কাছে তা অভ্রান্ত বলেই মনে হয়। বস্তুতঃপক্ষে মানুষের জীবন কোন কিছুকেই বাদ দিয়ে নয়। উহার সকল দিককে বাদ দিয়ে যদি একটা দিক হতেই জীবনের ব্যাখ্যা ও সমাধানের পথ বের করা হয়, তবে তা অন্ধের হস্তী দর্শনেরই মত হয়।

গান্ধীজি বলেছেন : 'I claim that human mind and society is not divided into water-tight compartments called social, political and religious. All act and fact upon one another.' গাছের পরিচয় ফলে, মানুষের পরিচয়ও তার মনুষ্যত্বে। মানুষের দয়া, মায়া, মমতা,

মোহ, শ্রদ্ধা, প্রীতি, সুখ, শান্তি, দুঃখ, অশান্তি, আনন্দ বেদনা, আগ্রহ কৌতূহল, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মীয়বোধ, সৌন্দর্যবোধ, ভালমন্দ জ্ঞান—এই গুলিই মনুষ্যত্বের বিকাশক্ষেত্র বা পরিচায়ক। এই বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করে যদি মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়, তবে তার মর্যাদা যন্ত্র বা জড় অপেক্ষা বড় নহে। কিন্তু মানুষ যন্ত্র নহে। রুশ যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ যখন যন্ত্রের উর্দ্ধে উঠে তার সহজাত বৃত্তির পরিচয় দিতে চাহে তখন বিলোপেরই (liquidation) ব্যবস্থা রয়েছে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের পরিচালকরা শত্রুও চাহে না বন্ধুও চাহে না, তারা চাহে অন্ধ অনুচর বা দাস গোষ্ঠী। মানুষের আকৃতিতে যেমন পার্থক্য রয়েছে মানুষের মনেরও পার্থক্য থাকে—উহাই সত্য। এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য একটি বৃহত্তর ঐক্যে বিধৃত। তাহাই মৌলিক সত্য।

মানুষ সকল অনৈক্যের সন্ধান করে সামঞ্জস্য করবে আপন বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ দ্বারা—ইহাই তার প্রতি স্রষ্টার নির্দেশ। সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে রুশ যুক্তরাষ্ট্রে নূতন ভাবে সামাজিক অসাম্য আমদানী করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক নিরপত্তার বেদীমূলে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে মানুষকে জড়পিণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। আর এই সামাজিক অসাম্য ও এই জড়পিণ্ড অবস্থাকে অটুট রাখবার জন্য ক্ষমতাবিলাসীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। এরা এক লৌহনিগড় গড়ে তুলে রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছে। ক্ষমতা কেন্দ্রাভিমুখী করবার পিছনে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের তীব্রতার কথাই রয়েছে। যেখানে অবিশ্বাস থাকে, সেখানে ক্ষমতাবিলাসীদের কল্যাণবুদ্ধির অভাবই সূচিত হয়। আর যাদের অবিশ্বাস করা হয়, তাদের বিকাশে এরা বিপন্ন হয় বলে তাদের বিকাশ ও প্রকাশকে রোধ করবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়। এরা স্বয়ং নিযুক্ত জনগণের (proletariat dictatorship) সর্বময় কর্তা। সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান ক্ষমতাধিকারীরা রুশবিপ্লবের সাধনালব্ধ সম্পদকে ধ্বংস করেছে এবং আজ জারের প্রেত এদের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে সমগ্র বিশ্বকে এদের কবলে আনবার চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছে। এরা মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতা রুশ বিপ্লবের সম্পদ সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োগ প্রণালীতে রয়েছে।

সৎ কাজের যেমন সৎ ক্রিয়া হয়, অসৎ কাজেরও তেমনি অসৎ প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োগ ক্ষেত্রে এদের হিংস্র আচরণই এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ। যে লোক অসৎ সে নিজেকে যেমন লুকিয়ে রাখতে পারে না, সেও তেমনি তার

নিজকে তারই প্রকৃতির প্রভাবে প্রকাশিত বা পরিচিত করে। সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আগ্রহে একদিন শোষিত পীড়িত মানবতা তাদের কাছে ছুটে গেল। কিন্তু তারা তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে মানুষকে জড়পিণ্ডে পরিণত করেছে, পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, আর তাদের দাসে পরিণত করেছে। গান্ধীজি বলেছেন: "'As I look t› Russia where the apotheosis of industrialisation has been reached, the life there does not appeal to me. To use the language of the Bible—'what shall it avail a man if he gains the whole world and loses the soul'. In modern terms it is beneath human dignity to lose one's individuality and become a mere log in the machine. I want every individual to become full-blooded full developed member of the society."

ডাঙ্গায় আগুন লেগেছে বলে নির্যাতিত মানবতা সমুদ্রকে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সমুদ্রেও যখন বাড়বানল জ্বলে উঠল তখন তার সামনে আর কোন পথ রইল না। মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির জন্য। মানুষ চলবে বুদ্ধিবৃত্তির বলে, আর পশু চলবে প্রবৃত্তির আবেগে—ইহাই সৃষ্টির বিধান। ইহাই জীব প্রকৃতির মর্ম ও ধর্ম। তবে যখন মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে প্রবৃত্তির আবেগেই চলে, আর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সে পার্থক্য করতে শিখে, তখন হয়ে উঠে সে যুক্তিবাদী (rational being)। আরও ভালমন্দ বিচার বুদ্ধির প্রখরতাও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা আসে—মানবতার (humanity) অবস্থা; এই অবস্থা হতেই কল্যাণ বুদ্ধির বলে মনুষ্য বৃত্তি যে চরম বিকাশে পৌঁছে—তাহাই দেব জীবন (divinity)। বুদ্ধিজীবি মানুষকে তার বুদ্ধি খর্ব করে প্রবৃত্তিবেগে চালিত করবার চেষ্টা মানবতার চরম অস্বীকার। মানুষের মনকে ধ্বংস করে জড়পিণ্ডে পরিণত করার ব্যবস্থা মানবতার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়াভাব, শিক্ষাভাব, চিকিৎসাভাবের সুযোগ নিয়ে মানুষকে পশুতে, দাস জাতিতে পরিণত করা, মানবসভ্যতার উপর প্রচণ্ডতম আঘাত।

ভারতীয় বিপ্লব ও তার নবতম বিকাশ

জীবনধারার পথেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এসেছে। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর

অশুভ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ধনতন্ত্রবাদের কবলে পড়ে সেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা মানবের গৃহে সুখশান্তি, আনন্দ আনতে অক্ষম হয়েছে। মানুষের শুভবুদ্ধি আবার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে গিয়ে মানব মুক্তির জন্য সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সন্ধান করে এনেছে। কিন্তু এখানেও মানুষের শুভ বুদ্ধির উপর অশুভের প্রভাবে তথাকথিত সাম্যবাদ মানুষের প্রতি করল চরম বিশ্বাসঘাতকতা, জঘন্যতম নিষ্ঠুরতা। সমাজ জীবনের এই সামঞ্জস্যের অভাবই সেদিন দ্বিতীয় মহাসমর সমগ্র মানবজাতির উপর এসে পড়েছিল। এই যুদ্ধের দান আণবিক বোমা আজ মানুষের মাথার উপর ঝুলছে এবং মনুষ্য সভ্যতাকে নির্মূল করবার জন্য সে হুঙ্কার ছাড়ছে। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা আজ তার চরম বিকাশে পৌঁছে বিনাশের দিকে ছুটে চলেছে। পৃথিবী আজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নেই, কিম্বা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও নেই। আজ পৃথিবী বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম (সপ্তম) দশকে উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবী গতিশীল, মানবতাও গতিশীল। এখানেও তারা দাঁড়িয়ে থাকবে না।

ব্যক্তির জীবন যেমন অতীতকে ত্যাগ করে আসে না, তার সমগ্রতাকে নিয়েই তার জীবন। জাতির, সমাজ বা মানবতার জীবনও অতীতকে ত্যাগ করে নয়। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে নিয়েই তার জীবন চলেছে আলোর দিকে। আজ ভারতবর্ষের ভূমিতেই মানবতার নবতম বিকাশ। আত্মিক উৎকর্ষের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে মাতৃ-এষণার প্রকাশ স্বাভাবিক। কারণ, এই ভারতভূমি উহারই প্রকৃতক্ষেত্র। বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তি ভূমিতে প্রাণৈষণার বিকাশ ধনতন্ত্রবাদ মানুষের জন্য কল্যাণ আনেনি এবং সেই ভূমিতেই অন্নৈষণার বিকাশ ক্ষমতা লোভীদের হাতে পড়ে শুভের ধ্বংস স্তূপে অশুভ বুদ্ধির সৃষ্ট বিকৃত সাম্যবাদ মানুষকে আদিম স্তরে নিয়ে গিয়ে হিংস্র জানোয়ারে রূপান্তরিত করতে চলেছে। 'Communism of the Russia type, that is Communism, which is imposed on a people would be repugnant to India,' বলেছেন গান্ধীজি। বস্তুতান্ত্রিক উন্মত্ত আবহাওয়ায় আজ পারমাণবিক বোমা সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস করতে চাইছে। এরই পটভূমিকায় ভারতবর্ষ আগষ্ট বিপ্লবের অগ্নিসমুদ্র হতে অমৃত আহরণ করেছে।

ক্রমবিকাশের পথে মানবমুক্তির জন্য যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এসেছে, তাকে মানবতার

কল্যাণে প্রয়োগের জন্য মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিকৃষ্ট উপায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। তাই ভারতবর্ষ সর্ব মানবের কল্যাণ কামনার ব্রতে 'সত্য ও অহিংসার' সন্ধান করে এনেছে। আজ পারমাণবিক যুগে উন্মাদ পৃথিবীর বুকে ভোগসর্বস্ব ইউরো-আমেরিকার বস্তুতান্ত্রিকতাবাদী ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের দানব নৃত্যের প্রচণ্ডতায় মানবতা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। ব্যক্তির জীবনে যেমন তার মৌলিক চারিটি আবেগ—প্রাণৈষণা, অন্নৈষণা, যৌন-এষণা এবং মাতৃ-এষণা এক এক সময় অবস্থাভেদে প্রকাশ পায়, তেমনি সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র বা মানবতার জীবনেও এদের প্রকাশ জীব প্রবৃত্তির মতই হয়। আমরা মানবতার দেহে প্রাণৈষণা, অন্নৈষণার বিকাশ দেখেছি। দেখেছি—এরা মানবতার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ, শান্তি, আনন্দ আনতে অক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখানেও মানবতা স্তব্ধ থাকতে পারে না, কারণ উহা গতিশীল। উহা আজকের প্রপীড়িত পৃথিবীর সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে সন্ধান করেছে মাতৃ-এষণাকে। এই মায়ের মনের মত নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের কল্যাণ কামনার মধ্যেই বিরোধের মূল বা হেতু বিনাশের বিধান আছে। মা যেমন নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর সুখদুঃখের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে দেন, সেখানে তীব্র হিংস্র মনোবৃত্তি, বন্যপরিবেশ, জঙ্গলী জীবনযাত্রার সামনে এই সীমায়িত প্রবৃত্তি—মাতৃ-এষণার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

ইহা প্রকৃতির বাঁধাধরা পথে এসেই উপস্থিত হয়েছে। তারই উপযুক্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্র। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে গিয়ে যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, তা একদেশদর্শী, তা স্বার্থজড়িত, তা অসূয়া-প্রসূত। সুতরাং এগুলির প্রকাশ ও বিকাশের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয়, উহা পরমাণবিক বোমা নিয়েই মাতামাতি করে। ইহা তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আজ সেখানে মাতৃ-মনোভাব নিয়ে মানুষে মানুষে কোন বড় ছোট সম্বন্ধ নেই এবং সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতাকে নিষ্কলুষভাবে প্রয়োগ করে মানবতার জন্য সুখ, শান্তি, আনন্দ আনবার ব্রতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ মাতৃ-এষণার দিক হতে বলল—,সবার উপরে মানুষ সত্য; তার উপরে নাই'। মানুষের জন্যই যন্ত্র, যন্ত্রের জন্য মানুষ নয়। 'The supreme consideration is man. The machine should not make atropined the limbs of man'—এই হল গান্ধীজির

মত। মানুষই বড়, মানুষই শ্রেষ্ঠ এবং মানুষেরই বিকাশ ও প্রকাশ, তার শিব, সত্য ও সুন্দরের প্রকাশে।

সমগ্র মানবের যন্ত্রনায় তাঁর হৃদয় ছিল অনুকম্পিত। তাই তিনি সুদূরপ্রসারী সর্বগ্রাহী ও সর্বংসহ দিয়েই মানুষকে বুঝেছেন। মানবজাতিকে অখণ্ড রূপেই দেখেছেন, মানুষের প্রত্যেকটি নিষ্ঠুর অপকর্ম জগতে চিরকাল যে কলঙ্কের গভীর দাগ কেটে যায় এ বোধই মানুষকে মহত্বের ব্রতে দীক্ষা দেবার প্রেরণাতেই গান্ধীজি বলেছেন ; 'স্বদেশীতে আত্মস্বার্থের কোন স্থান নেই। স্বদেশীর তাৎপর্য হল—ব্যক্তি পরিবারের জন্য, পরিবার গ্রামের জন্য, গ্রাম দেশের জন্য এবং দেশ মানবজাতির জন্য আত্মত্যাগ করবে।' মানুষের অমঙ্গলকে ঠেকাবার জন্যই এই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে তিনি মানুষের জীবনকে মধুময় করতে চেয়েছেন।

মানুষ নিষ্কামভাবে ভাষান্তরে প্রেমভাবে কাজ করে যাবে তার ক্ষমতানুযায়ী এবং সেখানে কেহ কারও অপেক্ষা ছোট ও কাহারও অপেক্ষা বড় নয়। কারও কাজ নিন্দনীয়ও নয়, আবার অনিন্দনীয় নয়। রাজা বা মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রসচিব রাজকার্য বন্ধ করলে যেমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ঝাড়ুদার কাজ না করলেও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করে ধ্বংসকে ডেকে আনে। বিত্ত, বিদ্যা, বংশ প্রভৃতি যেখানে পার্থক্য করেছে, সেখানেই বিরোধ এনেছে। এই বিরোধই মানুষের মনকে পীড়াগ্রস্ত করে, এই পীড়া হতেই বিকার আসে, বিকার উপস্থিত হলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সামাজিকসাম্য সমাজদেহের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রাখবার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। ধনসম্পদ কোথায়ও পুঞ্জীভূত হবার ফলেও বিরোধ বা অকল্যাণ সৃষ্টি হয়। ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করতে হলে মানুষের মহতী বৃত্তিগুলিকে শিথিল করতে হয় এবং এই ধনসম্পদকে রক্ষা করবার জন্য মনুষ্যত্বকে নীচস্তরে নামিয়ে আনতে হয়। বঞ্চিত লোকও অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়াভাব, শিক্ষাভাব ও চিকিৎসাভাবে পড়ে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথকে হারিয়ে ফেলে। এভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ফলে ভোগী (have) এবং বঞ্চিত (have-not) কারও কল্যাণ হয় না। সুতরাং ধনসম্পদকে সমানভাবে বণ্টন করবার তাগিদও আসে মাতৃ-এষণার দিক হতে। বিশেষতঃ এদের দৃষ্টিতে সকলই সমান। অবশ্য কারও নৈতিক প্রয়োজনীয়তার (moral requirement) অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করবার সুযোগ দেওয়া যায় না। কেননা যেখানেই নৈতিক প্রয়োজনীয়তার অতিরিক্ত সঞ্চয় হয়, সেখানেই মনুষ্যত্বের অপহ্নব ঘটে। এই মাতৃ-এষণা

মানুষকে সামাজিকসাম্য ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য সত্য (Truth) ও অহিংসার (Nonviolence) আশ্রয় গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেকের চোখে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক হতে সমান বলে কারও কাছে কারও কিছু লুকোবার নেই। সত্যকে সকল ধর্মই প্রাধান্য দিয়েছে। ভগবান ও ভক্তের ভিতর সত্যকেই যোগসূত্র ধরা হয়েছে। ব্যক্তির যদি নিজের কাছে সত্য না থাকে তবে আত্মবিরোধ দেখা দিতে বাধ্য। এ অবস্থায় তো কোন যোগসূত্রই থাকে না। এ ছাড়া সত্য এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ দৃঢ় করে, তাকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ করে। সমাজ সংহতিরও ভিত্তি এই সত্যই। সত্যকে স্থান না দিলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিও থাকে না। সে অবস্থায় সমাজ উৎখাত হয়ে যায়। মানুষের জীবনে বিপর্যয়ও অবশ্যম্ভাবী হয়। সমাজসংহতির প্রয়োজনেই অহিংসা এসে পড়ে। অহিংসার অভাব হলে অস্তিত্ব নিয়েই টান পড়ে। আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির মূল উৎস সত্য ও অহিংসা তথা সংযম এবং চরম লক্ষ্য—স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ। অসত্য ও হিংসার আশ্রয় বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্ট। কারণ উহার চোখে সকল মানুষ সমান নহে, উহার এক শ্রেণীর লোককে বঞ্চনা করবার মনোবৃত্তি আছে বলে এই অসত্য ও হিংসাকে আশ্রয় করা হয় কিন্তু মাতৃ-এষণার কথা, উহার চোখে সকলেই সমান। সুতরাং যেখানে বঞ্চনার কথা নাই, সেখানে মানুষকে শান্ত রাখবার জন্য এবং সুখ, শান্তি ও আনন্দের অধিকার দেওয়ার জন্যই সত্য ও অহিংসার আশ্রয়ই স্বাভাবিক পন্থা। এখানে মানুষই বড়, মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের মহতী বৃত্তির উন্মেষই প্রধান কথা। উহার কাছে ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ বড় নহে। উহার কাছে মানবতাবাদই (humanism) বড়।

এদেশের ঋষিরা যে সাম্যবাদ আবিষ্কার করেছেন, সেই সাম্যবাদ পরদিনের জন্য সঞ্চয় করতে নিষেধ করে ধনতন্ত্রবাদের মূলে আঘাত করেছে। সেই সাম্যবাদ সর্বভূতে স্রষ্টাকে দর্শন করে সামাজিক সাম্যের চূড়ান্তরূপ দেখিয়েছে। উহারই ভিত্তিতে মানবতাবাদ গড়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ নিছক বস্তুতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে উহার তীব্র উত্তাপ আছে, সেই উত্তাপ হতে বিকার আসে, বিকার হতেই ধ্বংস আসে। (গান্ধীজি বলেছেন : 'The sin himsa consists not in merely taking life but taking life

for the sake of one's perishable body. All destruction therefore involved in the process of eating, drinking etc. is selfish and therefore himsha. But man regards it to be unavoidable and puts up with it.') বস্তুতান্ত্রিকতার গতি ধ্বংসের দিকে, কেননা উহা অসত্য ও হিংসাকে আশ্রয় করেছে। অসত্যের অস্তিত্ব নাই এবং হিংসা বিনাশেরই অগ্রগামী।

মানবতাবাদ বস্তুতান্ত্রিকতাকে অগ্রাহ্য করে না। বস্তুতান্ত্রিকতা জড়বাদই ;—জড় এবং চৈতন্য নিয়েই জীবন। মানবতাবাদ এই চৈতন্যকেও অস্বীকার করে মনকে ধ্বংস করতে চায় না, কারণ জড়ের থেকে বিবর্তনের পথে আবার জীবের যাত্রা ভূমার দিকে। দিতির থেকে অদিতিতে, তাইতো মন ধ্বংস হলে তার অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং মানবতাবাদ বস্তুতান্ত্রিকতা এবং আত্মিক বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতাকে সামঞ্জস্য করেই গড়ে উঠেছে। উহাই মাতৃ-এষণার প্রকাশ ও বিকাশ। আজকের আণবিক বোমার যুগের পীড়িত ও ক্লান্ত পৃথিবী এই মানবতাবাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উহা বিপ্লবের সকল দাবীকে পূরণ করেই ভারতবর্ষে প্রকাশ পেয়েছে। উহার আলো পৃথিবীর আজকের দিশারী। গতিশীল পৃথিবী বা মানবতা এখানেও দাঁড়িয়ে থাকবে না। তার প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে গতিশীলতা। তার একটার অভাব হলেই বা আধিক্য হলেই অপরটার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। আলো-অন্ধকার, সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, মানবত্ব পশুত্ব, হিংসা অহিংসা—এগুলির একটার অভাব হলে বা আধিক্য হলে তখন পূরণের কাজ চলতে থাকে। ইহা সৃষ্টি জগতের কথা। সুতরাং আজকের মানবতা প্রাণৈষণা, অন্নৈষণার কাছে নেই। চক্রাবৃত পথেই মাতৃ-এষণার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র

যৌন-এষণার প্রকাশ হয় সীমায়িত (limited) ক্ষেত্রে। উহা জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতির রূপে প্রাণৈষণা, অন্নৈষণা প্রভৃতির পরিপূরক-রূপে কাজ করে। কিন্তু প্রাণৈষণা বা অন্নৈষণার ক্ষেত্রে স্বার্থবুদ্ধির প্রাবল্যে যৌন-এষণাও পূর্ণ বিকাশ পায় না। উহা মাতৃ-এষণার কাছে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। শিল্পীমন কিংবা জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী সত্যদ্রষ্টা বলে বাধা বিমুক্ত

পরিবেশ চাহে, বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের ও রাষ্ট্রপরিচালকের হুকুমে বা অর্থনৈতিক চাপে প্রকাশ পায় না ; এ মনের বাধামুক্ত গতির সঙ্গে প্রকাশ পায় এবং তার এই সুযোগ আছে—মাতৃ-এষণারই কাছে যেমনি থাকে মায়ের কাছে মেয়ের বাধামুক্ত গতি। 'After all true art can only be expressed not through inanimate power-driven machines designed for mass-production but only through the delicate living touch of the hands of men and women,' বলেছেন গান্ধীজি। গান্ধীসাহিত্য এ দাবী পূরণ করেছে। উহা সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সংযম সরলতায় পরিপূর্ণ ও হৃদয়াবেগে অলঙ্কৃত। গান্ধীজি চয়নকারী নন, ঋষি। তাই হৃদয়মন্থন করে যে অমৃতধারা বের হয়ে এসেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই-ই পরিবেশন করে গিয়েছেন, আর রসপিপাসু মানুষ তা গ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ করেছে। এ মহাসাধকের অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলছে—যা বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য, মাধুর্য ও সৌন্দর্যের দিক—যা আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক,—যা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতায় বিশাল, বিস্তার, ব্যাপক, যা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার আভাস—গান্ধীজি তাকেই রূপ দিয়েছেন। এখানে বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না। এ রহস্যলোক বড় নিভৃত, নির্জন, গভীর। মনের অতীতে প্রাণের খেলা সেখানে। মহাত্মাজিই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের এ অন্তরতম ও অনির্বচনীয় রহস্যকে সাধনার মাধ্যমে ভাষা দিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীসাহিত্য মাতৃ-এষণারই পরিপূর্ণ রূপ।

মানব মুক্তির সন্ধান

পৃথিবী বা মানবতা আজকের এই মাতৃ-এষণার কাছেও থাকবে না, উহা চক্রাকারে আবার বর্তমান অবস্থা হতে মুক্ত হলেই চলে যাবে। ব্যক্তির জীবনে যেমন অবস্থাভেদে এই আবেগ বা প্রবৃত্তি কিম্বা এষণার প্রকাশ হয়, সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতার জীবনেও তা অবস্থাভেদে উপস্থিত হয়। সুতরাং জীবনধর্মের পথেই বস্তুতান্ত্রিকতার ক্ষেত্রভূমি—ফ্রান্সে প্রাণৈষণার প্রকাশ পেয়েছে এবং এই বস্তুতান্ত্রিকতারই ক্ষেত্র—রাশিয়াতে অন্নৈষণারও প্রকাশ হয়েছে। ব্যাস, বাল্মীকি, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, দাদু, কবীর, দয়ানন্দ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের

ভাবধারায় পুষ্টক্ষেত্র—ভারতবর্ষ মাতৃ-এষণারই প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আবার এ ক্ষেত্রেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ডাক দিয়েছেন : "আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপজঙ্গল পাহাড়পর্বত থেকে—অতীতের কঙ্কালচয়। এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" পৃথিবী, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠে তখনই মাতৃ-এষণার আলো এসে উপস্থিত হয়—যেমনি এসেছে এদেশে ও বিদেশে, প্রকাশ পেয়েছে—যিশু, জারাথুস্ত্র, মহম্মদ, কনফুসিয়স, লাওৎসে প্রভৃতি সাধকদের মধ্য দিয়ে। এঁরাই মানবতার জয়ধ্বনি দিয়েছেন। এঁরাই মনুষ্যবৃত্তির চরম উৎকর্ষে পৌঁছেই মানুষের প্রতিই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

বস্তুতান্ত্রিকতাবাদী বা জড়বাদীরা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহে। এরা ব্যক্তিস্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমগ্র মানবতার কল্যাণ ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু আত্মস্বার্থের কাছে মানবতার স্বার্থ বড় হয় না এবং মানুষকে শ্রদ্ধা জানান কিম্বা তাদের প্রতি আস্থা প্রকাশ স্বার্থান্ধদের স্বভাববিরোধীই হয় অথবা মানুষের বিকাশে এদের স্বার্থ বিপন্নের আশঙ্কা থাকে বলে এরা মানুষকে অভাবে রেখে কিম্বা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধ্বংস করে জড়পিণ্ডে পরিণত করে অথবা পোষা জানোয়ারে রূপান্তরিত করে, সম্পদ লুট করে ও ক্ষমতা জাহির করে তৃপ্তি পায়; এই হিংস্র উন্মত্ততায় পড়ে মানবতা আজ ধ্বংসের দিকে পা বাড়িয়েছে কিন্তু সেখানেই এর শেষ কথা নহে, কারণ উহা প্রকৃতি ধর্মবিরোধী। ('I refuse to suspect human nature. It will, is bound to, respond to any noble and friendly action', এর পরেও গান্ধীজি বলেছেন : 'It is cheaper to kill our aged parents who can do no work and who are a drag on our slander resources. It is also cheaper to kill our children, whom we love to maintain without getting anything in return. But we kill neither our parents nor our children, but consider it a previlage to maintain them, no matter what their

maintenance costs.') তাই আজ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী মানবতার মুক্তির সন্ধান করেছেন। তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছেন এবং মানুষে মানুষে আত্মীয়তার সন্ধান করেছেন। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি মানুষের সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়েছেন।

গান্ধীজি মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার ব্রতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরমার্থিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর ভিতর বুদ্ধের বৈরাগ্য, যিশুর বলিদান, মহম্মদের ঔদার্য, শঙ্করের জ্ঞান এবং গৌরাঙ্গের প্রেম নিত্যজাগ্রত। তাই তো তিনি মানুষের মহতীবৃত্তির উন্মোচন করে সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে রাম-রাজ্য কিম্বা শোষণহীন কৃষক-প্রজা-মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প জানিয়েছেন। তিনি আত্মার পরিচয়ের উপর জোর দিয়েছেন এবং আত্মিক পরিচয়ের উপর জোর দিতে গিয়ে বস্তুতন্ত্রকে অস্বীকার করেননি। তিনি জড় ও চৈতন্য যে বিচ্ছিন্ন নহে, শিব ও শক্তি বা প্রকৃতি ও পুরুষকে নিয়েই যে পূর্ণতা তাকে স্বীকার করেই ভারতের পূর্বাচার্যদের সনাতন পথের উপর বস্তুতান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য করে মানবমুক্তির সন্ধান করেছেন এবং এই পথেই মানবের সুখ, শান্তি, আনন্দ নিহিত রয়েছে— তাই আবার জানিয়েছেন। ইহাই তাঁর সর্বোদয়ের আদর্শ এবং ইহাই মাতৃ-এষণারই প্রকাশ।

আজকের আণবিক যুগের পৃথিবী এখানে পৌঁছেই সত্য ও অহিংসাকে গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। এই গান্ধীবাদ বা মানবতাবাদের অনুসরণের পথেই সর্বমানবের বাঁচবার পথের সন্ধান রয়েছে। (গান্ধীজি বলেছেন: 'I do want growth. I do want self-determination, but I want all these for the soul. I doubt if the steel age is an advance on the flint age. I am indifferent. It is the evolution of the soul to which the intellect and all our faculties have to be devoted.') গান্ধীজি দুঃখে ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ লাঘব করতে চেয়েছেন এবং এর ভেতর আনন্দকে খুঁজেছেন। শিশুর মন কিম্বা সাধকের নিঃসঙ্গতায় যে আনন্দ রয়েছে, সে আনন্দের পেছনে তিনি ছুটেছেন। যে বিশ্লেষণী বুদ্ধি বিশ্বে অসঙ্গতির সন্ধান পায়, যে ন্যায় অন্যায় বোধ এ অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তা মানুষকে শিশুর-জগৎ হতে নির্বাসিত

করে, আবার সাধকের জগতেও প্রবেশাধিকার দেয় না। কিন্তু গান্ধীজি সৎ অর্থাৎ সত্যকই ভগবান বলে জেনেছেন, চিৎ—চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হল ও এতে আনন্দ মিলল এবং এভাবেই সচ্চিদানন্দকে পেয়েছেন। এখানেই তিনি মানব মহত্বের তুঙ্গে এবং এই মাতৃ-এষণার চরম প্রকাশ ও বিকাশেই—মানবতাবাদ। আর এই মানবতাবাদের ভিত্তিতেই সংগ্রাম চালিয়ে মহাত্মা গান্ধী ভারতের পরাধীনতার শৃংখল ছিন্ন করে জাতির ললাট হতে দাসত্ব মোচন করেছেন—স্বাধীন জাতি বা স্বাধীন দেশের গৌরব দান করেছেন,—ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের কবল হতে মুক্ত করে নির্যাতীত মানবতার জয়স্তম্ভ রচনা করেছেন—আণবিক বোমার গ্রাস হতে রক্ষা পাবার পথের পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে মহাত্মাজি

আত্মদ্রোহ, বিরোধ, স্বজাতিবিদ্বেষ, বিজাতিপ্রীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতীয় দুর্বলতার ছিদ্রপথে ভারতবর্ষ অতীতে স্বাধীনতা হারিয়েছে, বিদেশীকে ডেকে ভারতের রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে। সেই বিদেশী রাজমুকুট পরে তার স্বদেশকে ত্যাগ করেছে। শাসকজাতির আভিজাত্য অটুট রেখে ভারতবাসী বনে গিয়েছে। তারপর তারই দৌর্বল্য এবং সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা সঞ্জাত গ্লানির পঙ্ককুণ্ড হতে মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে সন্ন্যাসী রামদাসের প্রেরণায় শিবাজী মহারাজ একবার খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন কিন্তু দাস জাতির জীবন বহু গ্লানিতে পরিপূর্ণ থাকে। তারই সুযোগ নিয়ে এদেশে দিনেমার, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ জলদস্যু ও বণিকরা ভারতীয় লোক-লস্কর, অর্থ, অস্ত্র দিয়ে এদেশে ভাগ্য পরীক্ষায় লেগে গিয়েছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের প্রতি প্রসন্ন হয়। ইংরেজ এদেশে মানদণ্ডের সাথে সাথে রাজদণ্ডও গ্রহণ করে। ইংরেজকে ভারতের রাজতক্তে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের এক শ্রেণীর লোক যেমন সাহায্য করেছিল, আর এক শ্রেণীর লোক তার বিরোধিতাও করেছিল। এই বিরোধের প্রকাশ শুধু পলাশীর আম্রকাননে, বক্সার, কর্ণাটে কিম্বা মীনওয়ালীতেই হয়নি, এ প্রকাশ ভারতবর্ষ আর একবার ১৮৫৭ সালে প্রত্যক্ষ করে। ভারতীয় সৈন্যরা গণ-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে। ব্রিটিশ শক্তি এদেশের বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় সেই গণবিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করে। এই গণবিক্ষোভ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাণৈষণারই প্রকাশ। বাঁচবার তাগিদেই সেদিন গণবিক্ষোভ হয়। এরপর শাসন ও শোষণে পীড়িত জাতি বিচ্ছিন্নভাবে কোথায়ও কোথায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে রুদ্র মূর্তিতে দমন করবার ফলে জাতি মুষড়ে পড়ে। ইংরেজ এরই সুযোগে তার শিকল শক্ত করে নিল। জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোকে একেবারে ধ্বংস করে তাকে বিলাতের শিল্পদানবের মুখাপেক্ষী করে ফেলল। সুপ্রাচীন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা আনবার উদ্দেশ্যে, জাতির মানসিক দাসত্ব আনবার জন্য ইংরেজীর মাধ্যমে কেরাণী

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কুটিরশিল্প ধ্বংস করে ও মানসিক জড়ত্ব এনে ইংরেজ সেই জাতির উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শাসনের নিয়ম, নৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করে অথবা জনমনে ভয় (awe) সৃষ্টি করে জনগণকে শান্ত রাখতে হয়। বিদেশী শাসক পরদেশের জনগণকে শাসন ও শোষণ করে ফেঁপে উঠবে এটা নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে হয় না। তাকে জনমানসে ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করেই শাসন করতে হয়। ব্রিটিশের এ ভয় সৃষ্টি করেই শাসন ও শোষণ করা স্বাভাবিক। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ব্রিটিশরা একটা বীরের জাতিকে ভীরু কেরাণীর জাতিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়। ইংরেজের কেরাণী শিক্ষাব্যবস্থা হতেই একদিন জ্ঞানান্বেষণের সন্ধানে একশ্রেণীর উচ্চ মানসিকতাযুক্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক বেরিয়ে আসে। এরা সেদিন সেই অবস্থারই সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ পন্থায় জড় জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য ব্রতী হন। এই ব্যক্তিরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। কেরাণী শিক্ষা ব্যবস্থার দৌলতে সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে। এরাই সেদিন জাতির ধারক ও বাহক।

সুদীর্ঘকাল ভারত ভূমিতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব চলেছিল। জাতির যেদিন অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব তীব্র হয়ে উঠল, সেদিন এই জাতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের কাঠামো ধরে রাখল কিন্তু অন্তরকে হারিয়ে দৃষ্টি হারা হয়ে পড়েছিল। জাতির দুর্গতির মূলে ছিল এই দৃষ্টিহারা অবস্থা। বস্তু-তান্ত্রিকতাকে (materialism) ঘৃণা করতে গিয়ে একে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবার জন্য অভাবগ্রস্ত জাতি অন্তরের স্পর্শও হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা (spiritualism) বস্তুতান্ত্রিকতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এই দেশের সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছিল এবং ইহাই ছিল এই দেশের সভ্যতার ভিত্তি। বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ধনতন্ত্রবাদ যেদিন ভারতবর্ষে তার ঔপনিবেশিক শাসন চালাল, সেদিন বস্তুতান্ত্রিকতার স্পর্শে বিভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আঘাত করতে লেগে গিয়েছিল। তাদের মাতলামিরই প্রতিক্রিয়ারূপে যেমন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ এসে সমাজস্তরে ও ধর্মক্ষেত্রে আন্দোলন করেছিলেন, তেমনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনীতি ক্ষেত্রেও একটা সুস্থ আন্দোলনের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর বেকার সমস্যার সমাধানে এবং কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবীতেই ব্রিটিশ সরকার চঞ্চল হয়ে উঠল। এই চাঞ্চল্যের প্রকাশ কোথায়ও রুদ্রনীতি, কোথায়ও ভেদনীতিতে হল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিসর ও তার বেকার সমস্যার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাষ্ট্রীয় চেতনা দানা বাঁধতে লাগল।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ও বিপ্লবী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, এর প্রকাশ স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী বর্জনে রূপ নিল। ক্ষমতা হারাবার উদ্বেগে চঞ্চল বিদেশী সরকার অত্যাচার সুরু করল ও জাতিকে দুর্বল করবার মতলবে ভেদনীতি নিয়ে এলো এবং মুসলিমলীগ সৃষ্টি করল। অত্যাচারের তীব্রতা বৃদ্ধিতে ভাবপ্রবণ যুবমনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল। আন্দোলন প্রকাশ্য খাত হতে গোপন খাতে চলতে আরম্ভ করল। ফরাসী বিপ্লব এবং ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডির আদর্শে যুবকের নিষ্কলুষ মনকে উদ্বুদ্ধ করল। আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় এবং গীতার নিষ্কাম ব্রতের আদর্শ জাতির মুক্তিব্রতে যুবশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। এদেরই শীর্ষে এসে দাঁড়ালেন—শ্রীঅরবিন্দ। অত্যাচারে চঞ্চল যুবশক্তি মনুষ্যত্ব আয়ত্বের এক কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে নিজকে প্রস্তুত করে আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হলেন। এদের আত্মাহুতিতে সুপ্ত জাতির চমক ভাঙতে লাগল। এক একটি মনুষ্যত্বে দীপ্ত যুবক চরম দান—আত্মদান করে জাতির জড়তা ভাঙ্গতে অগ্রসর হলেন। সরকারী দমননীতি তীব্র হয়ে উঠল প্রথম বিশ্ব মহাসমরের কালে। বিপ্লবীদলের প্রচেষ্টা বিশ্বাসঘাতকতায় ও প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজনের ন্যূনতার জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল। জাতির ভবিষ্যৎ হল অনিশ্চিত।

গান্ধীজির নেতৃত্ব গ্রহণ

মহাসমরের অবসান হয়েছে। বিদেশী সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে এই দেশের প্রচুর সম্পদ আহরণ করেছে এবং বহুলোককে বলি দিয়েছে। যুদ্ধাবসানে বহুলোক বেকার হয়েছে। যুদ্ধকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যুদ্ধাবসানে রাউলাট আইন প্রণয়ন করে ভারতের দাসত্বকে আরও মজবুত করবার ব্যবস্থা করল। খেলাফতের ব্যাপারে

ভারতের মুসলমানেরা ইংরেজের উপর বিরক্ত। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের বিজয়ী নায়ক গান্ধীজি ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি রাউলাট আইনের প্রতিবাদ করবার জন্য সমগ্র নরনারীর কাছে আবেদন করেন। জাতির প্রত্যেকটি নরনারী আপন অন্তরে গান্ধীজির কণ্ঠ শুনতে পেল। সমগ্র জাতি অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গান্ধীজিকে মুহূর্তের মধ্যে জাতি চিনে নিল। প্রতিবাদ সভা হতে বিক্ষোভ হল। জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড করে ব্রিটিশ জাতির ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার প্রভৃতি ঘটনায় জাতি রূঢ় আঘাত পায়। গান্ধীজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতায় নিষ্পৃষ্ট জাতির সুপ্তি ভাঙ্গল। প্রায় লক্ষ লোক কারাবরণ করল। একটা জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে দানা বাঁধল। পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের কঠোর আঘাতেও জনগণ শান্ত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করল। রেঙ্গুণ হতে পেশোয়ার এবং শ্রীনগর হতে তিউতিকরণ পর্যন্ত সমগ্র জাতিদেহে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। এই জনজাগৃতির ফলে সুদীর্ঘকালের জড়তা কাটতে লাগল। অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক প্রস্তুতির অধ্যায় বা জনজাগৃতিরই আন্দোলন।

চৌরিচোরায় জনতা হিংস্র পথ গ্রহণ করায় গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করলেন। গান্ধীজি জানতেন যে গণদেবতাকে সৎপথে পরিচালিত করলে যেমন এক মহাকল্যাণকর ফল পাওয়া যায় তেমনি গণদেবতা বিপথগামী হয়ে দানবরূপ ধরলে তার হিংস্র বা পশুপ্রকৃতি মনুষ্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যার সম্পদ—সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানুষের সকল মহৎ বস্তুই ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয় সভ্যতায় গণেশের কল্পনা অপূর্ব। হাতীর চোখ ছোট, কান বড়, তার দেহ ও শক্তি সম্পর্কে সে অজ্ঞাত। মাহুতই তার চালক। জনগণও অসীম শক্তির অধিকারী। দৃষ্টি বুদ্ধিহীন নেতৃত্ব তাকে বিপন্ন করে নিজে বিপন্ন হয়। দেশ রসাতলে যায় আর প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব জাতিকে বাঁচায়।

গান্ধীজি মানুষের উন্নততর জীবনের জন্য স্বাধীনতা চেয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে স্বাধীনতা লাভ করুক তা চাইতেন না, কেননা তা বনের হিংস্র জানোয়ারের মত অপরের অকল্যাণ সাধনের মধ্যে তৃপ্তি

খুঁজবে। "The world is not entirely governed by logic. Life itself involves some kind of violence and we have to choose the path of least violence', বলেছেন গান্ধীজি। তিনি বস্তুতান্ত্রিক বা জড়বাদী রাষ্ট্রসমূহের :দিকে চেয়েই ইতিহাসের শিক্ষার ওপর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে একশ্রেণীর লোক আইন সভায় প্রবেশের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজি কারাগার হতে বেরিয়ে এসে গঠনমূলক কর্মতালিকানুযায়ী কাজে লেগে গেলেন। তিনি জানতেন যে, ধ্বংসমূলক কাজ মানুষের নেতিবাচক মনোবৃত্তি তৈরী করে। নেতিবাচক মনোবৃত্তি মানুষের সৃজনশক্তি নষ্ট করে দেয়। তিনি বিষ নাড়াচাড়া করতেন কিন্তু বিষ যাতে দেহকে বিষাক্ত করে ধ্বংস বা মৃত্যুকে ডেকে আনতে না পারে, সেজন্য প্রতিষেধক রূপে গঠনমূলক কাজের উপর জোর দিতেন।

মাতৃ-এষণার বিকাশই ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীজি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই এই মাতৃ-এষণার দিক হতে পরিচালিত হয়েছেন। (তিনি বলেছেন: 'I believe that the sumtotal of the energy of mankind is to bring us down but to lift us up, and that is the result of definitely if uncon-cious working of the law of life. The fact that mankind persists shows that the cohesive force is greater than the disruptive force, centripetal force greater than centrifugal.) তিনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ব্রতে সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালন করেছিলেন এবং সংগ্রাম পরিচালন কালে সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন। গঠনমূলক কাজে মানুষের সৃজনীশক্তি শুধু অটুট থাকে না, এর বিকাশও হয়। তিনি এই সৃজনী শক্তির বিকাশের দ্বারা মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করবারই চেষ্টা করেছেন। (গান্ধীজি উন্নত মানুষ গঠনের উদ্দেশ্যে চেয়েছেন: "Before civil resistance can be practised on a vast scale, people must learn the art of civil or voluntary obedience. Our obedience to the government is through fear and the reaction against it is

either violence of itself or that species of it, which is cowardice. But through khadi we teach people the art of civil obedience to our institution which they have built up for themselves. Only when they have learnt that art, can they successfully disobey something which they want to destroy in the non-violent way.")।

গান্ধীজি চরকাকে কেন্দ্র করেই গঠনমূলক কাজ চালিয়েছেন। চরকাকে গ্রহণ করবার যুক্তি ভাববিলাসীর খেয়াল নহে, এর পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বুদ্ধি রয়েছে। উন্নততর মানুষ সৃষ্টি করতে হলে আত্মিক বিকাশ আবশ্যক আত্মিক বিকাশ বা মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য ধীর শান্ত অবস্থা আয়ত্তের আবশ্যক হয়। চরকায় সুতা কাটবার ফলে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে না। মনকে শান্ত সংযত করবার পক্ষে চরকা এক অমোঘ মন্ত্র। শান্ত সংযত মন না হলে অন্তর্দৃষ্টি খোলে না এবং অন্তর্দৃষ্টি না খুললে জীবনের সার্থকতা কোথায়? এ ছাড়া চরকা গ্রহণের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার (Decentralization) প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় এবং মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয় না। কেন্দ্রাভিমুখী করার পিছনে মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আছে এবং কেন্দ্রাভিমুখী (centralization) ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী হয়ে মানবতাকে পীড়া দেয়। গান্ধীজির 'সত্য ও অহিংসা' এবং চরকা গ্রহণের পিছনে মানুষের প্রতি গভীর দরদ ও মমতা ফুটে উঠেছে।

আইন অমান্য আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমগ্র জাতির জাগৃতি এসে গিয়েছিল। বিদেশী সরকার চঞ্চল হয়ে উঠে এবং ভেদনীতির উপর অত্যন্ত জোর দিতে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মতলববাজদের মদত দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয় এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করে। ধর্মের দিক হতে হিন্দুরা স্বাধীন কিন্তু আবার সমাজের দিক হতে বন্ধনমুক্ত নয়। মুসলমানরা সমাজের দিক হতে স্বাধীন কিন্তু ধর্মের দিক হতে বন্ধনমুক্ত নয়। বিদেশী শক্তি এ পার্থক্যের সুযোগ বরাবর গ্রহণ করেছে। সরকার তাদের তাঁবেদার লোকদের দিয়ে

মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে থাকে এবং মুসলিম লীগের পাল্টা হিসাবে হিন্দু স্বার্থ-রক্ষার অজুহাতে হিন্দুমহাসভাও দানা বেঁধে উঠে। গোষ্ঠি বা সাম্প্রদায়িকতা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও এতে মাদকতা রয়েছে। মতলববাজরা একে নিজেদের প্রয়োজনে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেদের কাজ হাঁসিল করে থাকে। এতে সাধারণ লোক প্রতারিত হয়। এই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়তাবাদী শক্তি বা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাধা দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। এদিকে গান্ধীজি জাতির নাড়ী ধরে বসে আছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করেন। উহা ইতিহাসে আইন অমান্য আন্দোলন নামে পরিচিত। হিন্দীতে 'সবিনয় অবজ্ঞা' বলা হয়েছে। Civil disobedience বলতে গান্ধীজি নীতিহীন অর্থাৎ চুরি ডাকাতি খুন সম্পর্কিত আইন অমান্য মনে করেন না। তিনি একে বিশুদ্ধ ধরনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন মনে করেন। অহিংসাকে উপেক্ষাও অপমানকর ও অশ্রেদ্ধয় মনে করতেন। অসহযোগ আন্দোলন জনজাগৃতির আন্দোলন, কিন্তু এ সংগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করারই আন্দোলন। গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা জাতির মনে ব্রিটিশশক্তি সম্পর্কে যে ভীতি ছিল, তা দূর করেন।

জাতির প্রতি গান্ধীজির এই 'অভয়' মন্ত্রের দান—তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। আইন অমান্য আন্দোলনের কালে ক্ষমতা হারাবার আতঙ্কে চঞ্চল ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি চালায় কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সন্ধি করতে হয়। এটাই ইতিহাসে গান্ধী-আরুইন চুক্তি নামে খ্যাত। এ সন্ধিতে অপমানিত ক্ষমতাগর্বী ব্রিটিশ সরকার পুনরায় কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। সমগ্র দেশময় এক অত্যাচারের বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ইহা দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন নামে পরিচিত। কিছুদিন পর একশ্রেণীর লোক পুনরায় আইন সভায় প্রবেশের জন্য উৎসুক হলে গান্ধীজি তাঁদের আইন সভায় প্রবেশের অনুমতি দিয়ে নিজে হরিজন আন্দোলন ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ("Constructive work therefore is for a non-violent army what drilling etc. for an army designed for bloody warfare. The more therefore the progress of constructive programme, the

greater is there the chance for civil-disobedience." এ বোধ হতেই গান্ধীজি দেশে আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতির অধ্যায় রচনায় ব্যস্ত থাকতেন)।

জাতীয় কংগ্রেস গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পর বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক কংগ্রেসে প্রবেশ করেন। এমন বহু দল বা উপদল কংগ্রেসে ছিল যাঁরা গান্ধীজিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিচক্ষণ সেনাপতি রূপেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার সুযোগ এবং গান্ধীজির নেতৃত্বের আড়ালে আত্মপ্রতিষ্টার চেষ্টায় থাকতেন। সংগ্রামের কালে কোন কোন শ্রেণীর লোক সরে পড়তেন এবং সংগ্রামের অবসানে আবার দলাদলি সৃষ্টি করে অর্থ ও প্রতিপত্তির দৌলতে প্রতিষ্ঠা করে বসতেন। সংগ্রামের যোদ্ধারা সংগ্রামের অবসানে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় এবং গঠনমূলক কাজে যখন ব্যস্ত থাকতেন তখন এরা কংগ্রেসের মোড়লী করতেন।

মেরুদণ্ডহীন এই লোভী ব্যক্তিরা কংগ্রেসের পক্ষে কত বিপজ্জনক তা মহাত্মা গান্ধী যে জানতেন না, তা নয়, কিন্তু এদেরে ঠেকিয়ে রাখার মত ব্যবস্থা কংগ্রেসে ছিল না। কখনও সুতাকাটা বাধ্যতামূলক করে এদের কংগ্রেসে প্রবেশ রোধের চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু পরিশেষে টেকেনি। তিনি গঠনমূলক কর্মিদের বললেন, "তোমরা গ্রামে চলে যাও, গ্রামবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যাও। একটি গ্রামে একজন কি দুজন বসে পড়। তাদের নিষ্কাম ভাবে সেবা করে যাও। বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। গ্রামবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করে সুন্দর (aromatic) গ্রাম গঠন কর। তোমরা অনেকদিন এক এক গ্রামে থাকবে এবং সেখানে স্থানীয় কর্মী পাওয়া গেলেই leave the throne to the others and find your place elsewhere, অন্য স্থানে গিয়ে নিজের স্থান করে নাও।" তিনি পুনরায় আমাদের বললেন, "আগে চাই মানুষ, তারপর গঠনমূলক কাজ। নিষ্কামব্রতীই মহৎ কাজ করতে পারেন। এক কথায় তোমাদের সন্ন্যাসী হতে হবে।" তিনি হিন্দুমুসলমানের মনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, হরিজন সেবা, গ্রামে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা, গ্রামে নতুন শাকসব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে উপদেশ দেন এবং বলেন, 'গাড়ীতে ঘোরা অপেক্ষা গ্রামে গ্রামে হেঁটে অনেক কাজ করতে পেরেছি, এক একটি গ্রামে যদি সাতদিন করে থাকা সম্ভব হত, তা হলে অনেক ফল পাওয়া

যেতো। (১৯৩৪ সালের 'দেশ'-এর ৩০শ সংখ্যায় গ্রন্থকারের সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত)।

ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারে বিচলিত এক শ্রেণী যুবশক্তি হিংসার পথ গ্রহণ করেছিলেন। সরকার মুষ্টিমেয় হিংসাপন্থীর আচরণে চঞ্চল হয়ে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের সহস্র সহস্র নিরপরাধ যুবককে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করে রেখেছিলেন। এরা বিপ্লবীদের শিক্ষায় বঞ্চিত ছিল বলে অতি সহজেই প্রলোভনে পড়ে এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণদীপ্তিতে গঠিত সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবীদলের আদর্শকে বিকৃত করে। এই অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্যই ব্রিটিশ সরকার আদর্শহীন নিরপরাধ যুবকদিগকে বেপরোয়া আটক করেছিল। ব্রিটিশ শক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আদর্শহীন অনাচারী যুবকদের বিপ্লবীর কৌলিন্য লাভের ফলে মনুষ্যত্বের আদর্শে গঠিত, দৃঢ়নিষ্ঠ, বলিষ্ঠ পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার বিপ্লববাদ যে তীব্র আঘাত পেয়েছিল তা হতে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এই আদর্শহীন অনাচারীরা পরবর্তী কালে বিভিন্ন পর্যায়ে কখনো জনযুদ্ধের নামে, কখনো চটকদার বুলির আবরণে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য করেছে এবং অনায়াসে ক্ষমতা দখলের ব্যবসাকে অটুট রাখবার জন্য বিদেশী সরকারের এজেন্ট রূপে কাজ করে গৌরববোধ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে-এরা মুসলিম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সমগোত্র-রূপেই দেশদ্রোহী পর্যায়ে পড়েছে।

আগস্ট বিপ্লব

১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের সাথে জার্মানীর যুদ্ধ বেঁধে উঠলে বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে না জিজ্ঞাসা করেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যরা পদত্যাগ করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের রক্ষকদের মুখোস খুলে দিলেন। গান্ধীজি তাঁর প্রিয় শিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবেকে প্রথম সত্যাগ্রহীর মর্যাদা দিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এগারটির ভিতর আটটি প্রদেশের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন এবং গান্ধীজির নির্দেশে মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার সদস্যরা, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যরা যুদ্ধের বিরোধিতা করে কারাবরণ করলেন। তিনি এ পদ্ধতিতে সমগ্র বিশ্বের কাছে স্বাধীনতা ও

গণতন্ত্রের রক্ষক পরাধীন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাহীন ভারতবর্ষের অবস্থা উপস্থিত করলেন এবং ব্রিটিশ জাতির শুভবুদ্ধির কামনা করলেন। মাতৃ-এষণার আদর্শেই ভারতের অহিংস গণ-বিপ্লব চলল। ক্ষমতা ত্যাগে অনিচ্ছুক ব্রিটিশ সরকার ক্রীপস মিশন পাঠিয়ে ভারতকে ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা করল। রুষ্ট ভারত বেপরোয়া হয়ে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রে দীক্ষা নিল; ভারতের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াল। গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নির্দেশ রেখে গেলেন, জাতির নেতারা যখন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য থাকবেন না, তখন প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই নিজের বিবেক ও শক্তি অনুযায়ী চলবেন এবং জাতিকে পরিচালিত করবেন!

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

ব্রিটিশ শক্তিও তার সমগ্র বর্বরতা নিয়ে অস্ত্রহীন ভারতবাসীর উপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ব্রিটিশের লৌহবন্ধন জীর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশশক্তি শিথিল হয়ে পড়ল। রণাঙ্গণের নিকটবর্তী অঞ্চল বাঙ্গলাকে অনশনে রেখে শুধু বুকে হাঁটাল না, পঞ্চাশ লক্ষ লোককে বলি দিল এবং বেপরোয়া নোট ছেড়ে সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য ভারতের বিপুল সম্পদ হরণ করে ভারতকে একেবারে উজাড় করে দিল। আগস্ট বিপ্লবের আঘাতে ও সামগ্রিক যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে। আগস্ট বিপ্লবের কালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাইরে থেকে আগস্ট বিপ্লবকে শক্তিশালী করে তুলেছেন। নেতাজী বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভিযানও জাতির মানসে এক বিপুল চাঞ্চল্য এনে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হেনেছিল। নেতাজীর প্রকাশভঙ্গীও প্রাণৈষণারই প্রকাশ। ইতিহাসের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই: গান্ধীজির সঙ্গে নেতাজীর মতদ্বৈধ হয়েছিল—স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ নিয়ে। নেতাজী কংগ্রেসের বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও গান্ধীজির মহত্ব ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা পোষণ করেননি। সীতাকে রাম অগ্নিপরীক্ষা করেছিলেন। তিনি কখনও রামের উপর বিশ্বাস হারাননি; নেতাজীও কোন বাক্যে বা কর্মে মহাত্মাজির প্রতি অবিশ্বাস বা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেননি। তিনিই তাঁকে জাতির জনক বলে আখ্যা

দিয়েছেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মহানায়করূপে। গান্ধীজির সাথে নেতাজীর অহিংসা ও হিংসা নীতির প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। উভয়েই ভারত-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য নেতাজী তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে রাজনীতিক হিসেবে পরিচয় না দিয়ে 'ভারত-পথিক'ই বলেছেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রবুদ্ধ। তাঁর অন্তর-চেতনার সন্ধান পেতে হলে ভারতপথিককে খুঁজতে হবে। তিনি ভারতীয় সমাজবাদকে গ্রহণ করেছেন, তা দ্বান্দ্বিক জড়বাদী মার্ক্সীয় দর্শন হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি মার্ক্সীয় মানব-ইতিহাসের স্বৈরতন্ত্রী, একদেশধর্মী বিবর্তনবাদের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না।

ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ

ক্ষমতা ত্যাগে অনিচ্ছুক অথচ দায়িত্বসম্পন্ন ক্ষমতাহীন শক্তি ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের বন্দীশালা হতে বের করে এনে শাসনভার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আবার সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির দুর্দিনের বন্ধু ও তাঁবেদার প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকারী মহান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শরিক সাজিয়ে দিয়ে টালবাহানা সুরু করল। ভারতে থাকবার কোন সুযোগই কংগ্রেসের কাছে পাবে না মনে করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বা ব্রিটিশ জাতির প্রতিক্রিয়াশীল অংশ মুসলমানদের ভাব-প্রবণতাকে চাঙ্গা করে তাদের কাছে পাকিস্তানের ছবি তুলে ধরল এবং এই পাকিস্তানকে বাস্তব করে তুলবার উদ্দেশ্যে পাল্টা বিপ্লব (Counter-revolution) সৃষ্টি করল। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মানুষের বন্যমনকে চাঙ্গা করে তাণ্ডব বাঁধিয়ে দিল।

জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিণতি আসন্ন, কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি ও মুসলিম লীগের নগ্ন মূর্তি আজ সমস্ত বর্বরতা নিয়ে স্বাধীনতাকামী শক্তিকে রুখে দাঁড়িয়েছে। জাতির মহানায়ক এ শক্তির বিকট মূর্তিতে বিচলিত নন কিন্তু তাঁর শিবির আজ দোদুল্যমান। গান্ধীজি বললেন, 'কারাগার হতে মুক্তি পাবার পর তাঁর অধিকাংশ সহকর্মী ক্লান্ত. হতোদ্যম, সংগ্রাম চালাবার মত উদ্দীপনা তাঁদের নেই। ব্রিটিশ সরকারের সহিত তাঁরা একটা মীমাংসা করবার জন্য উৎসুক। এর চেয়েও মারাত্মক কথা হল, এঁরা ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত'। তিনি আরও

বললেন, 'কংগ্রেসের মৌলনীতিও এবার বর্জন করবার আশঙ্কা রয়েছে। হিন্দুরা অখণ্ড, ভারতবর্ষও অখণ্ড। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া পূর্ণ স্বরাজ আসবে না। রামরাজ কথায় জিন্না সাহেব আপত্তি করেন কিন্তু রামরাজ বলতে আমি হিন্দুরাজ বুঝি না। রামরাজ হল—Kingdom of Heaven ইনসাফরাজ বা স্বর্গ রাজ্য। অর্থাৎ এমন একটি শাসনব্যবস্থা—যেখানে প্রত্যেক জীব সুবিচার পাবে। ভগবান যদি আমাকে শক্তি দেন তবে এ মৌলনীতিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আমি জীবনপণ সংগ্রাম করে যাব।'

একদিকে বাদশা খান সহ কিছু নেতা ব্যতিত অধিকাংশ নেতাদের দুর্বলতা, অন্যদিকে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ও লীগ নেতৃত্বের বর্বরতায় সমগ্র দেশের বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগ কোটি কোটি মানুষের গৃহে ক্রন্দনের রোল তুলে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের আত্মাকে তৃপ্ত করেছে। ভারত ত্যাগ করলে ভারতে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে মানবতার চরম দুঃখ ডেকে আনা হবে বলে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ এতকাল যে ভারত ত্যাগের অনিচ্ছার অজুহাত দিত তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মাটিতে তাদের শিকড়কে দৃঢ় রাখবার জন্য মুসলিম লীগকে দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর শাসন হতে মুক্ত করবার জন্য ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করা হল, কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি করে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের উপাসকরা সাড়ে চার কোটি মুসলিমের ললাটে লীগের ভাষায় দাসত্ব লেপে দিয়ে যাবার কালে তাদের কথা ভাবল না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও ইচ্ছা নিঃসন্দেহে সব সময় মান্য কিন্তু সেই মত ও ইচ্ছার মান্য হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে তার পিছনে যুক্তি ও সমর্থন থাকা চাই। সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারও কোন অংশে ন্যূন নয় এবং সে অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের আইনের। তা সর্বজনে সমানভাবে প্রযোজ্য। এই অধিকারকে কোন ভাবে খর্ব করার চেষ্টা পীড়নেরই নামান্তর হবে।

এ সত্যকে অস্বীকার করে ব্রিটিশ স্বার্থে গঠিত এই লীগ নেতৃত্বে শুধু এই দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, দরিদ্র মুসলমানদের প্রতিও জঘন্যতম নিষ্ঠুরতা করে তারই ভিত্তিতে পাকিস্তান গড়ে তুলেছে। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানরা জাতিতত্ত্বের দিক হতে পৃথক নহে কিন্তু লীগ নেতৃত্বের দুষ্কার্য ও বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানদের প্রতি সঙ্কীর্ণবাদীদের বিদ্বেষ ও বৈরীতা পোষণের সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ যতকাল থাকবে ততকাল পাকিস্তান ও ভারত কারও পক্ষেই কল্যাণ লাভ শক্ত।

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোই শুধু ভাঙ্গেনি, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও সামগ্রিক যুদ্ধের দাপটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বসে পড়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত হতে বিদায় নিল কিন্তু বিদায়ের বেলায় ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ যে নির্মম কার্য করেছে, তা তাদের দুইশত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন নির্দয় অত্যাচার ও নির্মম শোষণের সাথে সঙ্গতি হারায়নি বরং উহা তার সমস্ত হিংস্র বর্বরতা নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করে রক্তাপ্লুত করে গিয়েছে। সেই রক্তক্ষরণ আজও বন্ধ হয়নি। বিদায়ের বেলায় সোয়া ছয়শত সামন্ত রাজ্যকে স্বাধীন করে গিয়ে বল্কানের অবস্থায় পরিণত করবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।

দেশ ব্যবচ্ছেদ হতে চলেছে। এ সময় আধ্যাত্মিক ভূমি ভারতে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। পাঞ্জাবের লাট পশ্চিম পাকিস্তানে সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের সম্মতি নিয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করলেন আর পূর্ব পাকিস্তানের দিকে সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করতে লেঃ জেনারেল টাকার অসম্মত হলেন। তখন গান্ধীজি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দিল্লি, বিহার ঘুরছেন। বিহার থেকে নোয়াখালি যাবার জন্য কলকাতা এলেন। কলকাতায় মুসলিমরা গান্ধীজিকে ধরলেন। অখণ্ড বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি গান্ধীজির শরণ নিলেন। তিনি পাকিস্তানের এই স্রষ্টাকে বললেন, 'যদি নোয়াখালিতে আগুন জ্বলে তবে তোমাকে আমার সঙ্গে আমরণ অনশন করতে হবে।' আমি আর তুমি এখানে একসঙ্গে থাকব, আর পুলিশ সৈন্য থাকবে না। তিনি গান্ধীজির প্রস্তাব মেনে একসঙ্গে বাস করতে লাগলেন। পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশের বিরাট সৈন্য বাহিনী চুয়াত্তর মাইল দীর্ঘ লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিলকে রক্ষা করতে পারেনি। এ বিশাল মিছিল অবিরাম আক্রান্ত হয়েছিল, লক্ষ হিন্দু শিখ নারী অপহৃত হয়েছিল, ছয় লক্ষ মানুষ বলি হয়েছিল। চৌদ্দ লক্ষ লোক জখম হয়েছিল, আর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙ্গালীরা হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল। আর সেদিন পশ্চিম অঞ্চল সাম্প্রদায়িক আগুনে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ২০শে আগস্ট লক্ষ লক্ষ লোকের সভায় সুরাবর্দি বাংলা ও পাঞ্জাবের খবরের বিশ্লেষণ করে বললেন: 'It was only possible for the Mahatma, I have now realised the greatness of Mahatmaji!' আর মাউণ্টব্যাটেন মহাত্মাজিকে লিখলেন: 'In the

Punjab we have 55000 soldiers and large scale rioting on our hands. In Bengal our forces consist of one man and there is no rioting. As a serving officer, as well as an administrator, may I be allowed to pay my tribute to the one man Boundary force.'

ভারত ব্যবচ্ছেদ

ব্রিটিশশক্তি ভারতে থাকবার সামান্যতম শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। সামগ্রিক যুদ্ধের শোষণ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তির আঘাতে। তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট রাত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত হতে বিদায় নিল কিন্তু তার বিদায় সদিচ্ছা প্রণোদিত তো নয়ই বরং বর্তমানে আর্থিক দুর্যোগের অবসানে পুনরায় যাতে ভারতে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে, তারই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভারত ত্যাগ করল। মুসলমানদের ভাবপ্রবণতাকে মূলধন করে তাদের জন্য ভারতের পূর্বাঞ্চলে পূর্ববাঙ্গলা এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পশ্চিম পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুকে নিয়ে ভারত বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র বা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল। এই ব্যবস্থা নির্মম, এ ব্যবচ্ছেদে দরিদ্র জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হল। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক দিক হতেও ভারত ব্যবচ্ছেদ হয় না। এ রাজনৈতিক অস্ত্রোপচার প্রকৃতিবিরোধী। জল কাটলে যেমন দুভাগ হয় না, ভারতবর্ষও ব্যবচ্ছেদ হয় না। অশুভ বুদ্ধি হতে জাত এই পাকিস্তানের বিনাশ তার জন্মের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু পাল্টা বিপ্লবকে (Counter-revolution) এড়িয়ে জাতিকে অন্তর্বিরোধ বা ধ্বংস হতে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মাজির পরামর্শও গ্রহণ না করেই এই অস্বাভাবিক অবস্থাকেও স্বীকার করলেন। কিন্তু এ দেশব্যবচ্ছেদের ভিতর জাতির দুর্যোগের আভাস রয়েছে। একবার ব্যবচ্ছেদ সুরু হলে এ বিভেদমনোবৃত্তি বাড়তেই থাকবে। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বস্তু কোনমতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না, যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়। ধর্ম যখনই দুর্বল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।' ব্যবচ্ছেদের বিপদ থেকে যাবে এবং খণ্ড খণ্ড হবার প্রবণতা জাতির দুর্যোগ ডেকে আনবে।

এ সময় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিভ্রান্ত এবং রাজশক্তি হাতে লওয়ার জন্য উৎসুক। গান্ধীজির কিছুকাল অপেক্ষা করার পরামর্শ অস্বীকার করলেন। দেশ ব্যবচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতা করলেন বাদশা খান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেনাপতি ও নেতা পাখতুনিস্তানের জনক খান আবদুল গফুর খাঁ সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত যোদ্ধাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট গোলাম তথা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে ঠেলে দেওয়ার দুর্ভাগ্যকেও মেনে নিতে হল। সাম্প্রদায়িকতার কাছে জাতীয়তাবাদের আত্মসমর্পণ, অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে খণ্ডিত ভারতকে স্বীকার; স্বার্থপর ও লোভী নেতৃত্বের কাছে নিঃস্ব মানুষের আত্মনিবেদন মর্মস্পর্শী। এই ব্যবস্থার দ্বারা ভারতকে শুধু অর্থনৈতিক দিক হতে কিম্বা রাজনৈতিক দিক হতেই পঙ্গু করা হয়নি, দেশরক্ষা ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করে তোলা হল। প্রত্যেক জীব জন্তুর বা বস্তুর যেমন নিজস্ব কাঠামো বা গঠনভঙ্গী আছে, প্রত্যেক দেশেরও একটা নিজস্ব গঠনভঙ্গী আছে। ভারতের স্বাভাবিক দেশ রক্ষা ব্যবস্থা—উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও পূর্বে সিঙ্গাপুর। ইংরেজ আমলেও এই ব্যবস্থার ভিত্তিতেই চলেছিল। ভারত ব্যবচ্ছেদে সেই ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে।

আজ গিলগিট, কচ্ছ হতে সিকিম-দার্জিলিং হতে বঙ্গোপসাগর, কোচবিহার হতে ত্রিপুরা আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত হতে ব্রহ্ম সীমান্ত ধরে লুসাই পাহাড় পর্যন্ত দেশ রক্ষার জন্য স্থলভাগেই চারিটি ব্যবস্থার আবশ্যক হয়েছে। এ ছাড়া বিরাট সমুদ্রের জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনীর এবং আকাশপথের জন্য বিমানবাহিনীর ত প্রয়োজন রয়েছেই। ভারতের সহিত পাল্লা দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে পাল্টা দেশরক্ষা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, অধিকন্তু তাকে আফগানিস্থান এবং ইরান সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে। পাকিস্তানের প্রতি দরদের আতিশয্যে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে এই প্রকার গুরুতর দেশরক্ষা সমস্যার সামনে ফেলেনি; প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা নির্ভর করে অর্থ ও অস্ত্রের উপর। পাকিস্তান তার রাজস্বের তিনচতুর্থাংশ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করলেও তা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ের অর্ধেক মাত্র। সুতরাং শক্তির দিক হতে উহা ভারতের সমান ত নয়ই, অর্ধেক। সামরিক দিক হতে অর্ধেক ব্যবস্থা, কোন ব্যবস্থা না রাখারই সামিল।

এ ছাড়া কাশ্মীরে উপজাতি হানাদার লেলিয়ে দেওয়ার পিছনেও ব্রিটিশের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ধূর্তনীতি সক্রিয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে ঘায়েল করার মতলব ছাড়াও দ্রুত রাজনৈতিক পঙ্গুত্ব আনাই এর পিছনের মতলব বলে মনে হয়। আর পাকিস্তানের যে এক চতুর্থাংশ আয় আছে, এর দ্বারা শাসন ব্যবস্থা নির্বাহই শক্ত হয়। এই অবস্থায় জাতি গঠনের ব্যাপারে হাত দেবার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই বললেই হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই হিসাব পূর্ব হতে করে সামরিক ভাষায় রণনৈপুণ্যের দিক হতে পশ্চাদপসরণ (stratagical retreat) করে পাকিস্তানে ছদ্ম আবরণে শক্তি সমাবেশের মতলবে রয়েছে এবং পাকিস্তানকে অবলম্বন করে ভারত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জানে যে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে না। যার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। শুধু সামরিক দিক নয়, শাসনব্যবস্থা নির্বাহের দিক হতেও বহু বৎসর বিদেশীর সাহায্য তাদের প্রয়োজন। ইতিহাসের আর এক সঙ্কটকালে অজ্ঞ, নিরীহ, সরল প্রকৃতির মুসলিম-জনগণের অদৃষ্ট নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রয়োজনে সৃষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কি খেলাই না খেলেছে, তার ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বিচার করবে।

দেশবাসীর শুভবুদ্ধিই হচ্ছে দেশের সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা বাহিনী। স্বল্পকালের জন্য জনগণের মতিভ্রম হলেও ঠিক পথে ফিরে আসতে তাদের দেরী হয় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আঘাত করবার জন্য মুসলিম লীগকে গড়া হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতাকে বানচাল বা স্বাধীন ভারতকে দুর্বল করে রাখবার মতলবেই পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পাকিস্তানের মধ্যে তাদের খেলা দেখালেও স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে মুসলিম লীগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তি যে খেল দেখিয়েছে, তার পাশ কাটিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তি শুধু ভারতেরই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করেনি, মালয়, ব্রহ্ম ও সিংহলকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বজ্রবন্ধন হতে মুক্ত করেছে। বিশ্বের সর্বপ্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে বিশ্বের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতালোলুপ শক্তিগুলো দুর্বল শক্তিকে গ্রাস করবার জন্য নিশ্চয়ই ফিকিরে থাকবে।

ব্রিটিশের অনুগ্রহ ও প্রয়োজনে সৃষ্ট পাকিস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগৃহীত ও বশংবদ ব্যক্তিরা সমাসীন কিন্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তি সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা এনেছে, সেই স্বাধীনতাকে ধ্বংস করাই ব্রিটিশের শাসনশক্তি ত্যাগের পরবর্তী প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা ; তারই উপর লক্ষ্য রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণের সঙ্গে পোড়ামাটি (scotch-earth) নীতি গ্রহণ করে সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব বাঁধিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটাশ্রিত মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানদেরও হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তারই বিষুচক্ররূপে হিন্দুদিগকেও মুসলমানদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের একশ্রেণীর লোকের মস্তিষ্কে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে উস্কানি দিতে থাকে এবং ব্রিটিশের ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলে চাঙ্গা করতে থাকলে এই সরলচিত্ত লোকরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মসগুল হয়ে উঠে। মুসলিম লীগের আক্রমণে দিশেহারা হিন্দু এদের তাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। ব্রিটিশের আশীর্বাদে ও গণতন্ত্রের আগমনে ভীত ভারতের সামন্ত রাজন্যদের অর্থে এবং যুদ্ধাবসানে ছাঁটাই ব্যক্তিদের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানটি ফেঁপে উঠে। দেশময় অরাজকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে যায়। দেশের ধনসম্পদই যে এতে ধ্বংস হয়ে যায় তাহাই নয়—এই বিষুচক্রের খপ্পরে পড়ে দশ লক্ষ নির্দোষ লোক বলি হয় এবং এককোটীর উপর লোক গৃহহারা, বিত্তহারা হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। আমরা জেনেছি যে মানুষের পারস্পরিক হানাহানির মূলকথা শুধু অজ্ঞানতাই নয় সে অজ্ঞানতার মোহ হতেও মুক্ত না হবার স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টাও রয়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থের প্রয়োজন মানুষ সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য কথা আওড়াতে কখনও সংকোচ করে না।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যা ও ষড়যন্ত্র

ভারতের মুক্তিদাতা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই দুষ্ট খেলার ঘ্রাণ পান এবং তিনি যে কোন মূল্যে এই উন্মত্ততা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। বিষুচক্রে পড়ে জাতি তখন দিশেহারা, জাতীয়তাবাদ তখন নির্বীর্য, সাম্প্রদায়িকতা তখন মাথা চাড়া দিয়ে ভারতকে গ্রাস করে ফেলেছে।— তারই সুযোগ নিয়ে জাতির মুক্তিদাতাকে হত্যা করে সাম্প্রদায়িকতা মারাঠা

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার কণ্টককে অপসারিত করার পরিকল্পনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ যদি এতেও না হয়, তা হলে বলপূর্বক (coup-d'-etat) জাতীয় সরকারকে অপসারিত করে সে স্থলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের বসাবার পরিকল্পনাও রচিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনা সফল হলে স্বভাবতই ইহা মুষ্টিমেয়ের শাসন অর্থাৎ ফ্যাসিষ্ট বা স্বেচ্ছা-চারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হত। কিন্তু গান্ধীজিকে হত্যা করলে সমগ্র জাতি রোষে ক্ষোভে গর্জন করে উঠে। পৃথিবী মর্মাহত হয়। ব্যথাহত জাতি কঠোর আঘাতে সম্বিৎ ফিরে পায়। গান্ধীজির একক দানে যেমন ভারতের স্বাধীনতা এসেছে, তাঁর মৃত্যুর দ্বারাও সকল ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে ভারতের স্বাধীনতার বনিয়াদকে শক্তিশালী করা হয়। জাতীয়তাবিরোধী দুষ্টগ্রহ সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিকে নির্মূল করা হয় এবং তারা যে শক্তি হতে পুষ্টি পেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারত, ব্রিটিশ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশাভরসা স্থল সেই সামন্ত রাজন্যশক্তিকেও ধ্বংস করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ায় তারা বিচলিত হয় এবং হায়দরাবাদের উপরও তাদের কম ভরসা ছিল না, কিন্তু হায়দরাবাদের ঘাঁটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ায় তারা অসহায় বোধ করতে থাকে। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই ছিল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরাট আশা-ভরসা, তা ধ্বংস করে দেওয়ায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে কিন্তু অপর শক্তির প্রচেষ্টায় যে অরাজক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে, তাতে এই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ তার ক্ষীণ আশা খুঁজে পেয়েছে এবং সাম্প্রদায়িতাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই দেখে প্রাদেশিকতার দিক চেয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী দেশ। এর অতীত ইতিহাস গৌরবপূর্ণ এবং এক উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পুষ্ট এই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের নিকট ভারতবর্ষ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতিবাদ রূপে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে গঠিত মানবতাবাদের ওপর দাঁড়িয়ে তার আগামী দিনের ইতিহাস রচনা করার উদ্যোগী হয়েছে। পীড়িত মানবতা ভারতবর্ষের কাছে—তার মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা,

আরব রাষ্ট্র এবং নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ানসহ এশিয়া তথা পৃথিবীর নির্যাতিত জাতি, রাষ্ট্র ও মানবতা আশার আলো পেয়েছে—এতে মানবতার শত্রুরা উদ্বেগ বোধ করছে। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে চারদিক হতে আক্রান্ত হয়েছে এবং ভারতকে টুকরো টুকরো করবার ফন্দীতে আছে। ভারতের বর্তমান ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিপতি সম্প্রদায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গত বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। এরা বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের দৌলতে এবং যুদ্ধের সময় দেশকে নির্মমভাবে শোষণ করে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাহায্য করে পুঁজিপতি বা ধনতন্ত্রবাদী হয়েছে। ধনতন্ত্রবাদ ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত বলে এদের কাছে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম বা মানবতাপ্রেমের প্রশ্ন অবান্তর; এরা দেশকে জাতিকে ও মানবতাকে অধিক শোষণ করবার জন্য ক্ষমতা যদি হাতে নিতে পারে, তবে তাদের দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও মানবতাপ্রেমের প্রমাণ দিতে পারে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধনতান্ত্রিকদের হাতেই ক্ষমতা থাকে বলে তারা সেই সকল দেশে-দেশ, জাতি বা মানবপ্রেমী।

ভারতের শাসন ক্ষমতা বর্তমানে এসে পড়েছে—যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, তাদের একাংশের হাতে। সেইদিন এরা ত্যাগ, তিতিক্ষা, নির্যাতন দুঃখ বরণের পথে জনচিত্ত জয় করেছিল এবং জনগণ তাদের পিছনে ছিল বলে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের হাতে রাষ্ট্রপরিচালন ক্ষমতা আসে। অবশ্য পরবর্তীকালে ক্ষমতাবিলাসী অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা কংগ্রেসের ভিতরে বিপুলভাবে ঢুকে পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেসের রূপ পরিবর্তন করেছে। জনগণের এই প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকা ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিপতিদের পক্ষে নিরাপদ নহে বলে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদিগকে নিয়ে গঠিত বর্তমান জাতীয় সরকারকে সমর্থনত করেই না বরং বিরোধিতা করে। এই ধনতান্ত্রিকরা জানে যে জনস্বার্থ রক্ষিত হলে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হয় না এবং যারা ত্রিশ বৎসরকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থের জন্য সংগ্রাম করেছে, তারা ধনতান্ত্রিকদের পুষ্ট করতে পারে না। কেননা ধনতান্ত্রিকরা পুষ্ট হলে জাতি বা জনগণ পুষ্ট হয় না এবং জাতি বা জনগণ পুষ্ট হতে পারে না। এইজন্য বর্তমান জাতীয় সরকার থাকলে এই ধনতান্ত্রিকরা ধন পুঞ্জীভূত করে ক্ষমতার কসরৎ দেখাতে পারে না। সুতরাং

জাতীয় সরকারের উৎপাদন বা উৎসন্ননীতির জবাবে 'চলো ধীরে' মন্থরপন্থী নীতি চলেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাত সৃষ্টি করে, বিদেশে নিকৃষ্ট মাল চালান দিয়ে, দেশে জনগণের ক্রয়সাধ্য নহে এই প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, কারখানা বন্ধ করে দিয়ে, মালপত্র গুদামে আটক করে, শিল্পপ্রসার না করে, অর্থ সিন্দুকে আটক করে, চোরাকারবারী বা কালোবাজারী ব্যবস্থাকে জিয়িয়ে রেখে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এনে বর্তমান জাতীয় সরকারকে হয় তাদের হাতের মুঠায় রাখতে চাহে অথবা এই সরকারকে সরিয়ে দিয়ে তাদের বাঞ্ছিত লোকদেরকে নিয়ে মুষ্টিমেয়ের শাসন কি বা স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা রাখতে চাহে। এই কাজে সাহায্যের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার জন্য বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভারতের ধনতান্ত্রিকদের আকর্ষণ খুবই বেশী এবং তাদের সাফল্য সম্পর্কে তারা খুবই আশাবাদী। তারা ডলারের দেশের সঙ্গে ব্যবসা করে ধন পুঞ্জীভূত করতে চায়, আর সেই ধনকে রাখবার জন্য শাসন ক্ষমতা চায়। এই শাসন ক্ষমতার নিরাপত্তা এবং ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় ধনতান্ত্রিকদের যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন এবং সেই রাষ্ট্রেরও ভারতীয় ধনতান্ত্রিক বা তার রাষ্ট্রের প্রতি আশীর্বাদ দানের প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একদিন লালাবাবুর মত বিকালবেলায় নিশ্চয়ই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়নি কিম্বা শাসন ও শোষণে বীতস্পৃহা আসেনি। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী শক্তির আঘাতে এবং সামগ্রিক যুদ্ধের চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বসে পড়ায় আরও ধনজনকে ধ্বংস হতে রক্ষা করবার মতলবে তারা ভারতবর্ষ হতে অতি অনিচ্ছায় সরে পড়েছে। কংগ্রেস সেদিন তার সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার খবর রেখেই এর সম্মুখীন হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা মনে করেন— একমাত্র শাসনক্ষমতা গ্রহণ না করে ব্রিটিশকে রেখে বা বিশ্বাস করে তাদের তাঁবেদার শক্তিকে জাতির শাসনভার গ্রহণের সুযোগ দিয়ে এর সাথে সংগ্রাম করতে পারে এবং ঘটনাচক্রে যদি ব্রিটিশ টিকে যায় তবে আরও বহুকাল এই

দেশের পরাধীনতা কায়েম হয়ে থাকবে। কংগ্রেস নেতৃত্বে বিরাট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সুদীর্ঘকালের পরাধীনতায় সকল দিক হতে নিঃস্ব জাতির শাসন ও গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতে আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোক এই দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কৃষক শ্রমিকের দরদী সেজে বসল। কিন্তু এদেশের লোকেরা জানে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। মৈত্রী ও স্বাধীনতা না থাকলে সাম্য আসে না। রাশিয়া বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসত্য, হিংসার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে মৈত্রীকে কেড়ে নিয়ে যায় এবং দলের শিকলে স্বাধীনতাকে বেঁধে রেখে দিয়ে জনগণকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা হয়, আর জনগণের গণতন্ত্র তখন আর হতে পারে না। সে অবস্থা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা সামাজিক স্বাধীনতা জনগণের না হয়ে গোষ্ঠির হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর লোকেরা একদিন বাঙ্গলার জাঁদরেল লাট স্যার জন এণ্ডার্সনের দয়ায় নিরাপরাধ বিনাবিচারে আটক বন্দী ছিল। এরা দাসখত দিয়ে কারামুক্তি লাভ করবার পর ব্রিটিশ সরকারের সাথে শুধু সংঘর্ষেই যায় নাই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্যও করে। এই দেশে ব্রিটিশের বজ্রবন্ধন দৃঢ় করতেও সাহায্য করেছিল। এরা মার্ক্সীয় দর্শনের চটকদার বুলি নিয়ে জনগণের কাছে হাজির হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তি আর মার্ক্সীয় অর্থনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য—সাম্যবাদ। সাম্যবাদে উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মত নিবে ও সাধ্যমত দিবে। মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তার মূলকথা—শ্রেণীশাসন ও শোষণের যন্ত্র হলো রাষ্ট্র। এই সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হলে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না। কিন্তু তা অবাস্তব বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান আর্থিক দুরবস্থা গত সামগ্রিক যুদ্ধ ও সেজন্য ব্রিটিশের বেপরোয়া নোট ছেড়ে সম্পদ হরণেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কৃষক শ্রমিকের বর্তমান দরদীরা সেই যুদ্ধে সাহায্য করে যে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে, তা ইচ্ছা করে ভুলে গিয়েছে। এরা সেদিন যে জাতীয়তাবাদী শক্তি ভারতের ভিতরে ও বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করেছিল, সেই শক্তিকে এরা সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দেশনায়ককে দেশদ্রোহী বা কুইসলিং

বলে বেড়িয়েছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থে পুষ্ট হয়ে কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অটুট রাখবার জন্য বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিল। এদেরই সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেদিন বাঙ্গলা হতে খাদ্যদ্রব্য সরিয়ে দিয়ে নদীমাতৃক প্রদেশের চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা নৌকাগুলি ভেঙে দিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল, আর পঞ্চাশ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। এই কৃষক শ্রমিকের দরদীরা সেদিন শুধু এই নরহত্যার নীরব দর্শকই ছিল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাহায্যও করেছিল। আজ এরা স্বদেশভক্ত, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে জাত, আত্মস্বার্থে পরের দালালী করতে অভ্যস্থ তথাকথিত সাম্যবাদীরা আগষ্ট বিপ্লবের কালে কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন কংগ্রেসের নাম ভাঙ্গিয়ে জনগণের কাছে কিছু স্থান করে নিয়েছে। তারপর বিদেশী সরকারের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রে তৈরী হয়ে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ নিরীহ জনগণের সরলতার সুযোগ গ্রহণ করে এক উৎকট অথচ মুখরোচক মতবাদ জনগণকে গলাধঃকরণ করাতে লেগে গিয়েছে। ভণ্ড সাধুদের ভস্ম বা নামাবলী গায়ে দেওয়ার মত স্বাধীনতা, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র প্রভৃতি মহৎ শব্দগুলিকে ব্যবহার করে সরল মানুষকে এরা বিভ্রান্ত করছে।

কংগ্রেসের নিষেধ অমান্য করে সেদিন যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিল, চাকুরী নিয়েছিল, যুদ্ধের অবসানে তারা ছাঁটাই হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জানত, তারা যুদ্ধের প্রয়োজনে যে বেপরোয়া লোক সংগ্রহ করেছে, যুদ্ধাবসানে ছাঁটাইয়ের কালে তারা বেকার হবার আতঙ্কে রুখে উঠবে। অথচ বিনা কাজে এই লোকরা দরিদ্র জনগণের বহু কষ্টার্জিত অর্থ হতে প্রদত্ত করের উপর বসে খাবার দাবী তুলেছে। আজ এই ছাঁটাই লোকরা কৃষক-শ্রমিকের-দরদীদের সঙ্গে ভীড় করেছে, আর মুসলিম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর প্রাক্তন মুসলিম লীগওয়ালারা এদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টায় রয়েছে। এরা আত্মস্বার্থ ব্যতীত জাতীয় স্বার্থ বুঝতে অক্ষম। কৃষককে অবশ্য তারা শ্রমিকের পর্যায়ে ফেলে মুক্তিদাতার মর্যাদা দিতে চায় না। প্রাণহীন প্রস্তরীভূত যে মতবাদ তার আঘাতে কোনদিন কোন অচলায়তনের দরজার শক্ত শিকল ভেঙ্গে পড়েনি, মানবাত্মারও মুক্তিলাভ ঘটেনি। এরা প্রকৃত তথ্যগুলি জানে এবং জেনেই যত খুশী বিকৃত করে ক্ষমতা আপন কবজিতে রেখে দেয়।

ভারতবর্ষ বহু বৎসরের পরাধীনতায় তার অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব এবং শোষণে ও পরাধীন রাখার জন্য জাতির দেহে যে বিকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে, তা হতে মুক্তিলাভ মুহূর্তের মধ্যে হয় না, তারপর বিদায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশকে ব্যবচ্ছেদ করে দেশের এক কোটি লোককে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে সমস্যা অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত ইংরেজী শিক্ষায় বিকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্তন অনুগতরা সাম্যবাদীরূপে জনগণের সামনে এক নেতিবাচক ধ্বনি তুলেছে। এতে তারা এক ঢিলে দুই পাখী মারবার আয়োজন করেছে। নেতিবাচক ধ্বনিদ্বারা তারা জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। 'Democracy is not a state in which people act like sheep. Under democracy individual liberty or opinion and action is jealously guarded'—গান্ধীজি বলেছেন। এরা জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন—তাদের করণীয় কিছুই নেই, সরকার সুখের ব্যবস্থা করতে পারে, তাদের অভাব অনটন সমস্ত কিছুর সমাধান করতে পারে। অর্থাৎ এরা বুঝাতে চায় যে মানুষ শুধু বসে থাকবে বা চেয়ে থাকবে! সমস্ত কিছুই সরকার করবেন। এ এক মারাত্মক রোগ সমাজদেহে প্রবেশ করাতে উদ্যোগী হয়েছে। মানুষের আত্ম-বিশ্বাস, আত্মশক্তির উদ্বোধনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে মানুষ জড়পিণ্ডেপরিণত হয়। তার প্রকাশও বিকাশের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে অর্থাৎ সৃজনীশক্তি বিলোপ পেলে এবং প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে বেড়াবার মানসিকতা তৈরী করে মনকে ধ্বংস করে শুধু যন্ত্রেই পরিণত হয়। ইহা মানুষের প্রতি নির্মম আঘাত। এদের এই প্রকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যহীন নহে।

গান্ধীজি সাবধান করে দিয়েছেন: 'I hold that democracy cannot be evolved by forcible methods. The spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come from within'. সামাজিকসাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বর্গ দেখিয়ে এরা যেদিন এই মানুষগোষ্ঠিকে জড়পিণ্ডে পরিণত করতে পারবে, সেদিন যদি তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসে, তখন এই জড়পিণ্ডেরা জনগণের তথা-কথিত কল্যাণকামীদের আঘাতের প্রত্যাঘাতের ক্ষমতা হারাবার ফলে শোষক

কাগজে পরিণত হয়ে তাদের গায়ে এদের কলঙ্কের ও দুষ্কার্যের কালি মিশিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করবে। এরা স্বর্গ দেখিয়ে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে ও ভারতে বর্তমান পরিবারের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবন্ধন বা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করবার প্রয়াসী। মানুষের কাছে নেতি-বাচক ধ্বনি তুলে মনকে ধ্বংস করে মানুষকে জানোয়ারে পরিণত করিবার চেষ্টায় এরা মশগুল। কিন্তু ইহা মনুষ্যধর্ম বিরোধী। এরা মনে করে, মানুষ সাবধানী ভেড়ার দল। গড্ডালিকা কোন্ দিকে যাচ্ছে, সেদিকেই ঐ মানুষদের লক্ষ্য এবং তার সঙ্গে এ মানুষরা মিশে যায়। এ মানুষরা দুটি মতবাদ পোষণ করে: একটি ব্যক্তিগত, ওটা প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং আর একটি প্রকাশ করে। অপরকে খুশী করার জন্য দ্বিতীয় মতটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয় ও অভ্যাসে গিয়ে দাঁড়ায়।—তা নিজের বলে মেনে নিতে আরামবোধ করে ও প্রয়োজনে এর পক্ষে বলতে থাকে এবং শেষে সেটাই তার আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। বিবর্তনের মাঝ দিয়ে যে এ আদর্শ নিয়েছে তা সে পরে ভুলে যায়। মানুষ আলোমুখী, প্রগতিমুখী। মানুষের প্রগতিকে বাধা দিয়ে বন্য বা জঙ্গলীযুগ আনা মানবতার প্রতি এক নির্দয় জুলুম; মানুষ তার বন্য বন্ধুর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারে না, কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই অন্য জানোয়ার হতে তাকে পৃথক করেছে।—সে প্রবৃত্তি বা বন্য অবস্থাকে সংস্কার করেই যুক্তিবাদীর অবস্থা আয়ত্ত করে এবং সেই অবস্থা হতে প্রগতির পথে মনুষ্যত্বকে লাভ করে।—এই অবস্থা হতে আলোমুখী হয়ে দেবত্ব বা দেবজীবন লাভ করে।

গান্ধীজির দৃষ্টিতে ব্যক্তি তার সত্তা হারিয়ে ফেলবার চিন্তা অসম্ভব, তিনি বলেছেন: 'I value individual freedom but you must not forget that man is essentially a social being. He has risen to his present status by learning to adjust his individualism to that requirements of social progress. Unresticted individualism is the law of the beast of the jungle. We have learnt to strike the mean between individual freedom and social restraint. Willing submission to social restraint for the sake of the wellbeing of the whole society, enriches both the individual and the

society of which one is a member.' ভারতের এক শ্রেণীর বিকৃত মানুষকে আজ পৃথিবীর ক্ষমতামত্ত শক্তিরা তাদের আপন স্বার্থে ব্যবহার করছে। লোভী মানুষদের অনেক যন্ত্রণা থাকে, আর তারা সে যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে পারে না বলেই অবাস্তব কল্পনার দুর্গ তৈরী করে তার মধ্যে আশ্রয় নেয়। এ মেরুদণ্ডহীন মানুষরা কৃপার পাত্র।

আজ ব্রিটিশ শক্তি ভূতলশায়ী। সে তার পুরান সাম্রাজ্যকে জিইয়ে তুলবার স্বপ্নে বিভোর। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রুশ যুক্তরাষ্ট্র আজ অশ্বমেধ যজ্ঞে বের হয়েছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ডলারের লোভ দেখিয়ে পৃথিবীর জাতিগুলোকে গ্রাস করতে তৎপর এবং রুশ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধাক্কা খেয়ে ইউরোপের শাসন শোষণে নিস্পৃষ্ট ঔপনিবেশিক শাসনের কবলিত এশিয়ায় দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণে ব্যস্ত। গান্ধীজি বলেছেন : 'I am not interested in freeing India merely from the English yoke. I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever,' বুভুক্ষু মানবতার কাছে চটকদার বুলির কুয়াশা জাল সৃষ্টি করে তাদের বিভ্রান্ত করে আপন কক্ষে টেনে নিয়ে যাবার জন্য এরা এসেছে।

এই কাজে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবঞ্চিত জীবকে রুশ প্রচার যন্ত্রেফেলে গড়ে তুলে দেশে দেশে ভূতের বা পিশাচ নাচের জন্য পাঠাচ্ছে। 'লোককে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই কঠিন'—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আরও বলেছেন, 'লাথি মেরে শুধু ধূলোই ওড়ানো যায়, ফসল ফলানো যায় না।' সহস্র সহস্র বৎসরের উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ভারতীয় জাতির অঙ্গে অঙ্গে স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। এই জাতি কোন অবস্থাতেই মানবতার আদর্শ হতে বঞ্চিত হতে পারে না। মনকে ধ্বংস করে নিজের ধ্বংসকে টেনে আনতে চাইবে না। সহজ বুলি এদেশের মাটিতে ইতিপূর্বে আরও তিনবার—চার্বাক, বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এই মাটিতে স্থান করতে পারেনি। মানুষের সহিত শক্তির পার্থক্য বুদ্ধির জন্য। পশু চলে প্রবণতায় আর মানুষ চলে বুদ্ধি দিয়ে। সে মানুষ পশুকে অনুকরণ করবে এটা স্রষ্টার ইচ্ছা হতে পারে না। মানুষ তার সমস্যার সমাধান করবে বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে। পশুর অনুকরণে বল দিয়ে নয়। মানুষ অঙ্কুশ মেরে হাতীকে চালায়, বাঘের

ঘরে গিয়ে তাকে কাবু করে আসে। মাছের মত জলের নীচে বেড়ায়, পাখীর মত আকাশে ওড়ে বুদ্ধির জোরে।

আজ বস্তুতান্ত্রিক আবহাওয়ায় বৈজ্ঞানিক প্রচার ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্যক্তির মানুষকে সাময়িক বিভ্রান্ত করতে পারে। এদের কাছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উপায়ের বালাই নেই বলে ভারতীয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শের মুখোশ পরেও এরা সমাজের কাছে উপস্থিত হতেছে কিন্তু এই সমাজের একটা স্বাভাবিক সৎ অসৎ, কল্যাণ অকল্যাণ বুঝবার শক্তি আছে—যুদ্ধজনিত দুর্নীতি ও বর্তমান অর্থনৈতিক অস্বাভাবিক অবস্থার ভাটায় এর অস্তিত্ব লোপ পাবে—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ অসতের অস্তিত্ব নেই, সত্যেরও নাশ নেই। সুদীর্ঘকাল বিদেশীর শাসন ও শোষণে দেশের বিরাট অংশ নিঃস্ব হয়েছে; অশিক্ষায় ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই শাসন ও শোষণের সহিত সামগ্রিক যুদ্ধের প্রভাবে ব্যাপকভাবে দেশে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে বলে ব্যর্থ-জীবনের কাছে বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট সাম্যবাদ সাময়িক আবেদন করলেও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে দেশ এই বিষাক্ত প্রভাব হতে মুক্ত হবে। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার, দুর্নীতির ও মানুষের বন্য জীবনের আঁস্তাকুড়ে এই বিকৃত ও ভেজাল সাম্যবাদের জন্ম। মানুষের উন্নত জীবনের আবির্ভাবেই এর বিলোপ হয়।

ভারতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

কংগ্রেস বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসে পরিশেষে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'সত্য ও অহিংসা'র ভিত্তিতে এক অভিনব পথে সংগ্রাম-মূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে ভারতের জনচিত্তকে জড়তা হতে মুক্ত করে জাতিকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনেছেন। গান্ধীজির দৃষ্টিতে "My Swaraj is to keep intact the genius of our civilizations. I want to write many new things but they must all be written on the Indian slate.' গান্ধীজি দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এক মহান নেতা। তিনি ভারতের মাটির সঙ্গে, নাড়ীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাই সমগ্র জাতি তাঁর কণ্ঠ তাদের অন্তরে শুনতে পেতো। সত্য ও

অহিংসা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, সাম্য ও মৈত্রীই ভারতের অন্তর্লোকের পরিচয়। যারা ভারতের এই পরিচয় জানে না, তারা ভারতবর্ষকেও জানে না। প্রত্যেক মানুষের যেমন এক নিজস্ব সত্তা আছে, প্রত্যেক দেশেরও তেমনি নিজস্ব সত্তা রয়েছে। ভারতবর্ষ, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশ যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা আরব বা তুরস্ক নহে। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষই। এখানে চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হলে জাতি তাঁকে গ্রহণ করে। এখানে রাজপুত্র রাজ্যত্যাগ করে বের হলে সমগ্র দেশ তাঁর পিছনে ছুটে। এখানে শঙ্করের নামে, রামানুজের নামে, নানকের নামে, চৈতন্যের নামে জাতি পাগল হয়ে ওঠে। এখানে সন্ন্যাসী রামদাস মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা করেন, আর এখানেই কটিমাত্র কৌপিন সম্বল মহাত্যাগী মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে দিলেন। এখানে রাজা বা সম্রাট সর্বস্বত্যাগী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা শ্রমণের উপদেশে রাজ্য পরিচালিত করতেন; এই দেশে শ্রেষ্ঠী তার ধনসম্পদ রাষ্ট্র এবং সমাজের কল্যাণে ব্যয় করে বানপ্রস্থে চলে যেতো।

গঙ্গা, সিন্ধু, বিন্ধ্য, হিমালয়, নয়ন-মনোহর ঊষা এবং উজ্জ্বল সূর্য চন্দ্র, শ্যামল মাঠ, দিগন্ত প্রসারিত বনরাজি এদেশের মানুষের মনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সুর তুলে দেয়। ইহাই এদেশের প্রকৃত পরিচয়। যারা এই দেশের এই পরিচয় জানে না, তারা ভারতবর্ষকেও জানে না, ভারতের নরনারীকে জানে না। ইহাই এদেশের উপাদান। মন ও মেরুদণ্ডকে দৃঢ় করার জীবন রস সঞ্চয় করা না হলে জমিতে সোনা ফলবে না। জমি হতে ফসল তুলতে হলে যেমন জল ও সারের প্রয়োজন, তেমনি মানবিক মৌলনীতি ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। জীবন থেকে সোনার ফসল তুলতে হলে মনে বল ভরসা, সাহস, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, কায়িক ও মানসিক শ্রমে প্রবৃত্ত সংগঠন শক্তির উদ্বোধন চাই। আশাভঙ্গের আক্রোশে উদ্যম ও আদর্শে বিভ্রান্তি সমাজবিচ্যুতি ও বিশ্বাসহীনতার চোরাবালিতে পা দিলে জাতির ও জনগণের তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। এদেশের ইতিহাস বার বার সে সাক্ষ্য দিয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের এই পরিচয় জানতেন এবং কঠোর সাধনায় ভারতের শাশ্বতরূপকে আপন হৃদয়লোকে প্রতিফলিত করে ভারতবর্ষের সেবায় বেরিয়েছিলেন এবং সেইরূপ তিনি মুহূর্তের মধ্যে প্রতি ভারতীয় নরনারীর

অন্তর্লোককে স্পর্শ করেছেন। তিনি ভারতের সনাতন আদর্শের দিক হতেই ভারতের মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত করেন। তাই উহা এত বেগবতী হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শুধু ভারত হতে নয়, পৃথিবী হতে নির্মূল করে মানবতার কণ্টককে অপসারিত করেছেন। এই নিষ্কামব্রতী মহাসন্ন্যাসীর অন্তরে মানবতার ভবিষ্যৎ ধরা দিয়েছিল, তাই তিনি পঁচিশ বৎসর পূর্বে পারমাণবিক যুগের আগমনের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে মানবতাবাদের বিকাশের জন্য সংগ্রাম করেন। সত্যের বিরুদ্ধে অসত্য, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়, অহিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকার, দেবতার বিরুদ্ধে দানব, শান্তির বিরুদ্ধে অশান্তি চিরন্তন। মহানায়ক গান্ধীজির ভারতের মুক্তি আন্দোলন সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে হয়েছে এবং তিনি সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। তিনি ভারতকে জানতেন বলেই ভারতে চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে সারাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আইনের শাসন কায়েম হোক তাও চেয়েছেন। দেশকে দুর্বল করাই হবে এদেশের শত্রুদের প্রধান কাজ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার মনোভাবকে তীব্রতর করে তুলতে পারলেই ঐক্যবদ্ধ ভারত থাকবে না। তখন ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যে নিশ্চিত—সে আশঙ্কা তাঁর ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার কালে এই দেশে কংগ্রেসের ভিতরে এবং কংগ্রেসের বাইরে কেহ গান্ধীজিকে কম বাধা দেয়নি। এই মহাপুরুষ সেদিনও নীলকণ্ঠের মত গরল পান করতেন। কংগ্রেসের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কংগ্রেসের ভিতরে আদর্শভ্রষ্ট সুযোগ সন্ধানীরা কংগ্রেসকে এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে আঘাত করত। কিন্তু পরিণামে সত্যেরই জয় হয়েছে। আজও ভারতবর্ষ এবং কংগ্রেস এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নেই কিন্তু বিদেশী শক্তিসমূহের অর্থ ও আনুকূল্যে পুষ্ট স্বজাতি বিদ্বেষী বিজাতিরা রয়েছে এবং কংগ্রেসের রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্তের ফলে মধুর সন্ধানে স্বার্থসন্ধানী নিকৃষ্ট জীবরাও কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রবেশ করে জাতির মুক্তি আনয়নকারী প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস এবং জাতিকে আঘাত করছে। এইদেশ এবং জাতির জীবন তাহার সত্য ও অহিংসা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাম্য ও মৈত্রী কিম্বা মানবতাবাদের উপরই নির্ভর করবে। যে মুহূর্তে ভারতবর্ষ এই আদর্শ

ত্যাগ করবে, সেই মুহূর্তেই ভারতের মৃত্যু আসবে। ভারতের জীয়নকাঠি মরণকাঠি ভারতের নিজের হাতে। ভারতের স্বাধীনতার রক্ষকরা যদি জাতির নিজস্ব সুরকে হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ সত্য ও অহিংসা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, সাম্য ও মৈত্রী কিম্বা মানবতাবাদের আদর্শ হতে চ্যুত হয়ে ভোগকে ছেড়ে দেয়, লোভ ও ব্যক্তি স্বার্থকে জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে স্থান দেয়, তবে ভারতের বাঁচবার উপায় নেই। এই দেশে যখনই কোন ভোগী বা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নেতৃত্ব করতে এসেছে, তখনই জাতির ধ্বংস এসেছে। আবার যখনই আত্মিকশক্তিতে বলীয়ান সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী জাতিকে পরিচালিত করতে বেরিয়েছে, তখনই জাতি আপন সুর ফিরিয়ে পেয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

স্বার্থান্বেষী নেতা বা কর্মীরাই ভারতের শত্রু। মনুষ্যত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত ব্যক্তিরা শুধু ভারতের কল্যাণ করতে পারে না নহে, ভারতকে ধ্বংস করে। কারণ এদের স্বচ্ছ দৃষ্টি আসে না, বুদ্ধি বিকৃত হয়। আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে যে মহান প্রতিষ্ঠান—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—ভারতের মুক্তি এনেছে, সেই কংগ্রেস হতে সুযোগসন্ধানীদের বিতাড়িত করে কংগ্রেসকে ত্যাগব্রতী, সত্যাশ্রয়ী, আত্মিকমুক্তির সন্ধানী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রভাবাধীন না করলে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। এইভাবে কংগ্রেসকে প্রাণবন্ত করে না তুললে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। বস্তুতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ধনতন্ত্রবাদী এবং সাম্যবাদীদের সৃষ্ট বিষাক্ত আবহাওয়া হতে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য মানবতাবাদের আদর্শে দৃঢ় ব্যক্তিদের প্রভাব বিস্তার করবার প্রয়োজন। আজ এদিক হতে চেষ্টা করতে হবে। অনুকরণ দ্বারা মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এই মানবতাবাদের আদর্শ প্রচার করতে হবে। এইভাবে নৈতিক আবহাওয়া এবং দেশপ্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। জাতি বিষাক্ত আবহাওয়া হতে মুক্ত হয়ে সুখ, শান্তি এবং আনন্দের অধিকার লাভ করবে। মহাত্মা গান্ধী এই মানবতাবাদের আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মুক্তি এনে পৃথিবীর পীড়িত মানবতার মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ,If India fails Asia dies. 'It has been aptly called the nursery of many blended cultures and civilizations. Let India be and remain the hope of all the exploited races of the earth,

whether in Asia, Africa or any part of the world' আজ সেই আদর্শকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে গ্রহণ করবার মধ্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতের প্রতি নরনারীর কল্যাণ এবং মানবমুক্তির সন্ধান রয়েছে—ইহা যেন আমরা না ভুলি। মানবতাবাদ মাতৃ-এষণারই বিকাশ এবং আজকের এই মানবসমাজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্রহ্মর্ষি শ্রীঅরবিন্দও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের প্রতি নরনারীকে তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ সরল করে দিয়ে বলেছেন : 'আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে, ভারতের অভ্যুত্থান তার নিজের স্থূল স্বার্থসেবার জন্যে নয়, কেবল নিজের প্রসার মহত্ব শক্তি সমৃদ্ধি লাভের জন্যে নয়—যদিও এ সকলকে অবহেলা করা তার উচিত হবে না—তার জীবন ধারণ হবে ভগবানের জন্যে, জগতের জন্যে, সকল মানব জাতির সহায় ও নেতারূপে।

এইসব আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে এই হবে : এক-বিপ্লব যার ফলে ভারতের আসবে মুক্তি ও ঐক্য ; দুই—এশিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি—মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিকল্পে এক সময়ে তার ছিল যে সুমহৎ অবদান, পুনরায় সেই ব্রত গ্রহণ করা ; তিন—মানুষের জন্যে একটা নূতন মহত্তর উজ্জ্বলতর উন্নতর জীবন-ধারা—তার পূর্ণরূপ বাহ্যত প্রতিষ্ঠিত থাকবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর—প্রত্যেক নেশন অক্ষুণ্ণ রাখবে তার পৃথক স্বকীয় জাতীয় জীবন, সেই সঙ্গেই সকলে সম্মিলিত থাকবে, সকলের উপরে সকলের অন্তিমে রয়েছে যে-অনিবার্য একতা, তার মধ্যে ; চার—ভারত জগৎকে দেবে তার অধ্যাত্মজ্ঞান আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা ; পাঁচ—সবশেষে এক ঊর্ধ্বতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ, ফলে প্রকৃতির বিবর্তনে একটা নূতন পর্যায়—তখনই আরম্ভ হবে জাগতিক যাবতীয় সেইসব সমস্যার সমাধান, মানুষকে যা বরাবর বিমূঢ় আর ক্ষুব্ধ করেছে, যেদিন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের, সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজের চিন্তা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে।....'

মহাত্মা গান্ধীর আজন্ম সাধনা এবং শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা বিশ্বমানুষের মুক্তির দিশারী—একথা যেন আমরা না ভুলি।

ভারতের গতিপথ

ভারতবর্ষে যে চারটি শক্তি বর্তমানে কাজ করছে, এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা-বাদী বা প্রাদেশিকতাবাদীরা আদর্শবাদের বিকৃতির মধ্য দিয়ে উপস্থিত হলেও

উহা প্রাণৈষণারই প্রকাশ, কিন্তু পৃথিবীর বা মানবতার কিম্বা সমাজের এমন কি ভারতবর্ষে বর্তমানে উহার কার্যকারিতার সম্ভাবনা নেই, কেননা প্রপীড়িত পৃথিবী অত্যাচার, উপদ্রব এবং অনাচারে ক্লান্ত। ধনতান্ত্রিকদিগকেও দৃশ্যতঃ অন্নৈষণারই প্রকাশ বলে মনে হলেও বস্তুত এই ক্ষমতামত্ত বা ক্ষমতালোভীরা অন্নৈষণার তাগিদে চলছে না, তাদের মধ্যেও প্রাণৈষণারই প্রকাশ চলেছে। প্রাণৈষণা বর্তমান অবস্থার জন্য নহে। প্রাণৈষণার কষাঘাতে পৃথিবী ক্লান্ত বলে আজ অন্য শক্তি কাজ করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। অন্নৈষণার তাগিদেই সাম্যবাদের জন্ম কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে এর বিকৃতি এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে আত্ম-রক্ষার প্রয়োজন অন্নৈষণার তাগিদে সৃষ্ট এই সাম্যবাদ প্রাণৈষণার কাছে ফিরে গিয়েছে। উপনিষদ অন্ন বা পুষ্টির প্রবৃত্তিকে প্রাণৈষণারই অন্তর্ভূত করেছে, সুতরাং অন্নৈষণার স্বাভাবিক গতি প্রাণৈষণার দিকে।

ক্লান্ত পৃথিবীতে আজ প্রাণৈষণা মানবতার প্রয়োজন নেই। অন্নৈষণার সাময়িক প্রকাশে মানবতা উৎফুল্ল হলেও প্রয়োজনক্ষেত্রে এর বিকৃতির জন্য উহা সেই অবস্থায় দাঁড়াতে পারে নি। ভারতের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রাদেশিকতাবাদী অর্থাৎ সঙ্কীর্ণবাদী ও ধনতন্ত্রবাদী বা পুঁজিবাদী এবং তথাকথিত সাম্যবাদীরা জনগণের কাছে আদর্শবাদের কুয়াশাজাল বিস্তার করে বিদেশী শক্তিকেই সাহায্য করেছে এবং পঞ্চমবাহিনীরই মত কাজ করছে। এরা আত্ম-স্বার্থের তাগিদে পরিচালিত বলে আদর্শবাদের কোন মূল্যই এদের কাছে থাকতে পারে না। যারা আদর্শবাদের দিক হতে পরিচালিত হয়, তারাও অতীতকেই ধরে রেখেছেন। পৃথিবী বা মানবতা আজ সেখানে নেই। সুতরাং আজ আণবিক যুগের ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, পীড়িত, ভীত মানবতা মাতৃ-এষণার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের আগস্ট বিপ্লব এবং আগস্ট বিপ্লবের মহানায়ক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি, ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা গন্ধীজি মাতৃ-এষণারই বিকাশ। মাতৃ-এষণার প্রকাশ মানবতার মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহণ করে। তাই তো গান্ধীজি গীতার ত্যাগ ও উপনিষদের অভীমন্ত্র গ্রহণের জন্য আহ্বান করে বলেছেন: 'সর্বোজনো সুখীনো ভবন্তু'। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যেমন প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই স্থান আছে এবং এক এক অবস্থায় এর প্রকাশ পায়, তেমনি জাতি বা সমাজ রাষ্ট্র বা মানবতার দেহেও এক এক সময় তার প্রকাশ হয়। এর দ্বারা সেই প্রবৃত্তির প্রকাশের কালে অন্য প্রবৃত্তি বা এষণাকে দেখা না গেলেও

ওরা নিক্রিয়তার জন্য অপ্রকাশ্য বলে অস্তিত্ব নেই নয়। ভারতবর্ষ মাতৃ-এষণা বিকাশেরই স্বাভাবিক ক্ষেত্র। উপনিষদের পরলোক এষণাও এই মাতৃ-এষণারই অন্তর্ভুক্ত। পরলোক এষণা আধ্যাত্মিকতারই প্রকাশ। ভারতের ক্ষেত্রে এরই প্রকাশ স্পষ্ট হয়। অন্য এষণার প্রকাশ ব্যর্থ হয়। যেমন এক এক জাতীয় মাটিতে এক এক প্রকার ফসল ভাল ফলে, ইহাও সেপ্রকারই। আত্মিক বিকাশ, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, নৈতিকবোধ প্রভৃতি মনুষ্যবৃত্তির উন্নততর অবস্থাই মাতৃ-এষণার স্বরূপ। মহাত্মা গান্ধী এই পথই দেখিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষকে সকল দিক হতে সমৃদ্ধশালী করবার প্রকৃত পথ ইহাই। এই পথ ত্যাগ করলে ভারতের অকল্যাণ আসবেই। এই মাতৃ-এষণা প্রবৃত্তিতে পরিচালিত হতে সত্য ও অহিংসার ভূমির উপর না দাঁড়ালে ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির সম্ভাবনা ছিল না। 'Non-violence of my conception is a more active and a mere real fighting force against evil than violent retaliation whose very nature is to increase evil', বলেছেন গান্ধীজি।

আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির পর এই মানবতাবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ব্রতেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ রাষ্ট্রীয় মুক্তি এসেছে কিন্তু এই আদর্শ রূপায়িত হবার পর কংগ্রেসের মধ্যে সেবার ভাব বিনষ্ট হয়ে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতে পারে এবং এই আত্মম্ভরিতা হতে বিকৃতি কিম্বা বিনাশ আসতে পারে— গান্ধীজি এই আশঙ্কা করেই ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বেতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিখ্যাত 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গ্রহণের কালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আয়ত্তের পর কংগ্রেসকে বিলোপ করে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। গান্ধীজি ইতিহাসের শিক্ষা এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টি হতে এ কথা জেনেছিলেন। আমাদের দেশেই একদিন সেবা, ত্যাগ ও জ্ঞানের আদর্শে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ্যবাদ, কালে যেদিন তারা সেবা ত্যাগ ও জ্ঞানের আদর্শকে হারিয়ে ফেলল, সেদিন ক্ষমতা রাখবার জন্য কাপালিক মূর্তি ধরেছিল। এতে ব্রাহ্মণের যেমন অধোগতি হয়েছিল, দৃষ্টিহারা নেতৃত্ব পরবর্তীকালে জাতিকেও গভীর দুর্যোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। গান্ধীজির মৃত্যুর পূর্ব রাত্রেও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের খসড়ার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে কংগ্রেসকে লোক সেবক সঙ্ঘে

পরিণত করে জাতির সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য কাজ করবার পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

গান্ধীজির এই পথনির্দেশের মধ্যেই ভারতের আত্মরক্ষার পথ, ভারতের প্রাণশক্তিকে অক্ষয় রাখবার পথ, ভারতের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। স্বাধীনতা লাভের পর স্বার্থান্ধদের আচরণ দেখে গান্ধীজি বড় দুঃখে বলেছেন, 'আজ সকলেই যে যার নিজের ও পরিবারের চিন্তায় মগ্ন, সমগ্র ভারতের কথা কেউ ভাবে না। স্বাধীনতা পেয়ে মনে হচ্ছে স্বাধীনতা নিয়ে কি করব তা আমরা জানি না। স্বাধীনতাকে তাই আত্মঘাতী অরাজকতা বলে ভুল করা হচ্ছে।' গান্ধীজির একক দানে জাতীয় কংগ্রেস মুষ্টিমেয়ের বিলাস কক্ষ হতেই গণ-দেবতার মন্দিরে, তপোবনে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজির রাজনৈতিক নেতা রূপ মোটেই তাঁর প্রকৃত রূপ নহে। তাঁর আধ্যাত্মিক রূপই সত্যিকার রূপ; এই আধ্যাত্মিক বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক রূপ এসেছে। গান্ধীজির জীবদ্দশায় 'গান্ধীজিই ছিলেন কংগ্রেস এবং কংগ্রেসই ছিল গান্ধীজি' বলে কংগ্রেস এতবড় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে চল্লিশকোটি লোকের রাজনৈতিক মুক্তি আনতে পেরেছিল। রাজনৈতিক মুক্তি জাতির সামাজিক অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিরই সোপানমাত্র। উহা চরম পরিণতি নহে। তাই এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য যদি কাজ করা না হয়, তবে কংগ্রেসের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং জাতির দুর্গতিও অবধারিত।

আজ গান্ধীজির আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় জন্যই এতবড় শক্তিশালী কংগ্রেস এবং তার নেতা ও কর্মীদের মর্যাদা বিপন্ন হতে চলেছে। আজ গান্ধী-জির জীবনমন্থন দর্শন বা বাণীমূর্তি অবজ্ঞাত, অবহেলিত। ভারতবর্ষের নেতা গান্ধীজির মত ব্যক্তিরাই হন এবং ভারতবর্ষ যুগে যুগে মানবতাবাদের আদর্শেই মেতে উঠে—ইতিহাসের এই শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ না করি তবে ভারতবর্ষের দুর্দিনকে ঠেকাতে পারবে না। ভারতবর্ষ জড়বাদী বা বস্তুতান্ত্রিকতাবাদী ইউরোপ বা আমেরিকা নহে—এই কথা আমরা যেন স্মরণ রাখি। ভারতবর্ষের এই পরিচয় জানা থাকলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। ভারতবর্ষ তার স্বধর্মকে হত্যা করলে নিজের দুর্গতি ডেকে আনে—ইতিহাসের এই শিক্ষা আমাদিগকে স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেস যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার তুলনা নেই।

কংগ্রেসের সেই অধ্যায় শেষ হয়েছে। দেশের পরবর্তী অধ্যায় রচনা হবে সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থায়। উহা কংগ্রেস আয়ত্ত করবে কি অন্য প্রতিষ্ঠান করবে তা বড় কথা নয়। জাতি বাঁচবে, জাতীয় স্বাধীনতা, জাতির সংস্কৃতি, জাতির বৈশিষ্ট্য, জাতির প্রাণশক্তি, জাতির মান-মর্যাদা রক্ষা পাবে—তাহাই বড় কথা। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস-জননী সেই দায়িত্ব অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত পালন করেছে। আজ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষাই প্রধান কথা ও শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব কে পালন করবে তাহাই বড় প্রশ্ন।

দেশ ব্যবচ্ছেদর ·সঙ্গে জাতির স্বাধীনতা আনয়নকারী মহান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে কর্মচ্যুত করে নির্জীব ও অর্থহীন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতবড় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে শুধু ভোট সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সব কিছু হতে সরিয়ে দিয়ে সরকারী আমলাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া স্বাধীনতার নির্বাসন ছাড়া আর কিছুই নয়—একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করতে হবে। দেশ ব্যবচ্ছেদ, কংগ্রেস-জননীর হত্যা এবং মহানায়ককে অস্বীকার করে যে ক্ষমতার উত্তরাধিকার অর্জিত হয়েছে, সে ক্ষমতার মধ্যে ধ্বংস ও পাপের বীজ নিহিত রয়েছে। দিনে দিনে বহু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই তা ক্ষয়িত বা দগ্ধ বীজ হবে—এ তো বিশ্ববিধান।

জাতির মুক্তিদাতা, জাতির জনক গান্ধীজির আত্মাহুতির পর তাঁর মহামৃত্যুর পূর্বক্ষণের উপদেশানুযায়ী পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দার প্যাটেল পরস্পরের কাছে একটু এসেছিলেন। কিন্তু আবার তাঁরা দূরে সরে গিয়েছেন ; ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়ে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক হতে দুজন ভিন্নমুখী। একজন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হতে মার্ক্সপন্থী এবং বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে গান্ধীপন্থী ; আবার আর একজন প্রথমোক্ত ব্যাপারে গান্ধীপন্থী এবং শেষোক্ত ব্যাপারে ভারতের নিরাপত্তা ও স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে নিজস্ব নীতি নির্ধারণের পক্ষপাতী। এরই ভিত্তিতে শাসকদল ও বিরোধীদল গঠনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলার ভিতরও ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তা বুঝতে হবে। আজ কংগ্রেস আর কংগ্রেস-জননী নয়, সন্তানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কংগ্রেসেরও রূপান্তর জন্মান্তর এসে কংগ্রেস দলে পরিণত হতে চলেছে।

বিরোধী দলের আবশ্যকতা

ভারতে যে বিভিন্নমুখী শক্তি আজ কাজ করেছে, তারা ছাড়া আরও কতগুলি শক্তি ভারতে কাজ করেছে—যারা আদর্শের জগাখিচুড়ির মধ্যে দিয়ে নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং কর্মতালিকা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করেছে অথচ এই শক্তির কতগুলি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছে। আজও ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু এরা অস্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে ক্ষমতার মোহে চলছে। আদর্শের গভীরতার অভাব এবং ক্ষমতা লোভ এদের কারো কারো ব্যর্থতা এনে দিয়েছে। ক্ষমতার মোহে এরা কংগ্রেসদলের বিরুদ্ধে আঁতাত গড়ে তুললেও আদর্শহীনতা এবং ক্ষমতামত্ততা এদের একটি সক্রিয় সঙ্ঘবদ্ধ দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আজও অনুকূল অবস্থা এনে দেয়নি। অথচ কংগ্রেস দলের অবর্তমানে জনগণের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বা জনস্বার্থের রক্ষক কোন প্রতিষ্ঠান বা দল আজও দানা বেঁধে উঠেনি। জাতির স্বাধীনতা আনয়নকারী এবং জাতির সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণহীন কৃষক-শ্রমিক-প্রজা রাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট ও সক্রিয় রাখবার জন্য জাতির স্বাধীনতা রক্ষা ও জনগণের কল্যাণের ভিত্তিতে গণতন্ত্ররক্ষাকারী একটি প্রতিষ্ঠান বা শক্তি যদি সৃষ্টি হয়, তাহা কল্যাণকরই।

দেশ, জাতি, রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য ত্যাগ, সেবা, জনকল্যাণ-মূলক কর্মপন্থা ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় বিরোধীদলের অস্তিত্ব আবশ্যক। কেননা, যে দলের হাতেই শাসনভার থাকুক না, তাকে জাতীয় স্বার্থের প্রতি সচেতন রাখবার পক্ষে এই প্রকার দলের প্রয়োজন ; জাতিকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখার পক্ষে আবশ্যক। এছাড়া কল্যাণমুখী শক্তি বা দল থাকলে উহা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেও দেশকে ও গণতন্ত্রকে বিপদমুক্ত রাখতে পারে ; স্বার্থপর, দুর্বল ব্যক্তিদের হাত হতে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই শক্তির আবির্ভাব এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কংগ্রেসে সুযোগসন্ধানী, অর্থশিকারী, ক্ষমতামাতাল ব্যক্তিদের প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে দেশের স্বাধীনতার রক্ষক, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে আগ্রহশীল ত্যাগী আদর্শবাদী কর্মীদের কংগ্রেস হতে সরে পড়া কিম্বা নিজদিগকে দর্শকের

পর্যায়ে আনা দ্বারা কংগ্রেস ও দেশের অকল্যাণই করা হবে। অতীতে যারা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করেছে, তাদের পক্ষে উহা দেশদ্রোহিতারই সামিল হবে। কংগ্রেস সুযোগ সন্ধানীদের হাতে গিয়ে পড়লে উহা জনগণের সহিত সম্পর্কহীন বলে ফ্যাসিস্ত বা কাপালিক শক্তিতে পরিণত হয়ে গণশক্তিকে আঘাত করবে অথবা কংগ্রেসকে ধ্বংস করবে। এই নির্যাতিত মানবতার দিকে চেয়েই মহাত্মা গান্ধীর সৃষ্ট ও আদর্শে পুষ্ট মহান প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেসে আদর্শবাদী, ত্যাগী কর্মীদের সমাবেশ এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত মানবতাবাদের আদর্শের ভিত্তিতেই নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মতালিকা নিয়ে উপস্থিত হবার সময় এসেছে ; এইভাবে কংগ্রেস ও দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মহাত্মাজির মহাপ্রস্থানের পর কংগ্রেসে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের একশ্রেণীর অনুগামী তাঁর মতামতকে মধ্যযুগীয় বলে বিবেচনা করতে লাগলেন। তাঁর নিরামিষ, চিকিৎসা পদ্ধতি, মাদক বর্জন, যৌন সংযম মধ্যযুগীয় বলে প্রচার করা হল কিন্তু তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী শুধু আধুনিকই ছিল না, তা সমগ্র মানব-সমাজকে সুস্থ সবল করে তোলবার এক বিরাট প্রচেষ্টা ছিল। তাকে অস্বীকার করলে এ দেশ কখনও সুস্থ হবে না, তার স্বাধীনতা রক্ষা করাও যাবে না, গণতন্ত্রও বাঁচবে না। তিনি তো জোরের সঙ্গেই বলেছেন : 'অহিংসা আমার ধর্মানুভূতিরই কথা। ইহা আমার আত্মপ্রত্যয়েরই ফল, কেননা আমি অখণ্ড আত্মায় বিশ্বাসী, কিসের জন্য, কাহার প্রতি আমি হিংসা করতে পারি ? সবাই যে আত্মা—বেদান্তের এ মহাবাক্য আমি অহিংসা-ব্রতের মধ্য দিয়েই জীবনে ফল সিদ্ধ করতে চাই।' তারপর তিনি বলেছেন : 'অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের মহাপাপ কলঙ্কস্বরূপ। এ নিন্দনীয় পাপ উৎপাটন করে হিন্দুজাতি নিরাময় হোক—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য।' গান্ধীজি আজ আর নেই কিন্তু জাতির উপর এ দায়িত্ব বর্তেছে। হিন্দু মুসলমান ঐক্য এবং চরখা যে ছিল তার সাধন ও সাধ্য-এ কথা আমরা ভুলতে বসেছি।

গান্ধীজি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময়ই বলেছিলেন—'স্বাধীনোত্তর ভারতে আমি জীবিত থাকলে নিজেই অহিংসার পথে ভূমি সমস্যার সমাধান করব। জীবিত না থাকলে আমার সেবাশ্রমের কোন কর্মী এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। স্বাধীন ভারত সরকার একটি ব্যক্তিকেও ভূমিহীন থাকতে দিবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত (economic holding) জমি ভূম্যাধিকারীর নিকট হতে

গ্রহণ করে ভূমিহীনকে দিতেই হবে।' তিনি তাঁর সাধন সম্পর্কেও বলেছেন—'বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা যেমন সহজ, স্বদেশী ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তত সহজ নয়। সবলের অহিংসাই সত্যাগ্রহের ভিত্তি। দুর্বলের সত্যাগ্রহ কাপুরুষতা মাত্র। জনগণ অহিংসায় বিশ্বাসী নয়, অথচ সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার সাহস ও শক্তি নেই। যারা আদর্শের জন্য প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত কেবল তারাই জানে কিভাবে বাঁচতে হবে। এরূপ মরণজয়ী লোক ব্যতীত কেহই সত্যাগ্রহের উপযুক্ত নয়।'

মহাত্মা গান্ধী জাতি, রাষ্ট্র ও মানবতাকে স্বার্থান্ধদের কবল হতে রক্ষা করে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সুখ শান্তি আনন্দের অধিকার দানের জন্য 'সর্বোদয় সমাজ' (বর্ণ, জাতি, আনুষ্ঠানিক ধর্ম, ভাষা, দল ও রাজ্যের বিরোধের বিলোপ বুঝায়) প্রতিষ্ঠার আদর্শ রেখে গিয়েছেন—সেবা ও ত্যাগ ভূমি ভারতের প্রতি নরনারীর উপর উহাকে সফল করে তুলবার দায়িত্ব রয়েছে—আমরা যেন তা না ভুলি।

মানুষ তার পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততিকে যতখানি সত্য বলে, আপন বলে জানে, ততখানি তার জন্য দুঃখ ভোগ করতে পারে, ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। তেমনি সাগর পাহাড় বেষ্টিত প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য সেখানকার লোকের জন্য আত্মত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এ অবস্থানকে ঘিরে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তাকে পুষ্ট করবার ব্রত গ্রহণ করে মানবজাতিকে সেবার প্রেরণা লাভ করতে হয়। তাই তো গান্ধীজি মুক্ত-জীবনের আহ্বান করে বলেছেন—'বিশ্ব সংস্কৃতির হাওয়া আমার বাড়ির চারিদিকে যতদূর সম্ভব অবাধে খেলে বেড়াক ইহাই আমি চাই।' রবীন্দ্রনাথও সতর্ক করে দিয়েছেন—'কেবল স্বাধীন হলেই মুক্ত হওয়া যায় না। মুক্তি বলতে যেখানে শুধু স্বাধীনতাই বোঝায়, সেখানে মুক্তি অবাস্তব, অর্থহীন এক শব্দ মাত্র।' যারা সামান্য সাময়িক নিরাপত্তার লোভে নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে পারে তারা স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা কোনটাই পায় না। ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলরা স্বাধীনতার অশান্ত সমুদ্রের চেয়ে একনায়কত্বের নিরুপদ্রব শান্তিকে অধিক কামনা করে। স্বাধীনতার মহীরুহকে সজীব রাখতে হলে সময় সময় দেশপ্রেমিক ও স্বৈরাচারী শক্তির রক্তে দেশ সিক্ত হয়ে উঠে একথা আমরা স্মরণ রাখলে জাতির স্বাধীনতা অক্ষয় হয়।

ইতিহাসের আধ্যাত্মিক আকার

আজকের পৃথিবী বা মানবজাতি তার মৃত্যুদূত পারমাণবিক বোমার সামনে উপস্থিত, হয়েছে। মানুষের চরম স্বার্থবাদের মধ্যেই এদের অস্তিত্ব রয়েছে। তবু পরম সান্ত্বনার কথা মানুষ বাঁচতে চায় এবং ওটাই তার প্রথম ও প্রধান আবেগ। এই প্রাণৈষণাই তাপ পারমাণবিক বোমা হতে বাঁচবার পথের সন্ধান করবে। অন্নেষণা আজ পারমাণবিক বোমার সামনে চাপা পড়েছে। কিন্তু লড়াই করে বাঁচবার চেষ্টা দিলে সকলেরই নির্মূল হয়ে যাবার ভয় আছে। সেই ভয়ই তাকে আজ মায়ের অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই মাতৃ-এষণাই (Maternal instinct) আজ মানবতার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। সেখানে স্বার্থান্ধের স্থান নেই। পৃথিবী এবং মানবতা কিম্বা ব্যক্তি জীবনে মানুষ চরম বিপদের মুখে মায়ের অঞ্চলেই একমাত্র নির্ভরতা খুঁজে পায়। মানুষের ইতিহাসে ইহাই বারবার দেখা গিয়াছে।

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ

মানুষের ইতিহাস প্রাণৈষণা, অন্নৈষণা, যৌন-এষণা (sexual instinct) এবং মাতৃ-এষণারই ইতিহাস। অবশ্য যৌন-এষণা অপর তিন আবেগের সহচরী হিসাবেই আসে এবং সাহিত্য শিল্পকলার মধ্য দিয়ে নিজের মুক্তি খুঁজে পায়। মানুষের ইতিহাস একদা সাহিত্যেরই শাখা ছিল। কিন্তু আধুনিককালে ফলিত বিজ্ঞানে (applied science) পরিণত হয়েছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, কার্ল মার্কস এবং তাঁর অনুগামীরা ইতিহাসের এই মর্যাদা দিয়েছেন তাঁদের কম্যুনিজম বা সাম্যবাদে।

জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর Philosophy of Historyতে বলেছেন যে, মানবেতিহাসের ধারা Evolution বা বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ নীতির দ্বারা চালিত হয়। ক্রম বিকাশের পথে স্বাধীনতার ভাব মানুষের ইতিহাসকে পরিচালিত করছে, ইহা তাঁর অভিমত। তাঁর অনুগামী কার্ল মার্কস তাঁর মতবাদ সমর্থন করেও তিনি ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে অন্তর্নিহিত ভাবধারার প্রভাব স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন। মার্কস বলেছেন যে, পরিবর্তনশীল ধনোৎপাদন এবং

ধন বণ্টন বিধি মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ নীতির আশ্রয়ী। কালের গতির সঙ্গে ধনোৎপাদন এবং ধন বণ্টন ব্যবস্থা ক্রমশঃ উৎকর্ষ অর্জন করছে। ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক (Feudalism) প্রথা প্রচলিত ছিল এবং বড় বড় জমিদাররাই ধন বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। তারা রায়তদের কৃষিলব্ধ ধনের অধিকাংশই আত্মসাৎ করত। তারপর বাণিজ্য ও কলকারখানার দৌলতে শিল্পের প্রসার হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনী (Bourgeois) শ্রেণীর সৃষ্টি হল। তারাই পরে সামন্ততান্ত্রিকদের হটিয়ে দিয়ে সমাজে প্রভু হয়ে বসল। সামন্ত-তান্ত্রিকদের ক্ষত্রিয় বলা চলে, তাদের স্থান দখল করল বুর্জোয়া বা বৈশ্যরা; আর এই কলকারখানায় দিন মজুরী করে যারা বাঁচতে চাইল, তারা শ্রমিক কিম্বা শূদ্র শ্রেণী। বুর্জোয়ারা ধনের লোভে ও ধন রক্ষার তাগিদে রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হল না। তারা শিল্পদানবের ক্ষুধা মিটাবার জন্য, নিজের প্রভুত্বের বিলাসে দুর্বল রাষ্ট্র জবরদখল করে সস্তায় কাঁচা মাল আমদানি করতে লেগে গেল; অধিক মূল্যে দেশে প্রস্তুত মাল বিক্রয় করে সেই দেশকে রক্তশূন্য করে আপন কব্জিতে রাখল এবং এই ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসল।

মানুষের ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে যেখানে অন্যায়, অবিচার সেখাইে মানুষের মনে পুঞ্জীভূত হয় অসন্তোষ এবং সেখানেই বিপ্লবের জয় সূচনা। পার্থিব সম্পদ যখন লোভের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে, তখন সে লোভের শেষ হয় না। এ অনেকটা পাগলের দিকচক্রবালের শেষ খুঁজে বেড়ানোর মত হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের কালে তা একবার আমরা দেখেছি। কিন্তু বিপ্লবের সাধন ব্যর্থ করেছে মানুষের স্বার্থপরতা। ফরাসী বিপ্লবের সাধনালব্ধ সম্পদ নিয়ে দুষ্ট শক্তি সাম্রাজ্যবাদ আমদানি করে মানুষের দুঃখকে চরম পর্যায়ে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে নিঃস্ব মানুষ তথা দিন মজুররা। তারা প্রতিষ্ঠা করেছে Dictatorship of the proletariat অর্থাৎ দেশের ধন-সম্পত্তি সমাজের হাতে দিয়ে আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ সমানাধিকার চেয়েছে। কার্ল মার্কসের মতে মানব সমাজের ভাগ্যচক্রনিয়ামক অনতিক্রমনীয় নীতির শাসনে শাসনদণ্ডে শ্রমিকদের হাতে আসবে ও ধনসম্পত্তি সমাজের হস্তগত হতেই হবে এবং যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না। সুতরাং বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধ, বিপ্লব, রক্তারক্তি হবেই। ১৮৪৮

সালে মার্কস Communist Manifesto বা ঘোষণাপত্র বের করেন। এতে ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of history) রয়েছে, তারই শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

"The Communist disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of existing social conditions. Let ruling classes tremble at a Communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workers of all lands unite." অর্থাৎ 'কম্যুনিষ্টরা তাদের মতামত ও লক্ষ্য গোপন করা ঘৃণাজনক মনে করে। তারা প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা বলপূর্বক ধ্বংস না করা হলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কম্যুনিষ্ট বিপ্লবে শাসক শ্রেণীরা কেঁপে উঠুক। শ্রমিকগণ দাসত্ব শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবে না। তাদের পৃথিবী জয় করতে হবে। দুনিয়ার মজুর এক হও।'

১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের মধ্যে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থকতা লাভ করে এবং এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই মানবতার জন্য সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আশ্বাস মিলে। রুশ বিপ্লব প্রথমত দুই পর্যায়ে হয় নাই বললে ইতিহাসকে বিকৃত করা হবে। প্রথমতঃ মার্চ মাসে জাতীয়তাবাদী শক্তি—মেনশেভিকদের নেতৃত্বেই বিপ্লব এবং রাজতন্ত্র বা জারকে উৎখাত করে কেরেনেস্কির নেতৃত্বে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জাতীয় সরকার যখন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে গণপরিষদ আহ্বান করল এবং গণপরিষদের অধিবেশন চলবার কালে পরিষদের শতকরা পঁচিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত বলশেভিক বা কম্যুনিষ্ট পার্টি নবেম্বর মাসে বিদ্রোহ করেন। ইহাই কম্যুনিষ্টদের ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লব নামে খ্যাতি পেয়েছে। তারপর কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সংহত করে ক্ষমতাকে নিজেদের কবজায় রেখে প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারার ডিক্টেটরসিপকে আস্তে আস্তে দলের আমলাতন্ত্রের ডিক্টেটরসিপে রূপান্তরিত করা হয় এবং লেনিনের জীবদ্দশাতেই সমাজকে উপেক্ষা করে দলের আমলাতন্ত্র সন্ত্রাস চালিয়ে আদর্শকে পদদলিত করেছিল। এই লেনিন ১৮৯৫ সালে তার এক লেখায় পোল

ফিনিস, জার্মান, আর্মেনীয়ান এবং অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও যুদ্ধের বোঝা হতে রেহাইর আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে, সে আশ্বাস মিলেনি।

মার্কস বলেছিলেন, 'কোন একদিন শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিবেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে এমন উপায় অবলম্বন করে—যা অনড় ও অপরিবর্তনীয় থাকবে—একথা আমরা কখনো বলিনি। প্রয়োজন বিশেষে দেশের বৈশিষ্ট্য, প্রথা, ঐতিহ্যের বিচার করতে হবে।' এঙ্গেলসও মার্কসের সুরে বলেছেন, 'যে সব দেশে লোকায়ত্ত সরকার আছে, সে সব দেশে পুরানো সমাজ হয়তো শান্তিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করবে। অবশ্য এ সরকারের পিছনে গরিষ্ঠের সমর্থন থাকা চাই।' লেনিনও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কাম্য বলেছেন। তাঁর মতে বিপ্লবী শক্তিগুলি শাসক শক্তি অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী হলে শ্রমিকশ্রেণীর চরম পন্থা অবলম্বন অনাবশ্যক হয়, তখন বিপ্লবের বিকাশ শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর শাসনের ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হিংসা নয়। হিংসা মার্কসীয় মানবতার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। লেনিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হিংসার জবাবে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবেই হিংসাকে দেখেছিলেন এবং পরবর্তী বিপ্লবগুলি আরো মানবিক উপায়ে হবে বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, 'শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করে ধ্বংসের জন্য নয়, সৃষ্টির জন্য। হিংসাবিহীন এক নতুন সমাজ গঠনের জন্যই বিপ্লব'।

কম্যুনিষ্ট নায়ক ট্রটস্কি ইতিহাসজ্ঞ ও ইতিহাসসেবী। ১৯০৫ সালের পূর্বেই তাঁরা Theory of permanent revolution নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, রাশিয়ায় প্রথমত বুর্জোয়ারা বিপ্লব করবে এবং তারপর সোসালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি তাঁর The history of Russian revolution-এর মুখবন্ধে বলেছেন, "The history of revolution like every other history ought first of all to tell what happend and how. That, however is little enough. From the very telling it ought to become clear why it happend thus and not otherwise. Events can neither be regarded as a series of adventures,

nor strung on the thread of some preconceived morality. They must obey their own laws. The discovery of these laws is the authors task" অর্থাৎ 'অন্য সকল প্রকার ইতিহাসের মতই বিপ্লবের ইতিহাসেও কি ঘটনা হয়েছিল এবং কেমন করে ঘটেছিল, তা উল্লেখ থাকা উচিত। অবশ্য এ বিবরণের মূল্য বেশী নয়। কেন এই প্রকার হয়েছিল এবং অন্যপ্রকার হয়নি তা বর্ণনার ভঙ্গীতেই থাকবে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী নয় অথবা কোন প্রচলিত সদুপদেশের দৃষ্টান্তও নয়। ঘটনা নির্দিষ্ট নীতি বা গতিতে চলে—এই নীতি বা গতি আবিষ্কারই ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব ও বিশ্লেষণ

অতীতের ইতিহাসের অনুশীলনে মার্কস বা তাঁর অনুগামীরা যে পথ গ্রহণ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য এবং সেই পথ অনুসরণ করে অতীতের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে ভবিষ্যতের পথ ঠিক করা সঙ্গত হতে পারে। কিন্তু তাঁদের পথই একমাত্র পথ বা সম্পূর্ণ তাও ঠিক নয়। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকেই ঘটনা আলোচনা রীতি বা গতি বলতে চেয়েছেন। তাঁরা বলতে চান যে, পেটের ক্ষুধা, ভোগলিপ্সা ও সেজন্য ধনতৃষ্ণা এবং প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সমাজের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ বা প্রবর্তন করে। পরিদৃশ্যমান জগৎ ছাড়া চিন্তাশীল মানুষেরা অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিকাল ছাড়া পরকাল অস্বীকার করেন না। অতীন্দ্রিয় জগতে এবং পরকালে বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তি। ধর্মের ইতিহাস বা ধর্মজীবনকে সম্পূর্ণরূপে টাকা পয়সার জমাখরচে পরিণত করা যায় না।

মার্কসের ক্রমবিকাশবাদকে অসম্পূর্ণতার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। তিনি সামাজিক বাহ্য পরিবর্তনে বাহ্য আর্থিক অবস্থার প্রভাব স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর ইতিবৃত্ত বিজ্ঞানে বংশানুগতির কোন স্থান নেই। একই পরিবেশে শিক্ষাদীক্ষার ও ধনোপার্জনের সমান সুযোগ সত্ত্বেও বংশানুগত শক্তির অভাবে সকলে সমানভাবে শিক্ষিত হতে ও সমান অর্থ রোজগার করতে পারে না। সুতরাং ধর্মবিশ্বাস এবং বংশানুগতি উপেক্ষা করে কেবল ধনোৎপাদন ও ধন-বণ্টনের হিসাবে সমাজের ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যাবে।

মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ আজ নয়, কোন্ অনন্তকাল হতে মানুষের ধারা চলে আসছে। দেশকাল পাত্র হিসাবে মানুষের ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে। ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শন তার মানুষকে প্রভাবিত করেছে। ভারতের ইতিহাসকে ইউরোপের দিক হতে বিচার করলে ভ্রমে পড়তে হবে। মানুষ অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ এক অদ্বিতীয় জীব। অশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ নিজকে আবিষ্কার করেছে। তার এ আবিষ্কারের উদ্যমের বিরাম নেই। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ভারতের মনীষা এক বিচিত্র সুরে চলেছে। সে সুর জড়বাদী সুর নয়। এদেশে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত, প্রাণ নামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এ প্রাণ আকর্ষণের উপর কার্য করিয়া এই জগৎ প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে।' এখানে আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক ভারতের দর্শন এবং এখানকার মানুষকে উহা প্রভাবিত করেছে। পরিশেষে মানুষ গড়ে উঠে, আর অভ্যাস বদলানোও সহজ সাধ্য নয়। এই মানুষের প্রকৃতিতে যে প্রভাব আছে, তাহাও আজকের নয়। এখানে মানবীয় অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের মধ্যে যখনই বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই মানবীয় অধিকারের দাবি অগ্রাধিকার পায়।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত মূল প্রকৃতি বা প্রধানে সাম্যাবস্থায় থাকে এবং প্রকৃতির যখন পরিণতি বা সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়, তখন সমস্ত সৃষ্টিতে এই গুণত্রয় সঞ্চারিত হয়। মানুষের মধ্যে যে ত্রিগুণ বর্তমান, তা মূল প্রকৃতি হতে এসেছে। জীব বিজ্ঞানের ভাষায় এই গুণত্রয় হচ্ছে বংশানুগত লক্ষণের বাহন (hereditary factors)। আধুনিক কালের জীব-বিজ্ঞানানুসারে সে পদার্থ বংশানুসারে লক্ষণ বহন করে তার নাম জিন বা জেনস (genes)। জীবের দেহ বহু সেলস (celles) জীবাণুপুঞ্জ বা কোষ সমষ্টি। একটিজীবাণু বা জীব কোষ নিয়ে অধিকাংশের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটি জীবাণু প্রোটোপ্লাজম (protoplasam) নামক পদার্থ পূর্ণ। প্রত্যেকটি জীবাণুর কেন্দ্র (nucleus) অপেক্ষাকৃত ঘন। এই জীবাণুকেন্দ্র দুভাগে বিভক্ত হলে তাতে রঞ্জনকারী ক্রোমোজোমস (chromo- somes) দেখা দেয়।

মানবজীবন গঠনে এবং জীবনের স্বাতন্ত্র্য নিরূপণে যতগুলি শক্তি এবং দেহ

গত যে সব পদার্থ সক্রিয় তার অন্যতম হল—ক্রোমোজোম। এ ক্রমোজোম সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনেক পুরানো; তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। দেহসংশ্লিষ্ট ক্রোমোজোমের সংখ্যা ছেচল্লিশ; এর ভিতর দুটি সেকস ক্রোমোজম। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেকস ক্রোমোজম দুটিই এক্স এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির একটি এক্স, অপরটি ওয়াই। ক্রোমোজোমদের অবস্থান স্বাভাবিক ভাবে যুগ্মভাবে। কখনো যুগ্মভাব নষ্ট হয়, কখনও অতিরিক্ত সেকস ক্রোমোজোমের উৎপত্তি হয়। কখনও এ সংখ্যার চেয়ে কম হয়। এ হ্রাসবৃদ্ধির জন্য নানা ভাবে রীতিযুক্ত যুগ্ম অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার সঙ্গে মানবজীবন গঠনে অস্বাভাবিকতাও আসে। এই ক্রোমোজোম বংশানুগত লক্ষণের বাহন জিন বা জেন্ (gens) সকল বহন করে। আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণের দ্বারা জীবাণুর জেন আবিষ্কার করেছেন এবং তাদের কার্যও পরীক্ষা করেছেন। ত্রিগুণবাদ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফলে বংশানুগতি স্বীকার করা হয়েছে। দৈহিক ও প্রাণিন দিকগুলি এ ভাবেই সংক্রামিত হয় কিন্তু মানসিক প্রজ্ঞানগত ও আত্মিক সক্ষমতাগুলো কর্মফল সাপেক্ষ। হতে পারে তা পূর্ব জন্মগত অর্থাৎ প্রাক্তন অথবা বর্তমান জন্মের সাধনা বা পুরুষাকার।

মানুষের ইতিহাসে বা ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণে এই বংশানুগতিকে অস্বীকার করলে বিজ্ঞানকে বা সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্ন রূপ মাত্র; কল্পনান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া যাইবে। তখন সেই তরল পদার্থটি বাষ্পীয় আকারে পরিণত হইবে। তাহা আবার তেজরূপ ধারণ করিবে।' তিনি আরো বলেছেন: 'আকাশ ও প্রাণকে আর কিছুতে পর্যবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে মন নামক উচ্চতর ক্রিয়া শক্তিতে পর্যবাসিত করা যাইতে পারে। মহৎ অর্থাৎ সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই দুইটি শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়'। এছাড়া ভারতীয় সমাজে বিশেষভাবে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে কর্ম ও জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস বর্তমান। সকল ধর্মেই পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু জন্মান্তরের সহিত জড়িত হওয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধের কর্মবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ নিয়েছে। পাপের ফলে দুঃখ হয় ও পুণ্যের ফলে সুখ ভোগ হয় এবং এই

এই ভোগের জন্যই সেই প্রকার পর্যায়ে জন্মগ্রহণ করে। এই বিশ্বাসও রয়েছে। কিন্তু জন্মান্তরবাদ এই শিক্ষাও দেয় যে, দুঃখে উদ্বিগ্ন হওয়ারও কারণ নেই এবং সুখও কাম্য নহে। সুখ দুঃখ বন্ধন। দুঃখকে প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে আনন্দের সন্ধান করা উচিত, তাতে পাপের ক্ষয় হবে। বাসনা বা বন্ধনহীন অথবা আবরণমুক্ত হয়।

এ দেশের ধারণা, অর্থ শক্তি দেয় না ; শক্তি চায় মনের পবিত্রতা ও সততা। সে জানে এ পৃথিবীতে সে একজন আগন্তুক, অল্প কয়েকদিনের জন্য মাত্র এসেছে। কাজ করতে হবে কিন্তু কোন বন্ধন মানবে না, কারণ বন্ধন মাত্রই অতিশয় পীড়াদায়ক। তবে ইহাও ঠিকই দুঃখে আহত হলে স্নায়ুর দৃঢ়তা নষ্ট হয় এবং তার ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তি হারিয়ে পরম দুঃখকে বরণ করে। এই কর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীরা জাতিগত হীনতা দীনতাকে প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে, কারণ তারা মুক্ত জীবের অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখে বিশ্বাসী বলে স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনের দুঃখ দৈন্যকে উপেক্ষা করে এবং কর্মফলের পালার অবশেষে শান্তি অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন : 'তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব, নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয়, কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়।'

ভারতে মানুষ Political animal বা রাষ্ট্রীয়ভাব সর্বস্ব জন্তু নহে। তারা মনে করে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণকারী শ্রান্ত পথিক ছাড়া তারা আর কিছু নহে এবং অল্প সময়ের জন্যই মনুষ্যলোকে এসেছে। তারা মনে করে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর'—একথা অর্বাচীন নয় ; সন্তান যেমন পিতামাতার উপর নির্ভরশীল, মানুষকেও তেমনি বোধ নিয়েই এ ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলা হয়ে আসছে। আধুনিক যুগ যুক্তির যুগ। এযুগেও শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর যুক্তি গ্রাহ্য সুরেই বলেছেন : 'মনের বেগ ধৈর্যের দ্বারা পরিহারে আবেগ পিযুষ পরিপূর্ণ সত্যকে পায়। তাহাকে পাইলে প্রেম ভক্তির কোন দরকার হয় না। প্রেমাদিরুচি অরুচি সকল মনের। ভগবানের নিকট কিছুই থাকে না, একমাত্র নামই থাকে। যখন ঘুমের মধ্যে কেহ থাকে না, ভগবানই থাকেন। ভগবানই নাম। নাম করিতে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। আপদে বিপদে প্রাণ কখনও ত্যাগ করে না। এ প্রাণই ভগবান। ইনি শুদ্ধ, অশুদ্ধ, পাপ পুণ্য

বলিয়া তারতম্য রাখেন না, সমান। শরীরই ক্ষয়শীল. শরীরীর ক্ষয় নাই? ইহার অধীন হইলে সকলি প্রাপ্ত হয়'। (বেদবাণী ২য় খণ্ড ১৪৩ সংখ্যা।) এ জাতির কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ই গভীর ভাবে ভগবান বিশ্বাস করে। আচার আচরণ পৃথক হতে পারে কিন্তু ধর্মে সকলেরই আস্থা আছে। যারা ঈশ্বরবিরোধী তারা তা গোপন করেই এদেশের জনগণের কাছে উপস্থিত হন। এ দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিরা সক্রিয় সদস্য হবার সময় যে সকল শপথ বাক্যে স্বাক্ষর করিয়ে নেন তার একটিতে আছে ঃ 'আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না এবং পৃথিবীর তাবৎ ধর্মগুলিকে আফিং স্বরূপ গণ্য করি।' কিন্তু এ দেশে এরা দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা এবং অন্য সব সার্বজনীন পূজায় ও অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। যে জাতির লোক এই সংস্কার বিশ্বাস করে, তাদেরে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিচার করলে তাদের প্রাকৃতিক গঠনের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভারতের ইতিহাসের Materialistic interpretation দিতে গিয়ে জাতিভেদের উৎপত্তি সম্পর্কিত পাশ্চাত্য মতবাদকে উপস্থিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। আক্রমণকারী আর্য এবং আক্রান্ত অনার্য এই দুয়ের বিরোধ হুজুর বা বুর্জোয়া এবং মজুর বা প্রোরেটারিয়েটদের বিরোধের আদিম সংস্করণ বলে চালিয়ে দিয়ে বিশ্লেষণ বা interpretationকে সহজ করা হয়। জাতিভেদ যাচক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং শাসক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের স্বাতন্ত্র্যসত্তা হতেই এসেছে। উহাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি হুজুর মজুর বা ধনী দরিদ্রের বিরোধের সহিত তুলনা অচল। এই অস্বীকৃতির মূলে বর্ণশঙ্কর ভীতি অর্থাৎ বংশানুগতি সম্পর্কে সংস্কার। আবার চতুর্বর্ণের সহিত পঞ্চমবর্ণ বা নিষাদদের যে গুরুতর মতভেদ তাহাও বিজেতা আর্য ও বিজিত অনার্যের সম্বন্ধ নহে। ক্ষত্রিয় রাজা ও নিষাদনৃপতিরা বন্ধুভাবেই রয়েছেন। বর্ণ শঙ্করভীতি এবং আচার শঙ্কর-ভীতিই জাতিভেদের বন্ধন কঠোর করেছে। কিন্তু এসত্ত্বেও বর্ণশঙ্কর এবং আচার মিশ্রণ হয়েছিল।

মানুষের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে পূর্বে বিধাতার অঙ্গুলিসংকেত অনুমিত হত; এখন সেখানে একটা কার্যকারণ পরম্পরা দেখেন দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা। অতীতের বিকাশ বর্তমানে এবং বর্তমানের গতি ভবিষ্যতের দিকে—এই মাত্র ইতিহাসের অর্থ। আর এই যে অতীতের ভস্মস্তূপ দ্বারা নির্মিত বর্তমান, সেটা

জড়ের ইতিহাসে যেমন, মানুষের ইতিহাসেও তেমনই। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যেমন আকাশে মেঘ সঞ্চিত হয় এবং অবস্থা-বিশেষে যেমন তা জল হয়ে ঝরে পড়ে। তেমনই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থান ও পতন—আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়ে থাকে। পুরোহিততন্ত্রের (Priesthood) এবং প্রজা-জমিদার সম্বন্ধের (Feudalism) তারপর মজুর মালিকের (Capitalism) উদয় হয়েছে ; আর তেমনই বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ শ্রেণীহীন (classless) সমাজের দিকে চলেছে। কিন্তু দেহ দেহাতিরিক্ত আত্মা ভারতীয় দর্শনে বিশেষ স্থান পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : 'আমাদের দেহের অন্তরালস্থ ভাবকে আত্মা এবং জগতের অন্তরালস্থ ভাবকে ঈশ্বর বলে। তারপরই পরম এবং সর্বশেষে রূপ—যা আমরা দর্শন স্পর্শন করে থাকি।' দেহ যেমন সত্য, দেহী বা আত্মাও তেমনি সত্য বলে ভারতীয় মানসে স্থান করেছে ; তাঁরা জেনেছেন যে, দেহ প্রত্যক্ষ সত্য, আত্মা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অগোচর হলেও সত্য ; গভীর নিদ্রায় যে রয়েছেন এবং যিনি রয়েছেন তার অবর্তমানে দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রাণবান দেহেতে যেমন দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক এক পদার্থ আছে, তেমনই আমাদের চারদিকে বর্তমান জড়-জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যেও ভগবান নামক এক পদার্থ আছেন। যিনি পৃথিবীতে আছেন অথচ পৃথিবী যাঁকে জানে না যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে চালিত করেন এবং পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন—এইরূপ অন্তর্যামী পুরুষের সত্বা ধর্ম ও দর্শনের একটা স্বীকৃত সত্য। অবশ্য এই অন্তর্যামী পুরুষের সত্বা ও স্বরূপ এবং জীব ও জগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিয়ে যথেষ্ট তর্ক ও মতপার্থক্য বিদ্যমান। তথাপি স্পষ্ট হউক, অস্পষ্ট হউক, এরূপ একটি সত্তায় বিশ্বাস মানুষের আছে। গান্ধীজি বলেছেন : 'আমি বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অখণ্ড আত্মতত্ত্ব পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করি ও তাহাই চরমতত্ত্বরূপে শিরোধার্য করে ভগবান ও মাতৃভূমির সেবায় আত্মসমর্পণ করেছি। নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্য দিয়ে আমি মোক্ষ চাই। আমিও মুমুক্ষু, কিন্তু আমার বিশ্বাস ও অনুভূতির নির্দেশে আমি দেশ ও সর্বমানবের মুক্তির প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে চলেছি। আমার বিশেষ কথা এই যে আত্মার জন্যই আমি সকল কর্ম ও অনুষ্ঠান করি। কিন্তু এ আত্মা সর্বগত বলে আমি জাতি ও মানবের মুক্তিব্রত গ্রহণ না করে থাকতে পারি না। ইহা সত্য যে, আমাদের জীবনের

প্রথম আরম্ভ আত্মপ্রেরণায়, পরে ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা অভিব্যক্ত হয়ে বৃহত্তর সমষ্টি-আত্মায় পর্যবাসিত হয়। পরিশেষে পরমাত্মা লাভই সকলের উদ্দেশ্য।....আমার সমুদয় জীবন ও কর্মের লক্ষ্য—"শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।"

জীবনের শৃঙ্খলা সহনের শক্তিই জীবনের যথার্থ মূল্য। 'অনায়াসে পেয়েছে ছলনা সহিতে'—সে মানুষই জীবনের সর্বোত্তম পুরস্কার লাভের অধিকারী। 'এ প্রবঞ্চনা দিয়া মহতেরে করেছে চিহ্নিত'। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষবাক্যে জীবনের এ ছলনারই জয় গান করেছেন। জীবনের সৌন্দর্য মাধুর্য মাহাত্ম্যের সবই ঐ ছলনার মধ্যে। ছলনা তো নিন্দার কথা নয়। নারীকে আমরা যখনই ছলনাময়ী বলি, সেতো তার নিন্দা করে বলি না। একেবারেই উল্টো। এটিই তার সর্বপ্রধান আকর্ষণ। নারী যদি ছলনাময়ী না হত তবে সে ভালবাসার অযোগ্য হত। মহৎ জীবনও যে অত সুন্দর তারও মূল ছলনাময়। ছলনাই তাকে রহস্যময়ী করেছে। তাকে মনোহর করেছে। একে স্বীকার করে নিয়েই মানুষ আত্মা ও পরমাত্মা বা ভগবান বিশ্বাস করেন; আর জড় ও চেতনের প্রভেদও স্বীকার করেন। এক শ্রেণীর দার্শনিকরাও এই সব স্বীকার করেন এবং জগৎ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে চেতনের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন।

জড়বাদী বা বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকের অস্তিত্ব অস্বীকার করছি না; চার্বাকের ন্যায় দার্শনিক অনেক এসেছেন। তাঁরা চেতনের পৃথক সত্তা স্বীকার করেন না, জড়েরই অবস্থা বিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। তাঁরা বলেন যে যকৃৎ হতে যেমন স্বভাবতই পিত্ত বের হয়, তেমনি মস্তিষ্ক নামক জড় দেহের অংশ বিশেষের ক্রিয়া বিশেষের নাম চিন্তা এবং এরই অবস্থা বিশেষের নাম চৈতন্য। আত্মা নেই ভগবানও নেই। এই মতবাদ মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ হতেই রয়েছে। তবে আমরা যাকে অদৃষ্ট বলি সে আমার নিজের স্বভাব। আমার মনের গড়ন আমাকে অমোঘ শক্তিতে বিশেষ একদিকে টেনে নিয়ে যায়। মনের গড়নই জীবনকে গড়ে। মন একবার গড়ে উঠলে জীবন আর নতুন করে সুরু করা শক্ত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : 'The nature of man and of things is at present a discord, harmony that has got out of tune. The whole heart and action and mind of man must be changed, but from within, not from without, not by political and and social institution, not even by creeds and philosophies.

but by realisation of God in ourselves and the world and a remoulding of life by that realisation'.

কিন্তু জগতের উৎপত্তি বুঝতে গিয়ে আমরা ভগবানের অস্তিত্বের সন্ধান পাই এবং মানুষ তারই স্তরে পৌঁছে স্বাধীন কর্তৃত্ব লাভের সন্ধান পায়। মানুষ জড় পরমাণুর মত অন্ধ জড় প্রকৃতির শক্তির দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। ব্যক্তি হিসাবে মানুষের যেমন স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে, তেমনি এবং সেই জন্যই সমাজেও মানবসমষ্টির সেইরূপ কর্তৃত্ব রয়েছে। ব্যক্তি ও সমষ্টিভাবে মানুষের সমস্ত ক্রিয়ায় তার স্বাধীন কর্তৃত্ব ধর্ম মাত্রেরই কম বেশী স্বীকৃত সত্য। ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্ব না থাকলে পাপ পুণ্যের বিচার চলে না এবং অপরাধীকেও শাস্তি দেওয়ারও কোন যুক্তি থাকে না। খুন ও রাহাজানি যে করে, সে ঐ অপরাধ নাও করতে পারত, এরূপ আমরা মনে করি এবং তা মনে করি বলেই অপরাধীকে শাস্তি দিই। কিন্তু বাত্যা, বন্যা বা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনায় যদি কেহ মারা যায়, তবে সেজন্য কাকেও দায়ী করা হয় না। কেননা আমাদের বিশ্বাস ওদের কোন ব্যক্তিত্ব নেই, কোন স্বাধীন ইচ্ছাও নেই।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

ব্যক্তি হিসাবে মানুষের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে, তার প্রকাশ তার সামাজিক জীবনেও হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষাতে বলেছেন: 'বিশ্ব সাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিষ, তিনি নিজে রাখেননি—সেটি আমার ইচ্ছা। ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন।' সমাজে পরিবার, শ্রেণী প্রভৃতি গোষ্ঠি গঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, এমন কি রাষ্ট্রের উৎপাদন পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই কোন না কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির ক্রিয়াই আমরা দেখতে পাই এবং সেভাবে আমরা এসব ব্যাপার বুঝি। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বা ক্যাপিটেলিষ্টিক রাষ্ট্র গঠনে সেই সুকৃতি বা দুষ্কৃতির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের স্বাধীন ইচ্ছাই দায়ী, এর জন্য প্রশংসা বা নিন্দা সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রাপ্য।

মানুষের সমগ্র ইতিহাসকে এইভাবে আমরা জড় প্রকৃতি হতে পৃথক করে দেখি। ইহা জড়ের নিয়মাধীন, যন্ত্রের মত চলে, উহাতে স্বাধীন ইচ্ছা কোথাও নেই; উহার সমস্ত ক্রিয়াই অন্ধ শক্তির ক্রিয়া; ভূত ভবিষ্যৎ ভেবে কোন উদ্দেশ্যের

জ্ঞান নিয়ে প্রকৃতি কাজ করে না। কিন্তু মানুষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে; তার অতীত ও অনাগতের একটা ধারণা আছে, একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এখানে অন্ধশক্তিই প্রধান নয়। যেহেতু এখানে ব্যষ্টির এবং কতকটা সমষ্টিরও একটা সক্রিয় পুণ্যাপুণ্য বিবেক রয়েছে, সে জন্যেই ইহার গতি ও পরিণতি অন্যরূপ। ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে এবং সেই জন্যেই মানুষের ইতিহাসেও যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়; পাপে ক্ষয় হয় এবং ধৈর্যের দ্বারা উন্নতি হয়। জাতির বেলাও ঠিক তাই। 'Righteousness exalteth a nation'—পুণ্যই জাতিকে উন্নত করে। এতকাল মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই লোকে পোষণ করেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: 'বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে আমরা লাভ লোকসান ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য বিচার করি। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করি। আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন যতক্ষণ বুদ্ধির অধীন থাকে, ততক্ষণই আমাদের জীবনে শৃংখলা থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষুব্ধ হয়ে যখন বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখন জীবন বিশৃংখল হয়ে উঠে।'

জড়ের অপেক্ষা চেতন বড়, দেহ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বড় এবং জগতের মধ্যে মানুষ বড়। এই সকল সত্য গৃহীত হয়েছে এবং আর একটা বড় সত্তায় মানুষ বিশ্বাস করে—সেটা ভগবান। ভগবানের শক্তিও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তিনিও আত্মা—জড়প্রকৃতি instinct বা প্রবৃত্তির বেগে চালিত বলেই যান্ত্রিক শক্তির মতই পরিচালিত হয়। কিন্তু এই বিরাট যন্ত্রের চালক—সেই পরমপুরুষ জগৎ যন্ত্রের শক্তি, প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ইচ্ছাশক্তি। জগতের নিয়ম তাঁরই কৃত নিয়ম। জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মা—এ উভয়ই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরই বিধানে আত্মা দেহ হতে শ্রেষ্ঠ। আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব এই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। চিৎ-অচিৎ সমন্বিত এই চরাচর তাঁরই শাসনে অবস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, ভগবান নিরাকার কিন্তু যখনই আমরা তাঁর চিন্তা করতে যাই তখনই তাতে নররূপ যুক্ত করতে হয়। চিত্ত যেন একটি স্থির হ্রদের তুল্য; চিন্তা সম্বন্ধ যেন ঐ চিত্ত হ্রদের তরঙ্গ স্বরূপ, আর এ সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব প্রণালীকেই, নামরূপ বলে।'

সৃষ্টি স্থিতি লয়—জগতের এই তিনটি অবস্থা; যন্ত্রের মত ঘুরে ঘুরে এই তিনটি আসে ও যায়। ব্যক্তির সম্পর্কেও একই নিয়ম,—জন্ম, জীবন এবং আয়ু শেষ

হলে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুই শেষ নয়। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মার সম্পর্কে এই ক্রম চলবে। জগতের অবস্থাও ঠিক তাই, সৃষ্ট জগৎ নিয়মিত কাল স্থিতি লাভ করবে; তারপর তার প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে আবার তার সৃষ্টি। মানুষ, জড়পিণ্ড, ঋষি, দেবতা, সমস্তই ক্রমানুসারে এই অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়ে অনাদি কাল হতে চলে আসছে। এর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করতে পারে, সে এই চক্রের বাইরে চলে যায়, এই মাত্র। দেহ অর্থ—আবরণ। স্থূল জগতে আবরণের আবশ্যক হয়। সে আবরণে প্রাণ মন থাকে, এতে প্রাক্তন ও কর্ম চলতে থাকে। সাধনা অর্থাৎ সাধ না থাকা বা বাসনাহীন হলেই তার মুক্তি; আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন আর দেহ বা আবরণ থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীরের পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় হয়। মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ বসন পরিধান করিয়া যান।'

মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ

জীবের পরিপূর্ণ বিকাশ মানুষের মধ্যে। মানুষের দৈহিক উন্নতি শেষ সীমায় পৌঁচেছে। এখন তার আত্মিক বিকাশ পূর্ণ পরিণতির দিকে চলবে। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে জলে স্থলে আকাশের জীবদের পরাজিত করেছে। মহাজাগতিক রশ্মি ভেদ করে চন্দ্রে পৌঁচেছে। এখন তার উন্নততর ও বৃহত্তর জীবনের দিকেই হবে স্বাভাবিক গতি। তার ক্রমোন্নতির প্রবাহ স্তব্ধ হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সূর্য প্রতিক্ষণেই তাপ হারাচ্ছে এবং পূরণ হচ্ছে না। সূর্যের এই তাপ নিঃশেষ হলে জীবনের লোপ হবে, ক্রমোন্নতির ইতিহাসের যবনিকা পাত হবে সেদিন। মানুষ এই পরম সত্যকে যেমন অস্বীকার করতে চায় না, প্রাণৈষণার তাগিদে; তেমনি মানুষ আজকের অন্ধকারে জীবনে আলো খুঁজে পাবে মায়ের অঞ্চলে গিয়ে—মাত্রৈষণার প্রেরণায়। ব্যক্তি বা সমষ্টির জীবনে বিকৃতি ও হিংসার প্রাবল্যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অত্যাচার, অনাচার, অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা দেখা দিলেই প্রাণ রক্ষার দায়ে মায়ের অঞ্চল মানুষ খোঁজে, তখনই মাতৃ-এষণার উদয় হয়। অবস্থার চাপে মানুষ অহিংস হয় এবং সে অহিংস পথই তাকে আত্মার পরিচয় জানিয়ে দেয়।

সমাজবিজ্ঞানীরা মানব প্রকৃতিতে উত্তেজনা ও হতাশা হতে জাত আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিবর্তনের পথেই তৃণলতা, কীট, পতঙ্গ, জীব মনের সঙ্গ পেয়ে মানুষ হয়েছে বলে তার মনে তার অতীতের বন্য জীবনের প্রবণতা থেকে যায়। তাই সে ভূঃ হতে ভূমাতে পৌঁছতে বা সত্যকে উপলব্ধির সাধনাতেই এ বন্য প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়। অবশ্য এ কঠোর তপস্যা (upward motion) সময় সাপেক্ষ কিন্তু পারমাণবিক বোমার ধ্বংসের ক্ষমতায় মতই মানবাত্মারও প্রেম ও মৈত্রীর ক্ষমতা অপরিসীম। যারা ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়িয়ে তাদের বিরোধীদের নির্মূল করতে চায়, মানুষের প্রেম প্রীতির শক্তি দিয়েও মানুষ পরকে আপন করে নেবার শক্তি পেয়েছে। অন্ধকার থেকে আলোর যদি জন্ম হতে পারে তবে বিদ্বেষ থেকেও প্রেমের জন্ম হতে পারে। ঘৃণা যেমন বিনাশকে ডেকে আনে, প্রেমও তেমনি জীবনকে ডেকে আনে। বিরাটের ছোঁয়ায় ধন্য হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'তাঁর প্রেমের জন্য যে লোক ক্ষেপেছে, সে যে নিজকে দীন করে সকলের পিছনে এসে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারে দরবারি তাদের পায়ের ধূলো পেলেও সে যে বাঁচে।'

মানুষের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, মানুষ তার স্বজাতিকে চিরকাল যুদ্ধ বা ধ্বংসে নামিয়ে এনে বিলোপ করতে চেয়েছে। কিন্তু পশুদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, তারা তাদের স্বজাতি বা সগোষ্ঠিকে হত্যা করে না। মানুষ মানুষকে ধ্বংস করবে এটা কিন্তু মানব প্রকৃতিতে স্থায়ী নয়। যদি তা হত তবে মানব জাতি বিলোপ হয়ে যেতো। দয়া, প্রেম, প্রীতি অর্জন করা যায় এবং তার নিষ্ঠুর আচরণেরও সংশোধন হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের গভীরে যে ভাবালুতা ও আক্রমাণত্মক প্রবণতা আছে তা সুপ্রাচীন। তবে মস্তিষ্কের নতুন প্রসারণের সুযোগও রয়েছে। দেখা গিয়েছে যে মানব প্রকৃতিতে মস্তিষ্কের নিম্ন ভাবালুকেন্দ্র উচ্চ কেন্দ্র হতে আরও বেশী শক্তিশালী। অভ্যাসের দ্বারা উচ্চ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে একে আনা যায়। এ সংঘর্ষ করার কেন্দ্র উৎখাত সম্ভব হবে বলেও সমাজ বিজ্ঞানীরা ভরসা দিয়েছেন। কিন্তু মানবপ্রেমীরা তো আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। হেনরী ডেভিড থোরো বলেছেন—'Truth corresponds to love, because truth is realised by establishing a direct communication with

nature since a love of nature is preemently a lover of man; and since truth corresponds to love, to speak truth is to speak lovingly'.

অহিংস সমাজ

সন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ মায়ের স্বভাব ধর্ম এবং এবোধই মাকে তাঁর সন্তানের জন্য নিজকে উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের আমি বোধ তুমিতে ডুবে যায় সন্তান মমতায়। আত্মিক শক্তির মূল উৎসও সেখানেই রয়েছে বলে মাতৃ-এষণা এবং আত্মিক শক্তির সমার্থক। তুমি বোধই বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিবৃত। গান্ধীজি হলেন মানবপ্রেমী। নির্যাতিত স্বাধীকারচ্যুত মানুষের সেবা তাঁর সমাজদর্শনের ভিত্তি বলেই সত্য ও অহিংসা তাঁর জীবনের মূল সুর। তাঁর হৃদয় ছিল সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ, নিরীক্ষণ শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। তাই কাজে ও কথায় ছিল না বৈসাদৃশ্য; জীবনের গবেষণা গৃহে সত্য নিয়েই তাঁর ক্রমাগত পরীক্ষা। সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, শক্তির অপব্যবহার, তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি জেনেছেন, 'যতদিন শোষণ চলবে, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার বাড়তেই থাকবে, আর সে অবস্থায় অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।' গান্ধীজি বলেছেন: 'What we have taken as Dharma is not Dharma, we commit violence on a large scale in the non-violence. Fearing to shed blood, we torment people every day and dry up their blood'. এ মানবদরদী মহামানব আধুনিক সভ্যতার প্রতিবাদ। এ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বর্তমান যুগের তরুণের বিদ্রোহ কিন্তু তারা সত্য, অহিংসা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, নীতিবোধ বর্জিত। হিংসা জবরদস্তি সঙ্ঘবদ্ধতা ও ক্ষমতার মত্ততায় তারা মসগুল। গান্ধীজি আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করতেন বলে দরিদ্র, নির্যাতিত তথা সর্বহারার বেদনায় কাতর ছিলেন। উপায়ের চেয়ে উদ্দেশ্যেই ছিল তাঁর কাছে মহৎ ও বৃহৎ। তিনি দেশের ও জাতির পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির জন্য কাজ করলেও তাঁকে রাজনৈতিক নেতা বলা হলে ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ করা হয়। তিনি এ গণ্ডীতে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি পেয়ে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন। গান্ধী মানব মুক্তির আন্দোলন।

রাজক্ষমতা বংশগত হতে দলগত বা পার্টিগত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

ব্যক্তির স্বার্থের মতই দল স্বার্থেরই প্রাধান্য সেখানে। সাধারণ মানুষ পূর্বে যেমন অসহায় ছিল এখনও অসহায়। জাতীয় সম্পত্তি মুষ্টিমেয়ের হাত থেকে কিছু বেশী লোকের হাতে গিয়েছে। সেখানে ভাগবাটোয়ারার প্রশ্নই আধুনিক রাজ-নীতি। সাধারণ মানুষ পূর্বে যেমন জোরজুলুমের সম্মুখীন হত; এখনও তার অবস্থা সেখানেই রয়েছে। এই জুলুমবাজি যতদিন থাকবে ততদিন জনগণ তথা সমাজ অনিশ্চিত অবস্থায় থাকবে। এ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিরাপত্তার অভাব; আর যেখানে নিরাপত্তা নেই, সেখানে শান্তি নেই। ভোগী ও লোভী মানুষের এ চরিত্রের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থার মুক্তি নেই। মানবপ্রেমী গান্ধী মানুষের মনের এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে এ সমাজের কল্যাণ আসতে পারে না একথাই দৃঢ়ভাবে বলেছেন।

বর্তমানই প্রত্যক্ষ সত্য, ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত, অনিশ্চিত সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়কে বড় স্থান দিতে এক বিশেষ ধরনের অভ্যাস ও বিশ্বাস আবশ্যক। গান্ধীজি ব্যক্তি বা সমাজের জীবনে সত্যকে না ধরে রাখলে মহত্বের জন্ম হয় না বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সত্যকে বর্জন করলে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির কিম্বা সামাজিক সম্পর্কের কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি থাকে না। আর সুস্থ সমাজ ছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনেও স্থিরতা আসে না। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা তো ভাবাই যায় না। সত্যের পথকে ত্যাগ করলে বন্যজীবনে নেমে পড়তে হয়। মহৎকে আয়ত্ব করতে কঠোর তপস্যা চাই। সেখানে পরাজয় স্বীকার করে জীবনের অন্যক্ষেত্রে নেমে জীবনকে জয় করা যায় না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করে প্রেয়কে পাওয়া যেতে পারে, শ্রেয় মিলে না। পরাজিত ব্যক্তি ধোকাবাজিকে সম্বল করে জীবনে বের হয়ে পড়ে, সামনে পায় চোরা গলি। এ চোরা গলি তো মৃত্যুর পথ। ব্যক্তির চরিত্রে মহত্ব জন্ম গ্রহণ না করলে সংযমের অভাব দেখা দেয়। সে অবস্থায় সমাজে গাঁজলা বা মার্ক্সের ভাষায় Social scum'-এর সৃষ্টি হয়। এ গাঁজলা ব্যক্তি, পারিবারিক, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

অবশ্য সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিষ্টরা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয় বলেন। রাশিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে এ পরীক্ষা করে দেখছে। সেখানে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মনের পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়া

সহ কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রেই ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেননি, করেন না। সেখানে তাঁদের শুধু ক্ষমতা হতে অপসারণই করা হয় না, ইহলোক হতেও বিদায় দেওয়া হয়। গান্ধীজি নির্ভীক নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি বিশাল দেশকে ত্রিশ বৎসর অঙ্গুলি ইঙ্গিতে চালিয়েছেন, কিন্তু রাজাসনে বসেন নি। এখানেই ছিল তাঁর ক্ষমতা। নিজ শক্তিতে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কারো দানে জাতির নেতৃত্ব তাঁর কাছে আসেনি। এ নিরাসক্ত অপরিগ্রহব্রতী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষটি সত্যাগ্রহী। সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর কাছে মহৎ ও বৃহৎ। তিনি অসৎ ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম চালাবার যে কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, তার নামই তো সত্যাগ্রহ। তিনি পাপকেই ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। নিখিল জনের প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর অধিকারী হয়েছিলেন কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা। প্রচলিত সত্য শব্দ তাঁর লক্ষ্য নয়, সত্য বলতে তিনি ভগবানকেই বুঝতেন।

রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে তিনি নৈরাজ্যবাদী, কারণ রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বে বা কর্তৃত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। আবার গভীরভাবে ভগবানের বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে এবং আনুষ্ঠানিক হিন্দুত্বে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। মানবীয় উৎকর্ষের মাপকাঠিতে তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ। সারাজীবন অগ্রগতির সাধনা করেছেন। প্রয়োজনে পুরানো বিশ্বাস ও অভ্যাসকে মার্জিত ও সংস্কৃত করে নিয়েছেন। নতুন চিন্তা নতুন ভাবকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন অথচ তাঁর আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা। সত্যাগ্রহী সত্যচ্যুত হবে না তবে তাঁর মনোভাব হবে মুক্ত ; মন নিষ্পত্তির জন্য থাকবে সদা জাগ্রত।

গান্ধীজি স্ববিরোধিতার মধ্যেই বিশ্ব প্রকৃতিকে খুঁজে পেয়েছেন। এ আলোকে মানুষ ও প্রকৃতিকে দেখেছেন ; অন্তহীন সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষের মধ্যে সত্যকে খুঁজতে গিয়ে মানুষকে যেমন অবিষ্কার করেছেন, নিজকেও আবিষ্কার করেছেন সারাজীবন। এ বোধ হতেই তিনি দেখেছেন : 'Inconsistancy is only apparent. It appears so to many friends, because of my responsiveness to varying circumstances. Seeing consistancy may really be seer obstinacy.' তিনি মানুষের ভিতরেই সত্য বা ভগবানকে দেখেছেন। কয়লা ও হীরক মূলত একই জিনিষ কিন্তু একটি আর একটির বিশুদ্ধ রূপান্তরিত মূর্তি। তেমনই সাধারণ

সাংসারিক জীবনযোগের দ্বারা দিব্য জীবনে পরিণত হয়। সেই দিব্য জীবন কিভাবে লাভ করা যায় তাহাই গীতার শিক্ষা। এ শিক্ষাই গান্ধীজি পেয়েছেন।

জীবন-মন্থন-ধন

গান্ধীজি বলেছেন, 'বিধাতা ও বিধান অভিন্ন। আমি বিধান অথবা বিধাতাকে অস্বীকার করতে পারি না, কারণ এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অতি সামান্য। কোন পার্থিব অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার অস্বীকৃতি বা অজ্ঞতায় যেমন আমার কোন লাভ নেই, তেমনি ভগবান বা তাঁর বিধানকে অস্বীকার করলেও তাঁর ক্রিয়ার প্রভাব হতে আমি মুক্ত হতে পাচ্ছি না। অথচ পার্থিব নিয়ম মেনে চললে যেমন সহজতর হয়, ঠিক তেমনি ঐশ্বরিক শক্তিকে দীনভাবে নীরবে মেনে চললে জীবনযাত্রা সহজতর হয়ে আসে। আমার চারদিকে সব কিছুই চির পরিবর্তনশীল ও চির নশ্বর। পরিবর্তনশীল সব কিছুর ভিতরেই এমন এক চৈতন্য রয়েছে, যার পরিবর্তন নেই, যা সব কিছুকে একত্রে ধারণ করে আছে, যা সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত করে এবং পুনরায় সৃষ্টি করে। আমি এ চৈতন্য শক্তির অস্পষ্ট আভাস পাই। এই শক্তি অথবা আত্মাই ভগবান এবং আমি যা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তার কিছুই চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না, বা থাকবে না— একমাত্র তিনিই থাকেন।' এটাই তাঁর জীবন দর্শন। তিনি সবকিছু আগে নিজের উপর প্রয়োগ করে পরে মানুষের কাছে উপস্থিত করেছেন। ইহাই জীবন-মন্থন-ধন। এ ধন তিনি মানবজাতিকে দিয়ে গিয়েছেন। এর মূল্য যে কোন রাজনৈতিক মতবাদের বহু-বহু উর্ধ্বে।

গান্ধীজি এ সত্তাকেই সত্য বলেছেন। আর উপনিষদ যে চৌদ্দ ভুবনের কথা বলেছেন তা হল—সত্য (সৎ), তপ (চিৎ), মহ (আনন্দ), জন (প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞান), স্বঃ (মন), ভুবঃ (প্রাণ), ভূঃ (দেহ)। তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বে নামেন আবার স্বস্বরূপে পৌঁছবার জন্যই এই নিবর্তন থেকে বিবর্তনে জীব হয়ে এই সপ্তলোকে পৌঁছবার সাধনা করেন। দিতি হতে অদিতির স্তরে পৌঁছেন, তাই তো জীবন; সেই তো সব জীবেরই নিয়তি। তাকে এ চতুর্দশ ভুবনে পরিক্রমা করতেই হবে। স্বেচ্ছা অস্বেচ্ছার প্রশ্ন নেই, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নেই।

এ জন্যই তো গান্ধীজি বলেছেন………'বৈজ্ঞানিকরা আমাদের বলেন যে, আমাদের এ জগত যে সমস্ত পরমাণু দিয়ে গড়া তাদের মধ্যে সংশক্তি বা সংযোজনী শক্তি বর্তমান না থাকলে এ পৃথিবী শত খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো এবং আমাদের অস্তিত্বই থাকতো না। অচেতন জড় পদার্থের মাঝে যেমন সংযোজনী শক্তি আছে, সমস্ত সংচেতন পদার্থের ভিতরও ঠিক তেমনি সংযোজন শক্তি নিশ্চয়ই রয়েছে এবং প্রাণীদের ভিতর বর্তমান এ সংযোজনী শক্তির নামই প্রেম। আমরা এ প্রেমকে পিতা ও পুত্রের মধ্যে, ভাই ও বোনের ভিতর এবং বন্ধু ও অপর বন্ধুর মাঝে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রাণীক্ষেত্রের মধ্যেই এ শক্তি প্রয়োগ করতে আমাদের শিক্ষা করতে হবে এবং এর প্রয়োগের ভিতরই ভগবৎ জ্ঞান রয়েছে। যেখানে প্রেম সেখানেই জীবন, ঘৃণার পরিণাম ধ্বংস।'

তিনি আরও বলেছেন, 'আমি দেখেছি ধ্বংসের মাঝেই জীবনের অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং ধ্বংসের বিধান অপেক্ষাও একটা শ্রেষ্ঠতর বিধান অবশ্যই আছে। এরূপ বিধানের অধীনেই সুশৃঙ্খল সমাজ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে এবং জীবন হতে পারে উপভোগ্য'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা যদি ভগবানের প্রতিরূপ হিসাবে সৃষ্ট হয়ে থাকি তা হলে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির কল্যাণ নয়, বন্ধুর কল্যাণও নয়, সকলের কল্যাণ সাধনের জন্যই আমরা সৃষ্ট হয়েছি।'

মহাত্মাজির ভাবগুরু স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন: 'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধন সম্পত্তি নশ্বর, নাম ও যশও নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়; বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী'। তাই তিনি বলিয়াছেন, "মানুষের মহত্ব মননশীল জীব বলে; পশুদের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করতে হবে। এইজন্যই আমি যুক্তি বিশ্বাস করি, যুক্তি অনুসরণ করি'। স্বামীজি আবার জানিয়েছেন: 'প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটি নক্ষত্র স্বরূপ, আর এই নক্ষত্ররাশি ঈশ্বর স্বরূপ, তিনি অনন্ত নির্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত। এই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ। তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ। প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্বই তিনি।'

মাতৃ-এষণার পরিপূর্ণ রূপ

সত্যবান বা পরমহংস অবস্থাই আত্মিক উৎকর্ষের চরম পরিণতি। আত্মিক উৎকর্ষ মাতৃ-এষণারই পরিপূর্ণরূপ। ইহাই বেদের মোক্ষ, উপনিষদের বিজ্ঞানময় কোষ, তন্ত্রের দ্বিষোজহি, মন তত্ত্বে ইয়ুং-এর বিশ্লেষণ। আর গান্ধীর রামরাজ্যের বস্তু। মানুষ সত্য ও অহিংসার পথে এগোবে। সে বিবর্তনের পথে যেমন তৃণ গুল্ম হতে মানুষে পৌচেছে, তেমনিভাবে তার সত্য নিত্যের সঙ্গে। তাঁর অহিংস প্রচলিত সংস্কারের আচরণ নয়। অপরের সমান অধিকারে শ্রদ্ধা রেখে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র কর্মাধিকার ; এ হল তার বাস্তব নিরপেক্ষ অর্থ। এক হিসেবে এটাই বাকুনিন এবং ক্রোপটকিনের প্রচারিত নৈরাজ্যবাদ দর্শন। গান্ধীজির 'হিন্দ স্বরাজ'এ যে চিন্তাধারার প্রকাশ মিলে, তা কিন্তু পাশ্চাত্যের নৈরাজ্য-দর্শনের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এজন্যই গান্ধীজির বাণী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে প্রেরণা এনেছিল, আর ইউরোপের এনার্কিজম শুধু বাচনিক, আনুমানিক দর্শনের পর্যায়েই পড়ে রয়েছে। গান্ধীজির সত্য বা ঈশ্বরে বিশ্বাস—গীতার বাণীতে তাঁর ধারণা গভীরে পৌছেই তিনি বুঝেছেন, মানুষ ঐশ্বরিক লীলার সাধন যন্ত্র।

পাশ্চাত্যের নৈরাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষকে ব্যক্তি বলেই গ্রহণ করা হয়েছে, আর গান্ধীজির বিশ্বাস মানবাত্মায়। এ আত্মা অবিনশ্বর পরমাত্মার অক্ষয় প্রকাশ। তিনি মনে করেন মানুষের ব্যবহারিক সার্থকতার অথবা অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর তার যোগ্যতা নির্ভর করে না। তিনি মানুষের সুখ শান্তি আনন্দ স্বাধীন জীবন যাপনে ব্যক্তির অক্ষুণ্ণ স্বাধিকারেই দৃঢ় বিশ্বাসী। অবিনাশী মানবাত্মা স্বাধীন জীবনায়নের মাধ্যমে পূর্ণতম পরিণতি লাভ করবে, আর তার এ পথে সমাজের বা রাষ্ট্রের বাহ্য অনুশাসন থাকবে না ; মানুষের এ প্রকাশ ও বিকাশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন ব্যবস্থা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না এবং তার আত্ম-বিকাশও এদের উপর নির্ভরশীল হবে না। রাষ্ট্রীয় হুকুমে আজ্ঞাবহ মানুষ সৃষ্টি হয়, সে মানুষের কাছ হতে বড় কিছু প্রত্যাশা বৃথা। মহৎ জীবনে চরিত্র প্রভাব ও নানা গুণের সমাবেশ হয়। সে মানুষ রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহই হয় না, রাষ্ট্রকে বহনও করে। দল ভেঙে যায়, দল থাকে না, কিন্তু মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত বহু যুগ ধরে মানুষের প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। তাই গান্ধী জীবন বহু কাল আলোর দিশারী হয়ে মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মহৎ জীবনের মধ্য দিয়েই ভগবানের আপন

রূপের প্রকাশ হয়। কবিগুরু বলেছেন: 'যিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়ম বদ্ধ হন না। তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে তা যদি না থাকে, তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারেনা। তবে উন্মত্ততার তাণ্ডব নৃত্যে কোন কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকত না।'

গান্ধীজি কর্মযোগের মাধ্যমে সত্য ও অহিংসাকে আয়ত্ত করে আত্মার চরম বিকাশে পরমাত্মার সান্নিধ্য চেয়েছেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতি ধর্মাত্মক বা আধ্যাত্মিক কর্মযোগেরই বাস্তব আয়তি। তাঁর চোখে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি বড় নহে, মানুষই বড়। এ বিশ্বাসই তাঁকে অস্পৃশ্যতা সমাধানে টেনে এনেছে। মানবাত্মার মূল্য বা মর্যাদা অস্বীকার, মুসলমান তথা সংখ্যালঘু মানুষের অসহায়, কৃপাধীন ও আপদগ্রস্ত অবস্থা তাঁকে বেদনার্ত করেছে। তাই 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম'—ভজনই তাঁর পরম প্রিয় সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের 'পতিতপাবনের' উপরেই তাঁর ঝোঁকটা গিয়ে পড়েছে এবং এই মানসস্বাধীনতায় গভীরতম অবস্থার প্রতিফলনস্বরূপ তাঁর চরম আত্মদান। বিবর্তনের পথে মানুষ তার পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে—মানবসভ্যতার ইতিহাসের এই রূপই গান্ধীজির এ আত্মাহুতি আমাদের আবার জানিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিগত অধিকারকে সমাজ বা রাষ্ট্র রক্ষা না করলে বা সঙ্কুচিত করতে এলে সমাজ, রাষ্ট্র ব্যক্তির কাছে অবিচলিত আনুগত্য দাবী করতে পারে না—এটাই তাঁর জীবনে বাণীময় হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজি বাংলা ভাষায় মানুষের জন্য যে বাণী রেখে গিয়েছেন, সে বাণী—'আমার জীবনই আমার বাণী',—তাঁর সমগ্র জীবনের পরিচিতি। ব্যক্তিগত জীবনে জীবন্ত সত্যের প্রকাশই হল গান্ধীজির শক্তি-রহস্য। অপরকে তিনি যা করতে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি নিজেও তাই করেছেন। তাই তো বলেছেন, "I teach what is ancient and I try to practice what I preach. I clam that what I practice is capable of being practised by all because I am a very ordinary mortal, open to the same temptations as the least among us." গান্ধীজির এ কথা অসঙ্কোচে মেনে নেওয়া খুব শক্ত। নিজের জীবনের দিব্য আদর্শ দেখিয়ে মানুষকে ভগবানের দিকে, ভাগবত-জীবনের দিকে আকৃষ্ট করাই

মা—৮

অবতারের উদ্দেশ্য। জগতে অবতারই ভগবানের প্রতিনিধি। অবতারকে দেখেই ভগবানকে জানা যায়। অবতারের শরণাপন্ন হওয়াই ভগবানকে উপলব্ধি করবার উপায়। ভগবান মানুষকে যে পথে নিয়ে যেতে চান, অবতাররূপে নিজে এসেই তিনি সে পথ দেখিয়ে দেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী আজ মুমূর্ষু। সঙ্ঘর্ষ-পীড়িত, বিদ্বেষ-ছিন্ন, সত্যভ্রষ্ট, ক্ষিপ্ত ব্যর্থ মানুষের কাছে গান্ধীজি শান্তি ও শক্তির বাণী রেখে গিয়েছেন। দুঃখী মানুষের তিনি নিত্যসঙ্গী, সবার উপর মানুষ সত্য বলে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বলেই তো তিনি মহাবিপ্লবী, মহাযোগী, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাত্মা। আত্মার চরম বিকাশে পরমাত্মার সাথে লয়ের জন্য কর্ম ও জ্ঞানযোগের সাধনা করেছেন বলেই তো তাঁর আত্মা মহান। তাই তাঁর অহিংসা-মন্ত্র ও বীর্যময় প্রেমের বাণী মানবসভ্যতার ইতিহাসের ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যশালী করে রাখবে চিরকাল। তাপ পারমাণবিক যুগের মানুষ এবং তার সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে—সম্পূর্ণভাবে গান্ধীপ্রদর্শিত—সত্য, অহিংসা তথা প্রেম ও মৈত্রীর পথে। বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞার এ স্বরূপ উপলব্ধি এসেছে মহাত্মাজির মধ্যে।

শোষণ-মুক্ত সমাজের রূপ

জীবদেহে বাঁচবার তাগিদ—প্রাণৈষণা (Struggle instinct), দেহকে পুষ্ট করবার তাগিদ—অন্নেষণা (Nutrition instinct), পুনঃ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা—যৌনএষণা (Sexual instinct) এবং আত্মজনের প্রতি মমত্ববোধ—মাতৃ-এষণা (Maternal instinct) যেমন রয়েছে, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতার দেহেও এই প্রবৃত্তিগুলি রয়েছে। এই প্রবৃত্তিগুলি যে পথ ধরে চলে, সে পথের পরিচয় জানা থাকলে পথিকের সামনে কোন সংশয়, বিভ্রান্তি বা বিপর্যয়ের কারণ থাকে না, কারণ পথিক তার নিজস্ব পথে নিজস্ব গতিতে চলতে পারে। নদী বা সমুদ্রের যেমন স্রোতের বাঁক বা পাক আছে এবং স্রোতের অনুকূলে চললে যেমন কোন বেগ পেতে হয় না, আবার প্রতিকূলে চললে যেমন কষ্ট বা ঝঞ্ঝাটের সীমা থাকে না, তেমনি জীব বা জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতাও যদি তার সুরের স্রোতে চলে, তবে তার জীবন পুষ্ট হয়ে উঠে, আবার প্রতিকূলতায় সঙ্গে চললে তাতে তেমনি আঘাতে আঘাতে ধ্বংস এসে পড়ে। সমতলভূমি কেটে আর পাহাড় কেটে পথ করার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। পারমাণবিক যুগের আজকের ভীত, পীড়িত পৃথিবী, মানবতা, রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি নিরাপত্তার সন্ধানে আত্মজনের কাছে আশ্রয় চাইছে এবং তাই মাতৃ-এষণার কাছে এসেছে।

ভারতের মুক্তিদাতা মহাত্মা গান্ধী এই মাতৃ-এষণার ভূমিতে দাঁড়িয়ে জাতির মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তিনি চরখাকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ কর্মতালিকা প্রস্তুত করেছিলেন এবং সেই অষ্টাদশ কর্মতালিকাকে চরখা-সূর্যের চতুর্দিকের তারকা বলেছেন। মানবতাবাদের আদর্শের ভিত্তিতেই গান্ধীজি এই কর্মতালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। চরখা শুধু বিকেন্দ্রীয় (Decentralised) অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই বা মানুষের সৃজনী-শক্তির বিকাশেরই প্রতীক নহে, উহা মনুষ্যত্ব আয়ত্তের জন্য যে শান্ত, সুস্থ মনের আবশ্যক, তারও প্রতীক। তাঁর অষ্টাদশ কর্মতালিকা মানুষের প্রতি মানুষের গভীর মমত্বই ফুটে উঠে। তাঁর এই কর্মতালিকার বিকাশ এবং মাতৃ-এষণার দিক হতে বিচার-বিশ্লেষণ করলেই এই প্রবৃত্তির গতি অনুযায়ী গতিপথ বা

কর্মতালিকা পাওয়া যায়। গান্ধীজি বস্তুতান্ত্রিকতাকে (Materialism) অস্বীকার করেন না, তিনি উহাকে আধ্যাত্মিকতার (Spiritualism) সহিত সামঞ্জস্য করে মানবতাবাদ উপস্থিত করেছেন এবং ইহারই ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতি প্রণয়ন করেছেন। মানবতাবাদের (Humanism) মূল কথা—মানুষই শ্রেষ্ঠ ও মহান ; মানুষের মনুষ্য-বৃত্তির উন্মেষ ও উৎকর্ষের প্রয়োজনেই সকল কিছু চলবে। মানুষকে ছোট করে, মানুষকে নির্যাতন করে, মানুষকে ধ্বংস করে কোন কিছুই আয়ত্ত করা হবে না। গান্ধীজি মানব-মুক্তির জন্য মানবতাবাদের ভিত্তিতে যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তা গানের সুরের মত, নৃত্যের ছন্দের মত তালে তালে চলে আলো বা প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়।

গান্ধীজি মাতৃ-এষণার তাগিদ হতেই সত্য ও অহিংসার পথে সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা এনে মানব-মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমরা মাতৃ-এষণার তাগিদ হতে সৃষ্ট মানবতাবাদের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক দিক আলোচনায় এর গতি-প্রকৃতি উল্লেখ করেছি। এই মানবতাবাদের আদর্শে সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে উহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনের গতি কোন্ দিকে, তাহাও দেখিয়েছি। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নহে, উহা সমন্বয়মূলক। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, সামাজিক সাম্য ও অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে বানচাল করে, সমাজে হিংস্র মনোভাব সৃষ্টি করে মানুষের সুখ, শান্তি, আনন্দ নষ্ট করে দেয়। গান্ধীজি ব্যক্তিকে অন্যের উপর নির্ভর না করতে অর্থাৎ স্বাবলম্বী হয়ে স্বরাজ অর্জন করতে বলেছেন। ব্যক্তির স্বরাজের পর গ্রামকে যথাসম্ভব স্বয়ম্ভর করে গ্রাম স্বরাজ করেছেন, তারপর জেলা, প্রদেশ ও দেশের স্বরাজ চেয়েছেন। তিনি কোন অবস্থাতে অপরের উপর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে তার দাসে পরিণত হবে, তা চাননি। এভাবে ব্যক্তি সমাজ তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করবে।

প্রাণৈষণারই বিকাশ—ফরাসী বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যন্ত্র-দানবের আবির্ভাব মানুষের যেমন বিরাট অকল্যাণ করেছে, তেমনি কিছু কল্যাণও এনেছে। যন্ত্রযুগ, পুঁজিপতি বা ধনিক সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রের ক্ষুধা মিটাবার

জন্য কুটীরশিল্প ধ্বংস করে, শান্ত পল্লী জীবনকে আঘাত করে, বিকৃত বা উন্মত্ত জীবনের আমদানী করা হয়েছে। 'We are destroying the matchless living machines i e. our own bodies by leaving them to rust and trying to substitute lifeless machinery for them', বলেছেন গান্ধীজি। যন্ত্রের আবির্ভাব মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে। দুর্বল রাষ্ট্রকে আঘাত করে পদানত করা হয়েছে এবং উহা কাঁচা মাল সরবরাহের দেশে পরিণত করা হয়েছে। এত বড় বিরাট অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণ-ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। ঘটনাচক্রে বিজ্ঞানের এই দান আজ সমাজ-জীবনকে পরিচালিত করছে। উহা যদি রাষ্ট্রের ঘাড়ে এসে বসে, তবে রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি নিজ হাতে রাখতে চাহে। রাষ্ট্রীয় শক্তি যারা হাতে রাখে, ক্ষমতা মত্ততা (Power intoxication) তাদের পেয়ে বসে। এই কেন্দ্রাভিমুখী ক্ষমতার পিছনে মানবসমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার বিকাশের সুযোগ আছে। এই মানসিক আঘাতে এই অবজ্ঞাত ও অশ্রদ্ধেয় জনশক্তি মনোবল হারিয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়, বিকাশের সুযোগ হারায়।

মানবতাবাদ এরই প্রতিবাদ। তাই বিকাশের এই দানকে অর্থাৎ মূল শিল্পকে (Basic industry) জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে রাখতে চায়, কিন্তু জনগণ যাতে সম্পূর্ণভাবে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে দাস জাতিতে পরিণত না হয়, সেজন্য জনগণের হাতে কুটীর শিল্পকে রাখতে বলা হয়েছে। এতে সরকারকেও জনগণের উপর এবং জনগণকেও সরকারের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। যেখানে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়, সেখানে জুলুম হতে পারে না; জুলুম না হলেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ থাকে। গান্ধীজি প্রবর্তিত এই মানবতাবাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সামঞ্জস্য এবং প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সমন্বয়ের কথা বলেছে। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানেই মনে উত্তেজনা বা বিকৃতি আসে, সেখানেই বিরোধ ও বিদ্বেষ গজিয়ে উঠে, কিন্তু যেখানে সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করবার কথা থাকে, সেখানে প্রশান্তি আসে। প্রশান্তিই আনন্দ এবং আনন্দ থাকলেই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রশান্তিতেই প্রসারতা আসে, প্রসারতাই জীবন এবং সঙ্কোচই ধ্বংস বা মৃত্যু।

....'Political self-government—that is self-government

for a large number of men and women is no better than individual self-government, and therefore it is to be attained by precisely the same means that are required for individual self-government' একেই গান্ধীজি জনগণের সরকার বলতে চেয়েছিলেন। তিনি মানুষকে এবং তার সমাজ, রাষ্ট্রকে সর্বদিক হতে পর-নির্ভরতা হতে মুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। গান্ধীজি মানুষকে শুধু স্বাবলম্বী বা স্বয়ম্ভর করেই তুলতে চাননি, মানুষকে নতুন পথের অগ্রণী হবার প্রেরণাও দিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি যখন তার সীমাহীন সম্ভাবনার স্বপ্নসৌধ রচনা করে বারবার দায়িত্ব এড়াতে চায় এবং কোন অবস্থারই সামনে যেতে চায় না, তখন ব্যক্তির বা সমাজজীবনে মহৎ সৃষ্টির সম্ভাবনা শূন্যে মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন দেখার বিশ্বাসের জোরও শিথিল হতে বাধ্য। এ স্বাপ্নিকরা পরাশ্রয়ী, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরগাছা। পরগাছা বিশাল গাছের মৃত্যু ডেকে আনে। তাই তিনি স্বয়ম্ভরতার উপর জোর দিয়েছেন এবং ব্যক্তি স্বরাজ বা স্বরাজ্যই চেয়েছেন।

সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা

মানবতাবাদ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা কিংবা সম্পদের তীব্র অভাবের অবস্থায় থাকা সমর্থন করে না, কেননা, এই অবস্থা অকল্যাণ আনে, মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথরোধ করে। সম্পদশালী সম্পদ সংগ্রহে ও রক্ষায় মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলে। আবার যে সম্পদহীন, সে অভাবে-অনটনে মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পায় না। সুতরাং নৈতিক প্রয়োজনের (Moral requirement) কম এবং অতিরিক্ত অবস্থায় থাকা মানবতাবাদ সমর্থন করে না; তবে এই সমাজ-ব্যবস্থায় সম্পদশালীকে সম্পদের মালিকানার পরিবর্তে সম্পদের ন্যাসরক্ষক (Trusteeship) বলে মনে করতে বলা হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা উদ্যোগকে বন্ধ করা হয় না, তবে অতিরিক্ত সম্পদ, পুঞ্জীভূত করবার অধিকার বা ভোগ করবার অধিকার না দিয়ে এদের ন্যাসরক্ষক করা হলে অকল্যাণ আসে না। (গান্ধীজি সকল প্রকারের যন্ত্রের বিরোধী কিনা এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন: 'My answer is emphatically—'No'. But I am against its indiscriminate multiplication. I refuse to be dazzaled by the seeming triumph of machinery. But simple tools

and such machines as save individual labour and lighter the burden of the millions of cottages, I should welcome.')

মানুষের মৌলিক দাবী

মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা মৌলিক দাবী। প্রত্যেক মানুষকে এই ব্যবস্থা করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইহা মনুষ্য ধর্মের যেমন মৌলিক দাবী, তেমনি রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি বা মানবতাকেও এই দাবী পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এই দাবী পূরণের প্রচেষ্টায় মানুষ সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র বা মানবতা কোন অবস্থাতেই মানুষের বিকাশের পথকে রোধ করে এই দাবী পূরণ করবে না। মানুষ পরিশ্রম করে তার জীবনধারণোপযোগী ব্যবস্থা করবে। শ্রম না করে কোন কিছু গ্রহণ করলে জীবন ধারণের অধিকার আসে না। অন্ন শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধ অন্ন উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নহে। মানুষের খাদ্যের বা আহার্যের প্রয়োজন; কোন্ খাদ্য তার দেহ ও মনকে পুষ্ট করে তাহা দেখতেই হবে। কিন্তু এমনভাবে খাদ্যসংগ্রহ বা গ্রহণ করবে, যাতে অন্যকে বঞ্চিত করা না হয়; কারণ বঞ্চিতকে সামনে রেখে যে খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তা মানুষের কল্যাণ আনে না। তদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষার দিক হতে খাদ্য ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে মানুষের মনে দৈন্য এসে মানুষকে জীর্ণ করে তোলে। মানুষের পরিধেয় প্রয়োজন। দেশকালানুযায়ী পোষাক গ্রহণ করতে হবে। যে পোষাক মানুষের মনে বিকৃতি আনে বা দাম্ভিকতা সৃষ্টি করে মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী হয়, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। মহাত্মা গান্ধী নিজ হাতে কাটা সূতার বস্ত্র অর্থাৎ খদ্দর ব্যবহার করবার জন্য বলেছেন। উহার মধ্যে সরল অনাড়ম্বতা কিম্বা আত্মশক্তি জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা ব্যতীতও ধন পুঞ্জীভূত করার ব্যবস্থার প্রতিবাদ আছে। মিলজাত বস্ত্র শুধু একশ্রেণীর লোকের ধন-সম্পদই পুঞ্জীভূত করতে সাহায্য করে না, যান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকেও তার মনুষ্যত্ব বিনাশেও সাহায্য করে। যন্ত্র সজীব মানুষ তৈরী করে না।

মানুষের আশ্রয় চাই। চাই এমন একটা শান্ত নীড়—যেখানে শান্ত আবহাওয়ায় মনকে করবে স্থির, অচঞ্চল, প্রাণকে করবে রসাল। মানুষের

জীবনে আশ্রয়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীরভাবে হয়। যেখানে প্রকৃতির লীলা চলতে থাকে, যেখানে মানুষের চোখের সামনে সৃষ্টি-জগৎ অবাধে চলছে, কোন প্রকারের কৃত্রিমতার মধ্যে জীবন গড়ছে না—সেখানে প্রাণশক্তি হয়ে উঠে দুর্বার। সেখানে মানুষের মন হয় সরল, সাবলীল। সেখানে মনুষ্যত্বের হয় উদ্বোধন। তাই বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, জলাশয়, পাহাড়ের ধারে নীলাকাশের নীচে যেখানে প্রকৃতি তার নৃত্যলীলা দেখিয়ে চলেছে, সেখানেই হবে মানুষের বাসের প্রকৃত স্থান। এমন স্থানে অনাড়ম্বর কুটীর, সাজান ঘর ও বাগানের মধ্যেই মানুষ গড়ে উঠবে। কৃত্রিমতা ও ঘিঞ্জির মধ্যে যে মানুষের জীবন গড়ে উঠে, সে মানুষকে মনুষ্যত্ব আয়ত্ত করতে কঠোর সাধনা করতে হয়। তাই আশ্রয়ের জন্য পল্লী ও গৃহের সুপরিকল্পনা চাই। পুষ্টিকর খাদ্য, আবশ্যক পরিধেয় এবং মনোরম আশ্রয়ের পরই চাই সুন্দর স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষার পরিবেশও নির্ভর করে এই পুষ্টিকর খাদ্য, আবশ্যক পরিধেয় এবং মনোরম আশ্রয়স্থলের উপর ; কিন্তু মানসিক বিকৃতি ও অজ্ঞানতাও আমাদের পীড়ার অন্যতম কারণ। যাই হোক, রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মৌলিক দাবীও আছে। রোগ প্রতিরোধের যেমন ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি বা মানবতার উপরও এই দায়িত্ব রয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যনিবাস, চিকিৎসালয়, মাতৃসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বা সমবায় ভিত্তিতে চিকিৎসা করতে হবে। দেশ-কাল-অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে চিকিৎসাপদ্ধতি কল্যাণকর তাকে উৎসাহ দিতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির দাবীও মৌলিক দাবী।

খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয় ও চিকিৎসায় প্রাণৈষণা ও অন্নৈষণারই তাগিদ আছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি যৌন-এষণারই বিকাশ। যৌন-এষণা অত্যন্ত বেগবতী। এই শক্তিশালী প্রবৃত্তি যখন ধ্বংসাত্মক রূপ গ্রহণ করে, তখন ব্যক্তির জীবনে যেমন উহা মানুষের জন্য গ্লানি, দুঃখ, অকল্যাণ আনে ; রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি, মানবতার জীবনেও উহা বিরাট অকল্যাণ আনে। ওদের জীবন বা দেহকে বিষাক্ত করে গ্লানিতে ভরে দেয়, ধ্বংসও আনে। কিন্তু যখন উহা সৃষ্টিমুখী হয়, বিকাশমুখী যৌন-এষণার শক্তি মানুষের মহাকল্যাণ করে থাকে। শিক্ষা আমাদের বন্য মনকে সংস্কার করে সংস্কৃত করে ; আমাদের ভবিষ্যৎ বর্তমান জানতে সাহায্য করে। বহুর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলবার পথের সন্ধান দেয়। আমরা কি এবং আমাদের গতি কোন্ দিকে, মানুষরূপে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আত্ম

পরিচয় জানবার পথের নির্দেশ দেয়। উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তা ব্রিটিশ আমলের কেরানী শিক্ষাপ্রণালী এবং একটা জাতিকে পরাধীন রাখবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। উহা আজকের শক্তি উন্মুক্ত স্বাধীনতার পরিবেশে শিশুমনে বা জাতিদেহে বিষক্রিয়া করছে; বিশেষতঃ—এই শিক্ষা-ব্যবস্থার অগভীরতা সমাজে বিকৃতি এনেছে। ভারতের বহু যুগের তপস্যার সম্পদ—সেই সুগভীর সংস্কৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাও আমাদের জাতির পক্ষে কল্যাণকর। কেননা, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাস্তবতার সহিত সম্পর্ক রাখবার ফলে ও উৎপাদন ভিত্তিক বলে শিশুমনেই আত্মবিকাশের, আত্মবিশ্বাসের এবং কর্মের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। তবে বর্তমানের ন্যায় বিকৃত পরিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে গুরুর সান্নিধ্যে গুরুকুল বা আশ্রম পরিবেশে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। তাতে শিশুমনে জ্ঞানের গভীরতা আসে, পরিবেশ ও ব্যক্তির সান্নিধ্যে এবং আত্মোৎকর্ষের চেষ্টায় ব্রতী গুরুর সংস্পর্শে শিশুও উৎকর্ষ লাভ করে, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়।

এ ছাড়া আমাদের দেশের ও মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রামায়ণ, মহাভারত, জাতক এবং ত্রিপিটক, কোরান, আবেস্তা বাইবেল, গ্রন্থসাহেব, বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতির প্রচার-ব্যবস্থা করা দরকার। এদের ভিত্তির উপর যে রামায়ণী গান, নাটক, যাত্রা, কবি, তরজা, কথকতা, কৃষ্ণলীলা, সংকীর্তন প্রভৃতি আছে, তার দ্বারা মানুষের মধ্যে উন্নত জীবনের প্রচার-ব্যবস্থা করতে হবে। মহাভারত ভারতের হিমালয়েরই মত; হিমালয় হতে যেমন নদীনালা বের হয়ে সমগ্র ভারতকে উর্বর করে শস্যশালী করেছে, এমনি মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী ভারতের জনগণের মানসলোককে যুগ যুগ ধরে বলিষ্ঠ করেছে। আজও মহাভারতের প্রয়োজনীয়তা আছে। গান্ধীজি বলেছেন যে, গীতা মায়ের মত। জীবনের প্রতি সঙ্কটকালে গীতাই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। তিনি গীতার সঙ্গ করবার জন্য সারা জীবন বলে গেছেন। গ্রন্থালয় প্রভৃতি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠন করতে হবে। ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে, বস্তী বা গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন

করে এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা, সামাজিক ও গণ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মারফৎ মানুষের উন্নত জীবন বা নৈতিক জীবন এবং স্বদেশ-প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করে জীবনকে পুষ্পিত ও সৌরভপূর্ণ করে তুলতে হবে।

অর্থনৈতিক সাম্য-ব্যবস্থা

মানুষ ও সমাজ বা মানবতার প্রাথমিক দাবীর তো পূরণ করতেই হবে। এ ছাড়া অবস্থাভেদে যে সকল বিশেষ দাবী বা সমস্যা উপস্থিত হয়, তারও সমাধান করতে হবে। "My ideal is equal distribution, but so far as I can see it, it is not to be realized, I therefore work for equitable distribution". ইহাই গান্ধীজির লক্ষ্য। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে ধনী বা নির্ধন থাকবে না। ব্যক্তির প্রচেষ্টা বা বিকাশের চেষ্টাকেও বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু মানবতাবাদ ধনতন্ত্রবাদের আদর্শের বিরোধী বলে অর্থের প্রয়োজন স্বীকার করলেও তাকে চরম বলে গ্রহণ করে না। সুতরাং ব্যক্তির বিকাশের বা প্রকাশের পথে যদি কোথায়ও অর্থ-সম্পদ আসতে থাকে, সেখানে সেই ব্যক্তি নৈতিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ন্যাসরক্ষক মাত্র। সৌন্দর্যের সহিত পৌরুষের যে সম্বন্ধ আছে, তাকে সুসমঞ্জস রাখতে হলে 'ন্যাসরক্ষা'ই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

মানবতার বিকাশ লক্ষ্য বলেই তিনি সম্পদের প্রতি মমত্ববোধ সম্পন্ন হবেন না। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে কেহ নির্ধন থাকতে পারে না। রাষ্ট্র বা সমাজকে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ নির্ধন ব্যক্তি সমাজের বিকাশের বাধাস্বরূপ। তার নৈতিক প্রয়োজনীয়তা মিটাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। গান্ধীজি বলছেন: "I do not draw sharp or any distinction between economics and ethics." তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে নীতিবোধকে সজাগ করে তুলতে চেয়েছেন। জগতের তথা মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রাচীন ও বর্তমান ধ্যান ধারণার সামঞ্জস্য করে গান্ধীজি পথ নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তি তার নির্দিষ্টস্থানে নিযুক্ত থেকে কর্তব্য সমাপ্ত করবার মত আত্মসংযমের ক্ষমতা লাভ করবে। জীবনকে ফাঁকি দিয়ে নিজে প্রতারিত হবে না। ব্যক্তি নিজে

যেমন প্রতারিত হবে না, অপরকেও প্রতারণা করবে না। ন্যায় অন্যায় বোধ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে হবে। দায়িত্ব এড়িয়ে চললে জীবন হতে ফসল তোলা যায় না। অবশ্য প্রয়োজনের স্বল্পতাই ঐশ্বর্যের প্রকৃত পরিমাপ।

শ্রমিক-সমস্যা

মৌলিক বা মূল শিল্পের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কারখানা গড়ে উঠবে। গান্ধীজি বলছেন: 'The heavy machines for work of public utility, which can not be undertaken by human labour has its inevitable place, but all that would be owned by the state and used entirely for the benefit of the people.' শিল্পোন্নয়নের প্রথম ধাপে বর্তমানের ভোগ সঙ্কুচিত করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়। কারণ শিল্পের প্রসার সঙ্কুচিত হয়ে গেলে শ্রমিকের তথা দেশের উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য। শিল্প সংস্থা রাষ্ট্রের এবং জনগণের কল্যাণের জন্যই তার প্রতিষ্ঠা। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বিশেষের নহে। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে—শ্রম হচ্ছে গোটা দেশ তথা মানবজাতির দায়িত্ব। কোন কোন লোক তার খাটুনির বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়, তখন তা হয়ে পড়ে সমগ্র মানবজাতির উপর এক চিরন্তন অভিশাপ। কারখানার এক উন্মত্ত পরিবেশে কাজ করে বলে শ্রমিকদের বিকৃতি আসবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের জন্য নৈতিক প্রয়োজনীয় 'পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতেই হবে এবং তারা যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠে বা উত্তেজনাপূর্ণ কাজের পর শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে পরিবার-পরিজনের সহিত বসবাস করতে পারে, সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশপূর্ণ পল্লীতে উন্মুক্ত স্থানে বাড়ি তৈরি করতে হবে।

কারখানায় প্রস্তুত সম্পদ সমগ্র দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রের সুতরাং শ্রমিকের নিজেরও—শ্রমিকদের এই দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সম্পদ বৃদ্ধি বা হ্রাসে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র বা শ্রমিকের নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি বা লাভ-লোকসান হবে—তার এই সেবার ও দেশপ্রীতি বোধ আনতে হবে। এ ছাড়া মনুষ্যত্ব উন্মেষই লক্ষ্য বলে দুর্নীতির পথ গ্রহণ করবে না। এদের পল্লী কোন অবস্থাতেই অন্য শ্রেণীর অধিবাসীদের অপেক্ষা আলাদা হবে

না, বরং উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে বলে বৃক্ষলতা, পুষ্পোদ্যান, পুকুর, দীঘি, খাল-বিল, নদনদী বা পাহাড়ের ধারে রাখতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এদের মনকে শান্ত, সুন্দর করে তুলবে।

কুটীরশিল্প

আমাদের দেশে শিল্প-কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমানে (১৯৪৮) পঁচিশ লক্ষ। অবশ্য মূল শিল্পের এবং বড় বড় শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে; এছাড়া কুটীরশিল্পের শিল্পীরা রয়েছে। কুটীর-শিল্পের প্রসারের জন্য ব্যষ্টি বা সমষ্টি কিম্বা সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। জাতির মানসিক সমতা এই কুটীরশিল্পের শিল্পী এবং কৃষকদেরই উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, কুটীরশিল্পের প্রসারের ফলে জনগণের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে অন্যত্র যাবে না এবং নিজ বাড়ীতে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে থাকবার ফলে তাদের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হবে। কুটীরশিল্পের প্রসারের ফলে পিতার বৃত্তি বা ব্যবসা দেখতে অভ্যস্ত সন্তান সহজভাবে তার পিতার ব্যবসাকে গ্রহণ করতে পারবে এবং একটা পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠবে বলে তার মনুষ্যত্বের উন্মেষ হবে। (তাই তো গান্ধীজি বলেছেন : 'I wholeheartedly detest this mad desire to destroy distance and time to increase animal appetites and go to ends of the earth in search of their satisfaction.') বিশেষতঃ, কুটীরশিল্প প্রসার লাভ করলে জনগণ বুনিয়াদী বা মূল শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী সরকারের হাতের মুঠায় না চলে যাওয়ার ফলে জনগণের অধিকার —রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপ অটুট থাকবে এবং জনগণও রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি আগ্রহশীল থাকবে। কুটীরশিল্পকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা মানবতা-বাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং তাহা করা হলে এর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রও নিরাপদ হবে। কারণ, বেকার সমস্যা ব্যাপকভাবে সমাধানে সাহায্য করবে।

কৃষি ও কৃষক-সমস্যা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু দীর্ঘকাল পরাধীনতায় দেশের কৃষির উন্নতি হয় নি। দেশের অভ্যন্তরভাগের নদনদী, নালা, খাল-বিল, জলাশয়গুলি

মানবদেহের স্নায়ু ও নাড়ীর মত। এদের মধ্যে রক্ত-চলাচলের ফলে যেমন দেহ অটুট থাকে ; প্রাণশক্তি থাকে, তেমনি এই নদনদী, নালা, খাল-বিল, জলাশয় মধ্যে জলের চলাচলের ফলে দেশের দেহ সুস্থ থাকে ; দেশ পুষ্ট হয়ে শক্তিশালী হয়। সুদীর্ঘকাল দেশ বিদেশীর পদানত থাকায় বিদেশী তাদের মতলবেই দেশের এই নদনদী, নালা, খাল-বিলগুলিকে মরতে দিয়ে দেশকে অসুস্থ করে, দুর্বল করে এই দেশের জনগণের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়েছে। এই জলাশয়গুলি যেমন শুকিয়েছে, জাতির অন্তরের উৎসও তেমনই শুকিয়েছে। আমাদের দেশের লোক-সংখ্যা বেড়েছে, অথচ ক্রমে ক্রমে জমির উর্বরশক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং অনাবাদী জমির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আজ এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ মানুষকে ভূদাসে পরিণত করে, ধ্বংস না করেই, দেশের কৃষি সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবে। বর্তমান (১৯৪৮) জমিদারী-প্রথা বিদেশী শাসকের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে ; এই প্রথা ও মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপ করে 'লাঙ্গলে যার জমি তার, নীতিতে ভূমিসমস্যার সমাধান করতে হবে। (১৯৪৮ সালের পর জমিদারী প্রথা রদ ও কিছু ভূমিসংস্কার হয়েছে।)

গান্ধীজি জমিগোপালের অর্থাৎ জনগণেরই বলেছেন। আকাশ, বাতাস, আলো ও জলে যেমন মানুষের অবাধ অধিকার রয়েছে, ভূমিতেও মানুষের এই অধিকার স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। কোন কৃত্রিমতায় সেই অধিকার খর্ব করবার চেষ্টা করলে তা মনুষ্যত্বেরই অপমান এবং মানবতাবাদ তাহা সমর্থন করে না। কৃষককে তার প্রয়োজনীয় জমি দেওয়া হবে এবং গরু ও লাঙ্গলের সাহায্যে সে ওর উন্নতির ব্যবস্থা করবে। গো-সম্পদকে রক্ষা, পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে হবে। কৃষক সকল ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য করে তার জীবনকে প্রকৃতির নিয়মে গড়ে তুলবে, তাতে সে রোগমুক্ত থাকবে। তার গরুর গোময় তার জমিকে উর্বর করবে। এছাড়া অন্য সার ব্যবহার করেও জমি উর্বরা করতে হবে। তার গরুর দুধ তার পরিবারকে পুষ্টিদান করবে, আর কৃষক ফসলের সৃষ্টি ও তার আগমনের আনন্দে নিজের জীবনকে মধুময় করে তুলবে। তার কৃষি-ব্যবস্থাকে লাভজনক করতে হবে এবং দালালের খুশির উপর তার ভাগ্য কোনমতেই ফেলে দেওয়া চলবে না। কোন অবস্থাতেই সে জমিগুলি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে সে রাষ্ট্রের বা একশ্রেণীর ক্ষমতা-মাতালের ভূ-দাসেও পরিণত হবে না। গান্ধীজি বলছেন যে, স্বাধীন ভারত ভূমিহীন কোন কৃষককেই ভূমিহীন থাকতে দিবে না।

সমষ্টিগত কৃষি-ব্যবস্থার (Collective farms) ফলে কৃষককে মজুরে পরিণত করে, তাকে সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা হতে বঞ্চিত করা মানবতার প্রতি নির্মমতা। যেখানে বিরাট মাঠ রয়েছে, অথবা প্রচুর অনাবাদী জমি রয়েছে, সেখানেই সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা করা চলতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কৃষককে ভূ-দাসে বা মজুরে পরিণত করে তাকে জীবনের সুখ-শান্তি ও আনন্দ হতে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। কৃষককেই নৈতিক প্রয়োজনীয় ভূমি দিতে হবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সমষ্টিগত কৃষিব্যবস্থার জন্য কৃষক করতে হবে না। জনগণ খেতে পাবে না, অথচ অনাবাদী জমি পড়ে থাকবে, তাও চলবে না। পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে কৃষকের জন্য কুটীর গড়ে তুলতে হবে এবং কৃষক তাদের সন্তানদের গড়বার কিম্বা পরিধেয় অথবা চিকিৎসার সুবিধা অবশ্যই পাবে।

কৃষক এই দেশের মেরুদণ্ড। তাকে উন্নত জীবন হতে বঞ্চিত করা শুধু তার উপর নিষ্ঠুরতাই হবে না, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতিও নিষ্ঠুরতা করা হবে। তাই তার অবস্থার উন্নতির জন্য তাকে দাসে পরিণত করা হলে জাতির সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। কৃষক ও কৃষিসমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখলেই এই দেশের কল্যাণ আসবে। ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা দশভাগ অভাব রয়েছে। ভারতবর্ষকে সুস্থ ও সবল করে তুলবার জন্য অগৌণে এই খাদ্যাভাবের সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষকে করতে হবে। ভারতের কৃষি ও কৃষকের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিলেই এই সমস্যার সমাধান অতি সহজে হতে পারে। কৃষিকে লাভজনক ও কৃষককে সুস্থ করে তোলার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধানের পথ রয়েছে। জাতি যাতে নিঃস্ব হয়ে না পড়ে এবং পররাষ্ট্রের অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল না হয়, সেজন্য খাদ্য সমস্যার সমাধান অবিলম্বেই করতে হবে। এ সমস্যার সমাধানে বেকারত্বও দূর হবে।

আদর্শ পল্লী গঠন

ভারতের দুর্বার প্রাণশক্তির কেন্দ্র ছিল পল্লীতে। এ পল্লীর কৃষিক্ষেত্রে প্রাণরস সঞ্চিত হত, কুটির শিল্প প্রাণময় করত এবং সে শক্তি নানা উৎসব ও আনন্দে পল্লীকে সঞ্জীবিত করত। ব্রিটিশ শাসন সে পল্লীময় ভারতকে একবার উজাড় করে দিয়েছে। গান্ধীজি সে পল্লীময় ভারতে পূর্ণস্বরাজ প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন।

আত্মশক্তির সহায়ে সর্বনিয়ন্তর থেকে জাতিকে মজবুত করে গেঁথে গড়তে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'কঠোর শ্রম, অবিরাম চেষ্টা ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক সামর্থ্যের প্রয়োগের বিনা এ কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। পল্লীর উদ্ধার ও পুনর্গঠন করতে হবে। শহর গড়বার উৎসাহ দেওয়া সঙ্গত নহে, আদর্শ পল্লী গঠনের উৎসাহ দিতে হবে'। শহর গড়বার প্রয়োজনীয়তা আসে রাষ্ট্রের বা সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রাভিমুখী করার মনোবৃত্তি হতে এবং বর্তমান শিল্প-ব্যবস্থার দৌলতে। কিন্তু প্রকৃতির সহিত সম্পর্কহীন অল্প পরিসরে বসবাসকারী এই শহরের বাসিন্দাদের এক অদ্ভুত মানসিকতা গড়ে উঠে। এদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয় ও মনের প্রসারতা শিথিল হয়ে যায়। আদর্শ পল্লীতে বৃক্ষলতা, জলাশয়, খাল-বিল প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখে উন্মুক্ত স্থানে বিস্তৃত ভূমিতে সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে ঘরবাড়ি, মন্দির, পুষ্পোদ্যান, ফলের বাগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উচিত। এই পল্লী জীবনের উপরই জাতির মানসিক বল ও প্রাণশক্তি নির্ভর করে। এই প্রাণশক্তির গতিই জাতি বা রাষ্ট্রের জীবনকে মহানের সন্ধান দেয়।

পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সাধারণতন্ত্র

ভারত-ভূমিতে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর—এই দেশের যে সমাজ-ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও উহা মানুষের জন্য কল্যাণ আনতে পারে। এই দেশেই ঋগ্বেদের ঋষি গেয়েছেন, "সামানোমন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েব ঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।" সমান মন্ত্র, সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট সমিতি একইভাবে প্রণোদিত মন সংযুক্ত হয়ে উদ্দেশ্য লাভের আদর্শ—ভারতবর্ষই বিশ্বের চিত্তভাণ্ডারে দান করেছে। আজকের সাম্যবাদ এই ভারতীয় সাম্যের ঐশ্বর্যের কাছে কত দীন। লুব্ধ মানুষের অসংযত লোভের দাবী মিটাতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশে যে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছে, সাধারণ মানুষের সেখানে স্থান নেই। এ রাক্ষুসে গণতন্ত্র সাধারণকে শাসন ও শোষণ করে মুষ্টিমেয়কে ফাঁপিয়ে তুলেছে। আবার সর্বহারার নাম করে যে সকল দেশে জনগণতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানে চোখ বাঁধা বলদের মত ঘানিতে জুড়ে দিয়ে দলের আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার কষাঘাত করছে। এখানেও কাপালিক বা দানবীয় গণতন্ত্র মানুষকে চাবুক মেরে চালাচ্ছে।

আর এর তুইকে গোঁজামিল দিয়ে কোথায়ও কোথায়ও উচ্ছিষ্ট গণতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে। এ দৃষ্টিহারা গণতন্ত্র লোভী, অপদার্থ, মৃতবিবেক রাজনৈতিকদের ক্রীড়াঙ্গণ হয়েছে। আর সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়েছে।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে মানব-মুক্তির জন্য এই মানবতাবাদের ভিত্তিতে তার সমাজ, রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালন করেছে। এরই ভিত্তিতে দেশে নদীর সমুদ্র যাত্রার মত পঞ্চায়েৎ-ব্যবস্থা গড়ে উঠে সমবায় সাধারণতন্ত্রে (co-operative common-wealth) পৌছে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই ব্যবস্থায় শাসনের আঘাত নেই, শোষণ নেই, ধনী নেই, নির্ধন নেই। পল্লী নিয়ে পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ হতে বিভিন্ন স্তরে স্তরে প্রতিনিধি নিয়ে সাধারণতন্ত্রে পৌচেছিল এই দেশের আদর্শ এবং গান্ধীজি সেই আদর্শ গ্রহণ করেই সাধারণ মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে চেয়েছেন।

মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত পঞ্চায়েতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে না, থাকবে সমন্বয় এবং মাতৃ-এষণা, ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে উদ্বুদ্ধ করে পঞ্চায়েতকে জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করবে। পল্লীর স্বাস্থ্য ও পানীয়, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শুশ্রূষা, পানীয় জলের সংরক্ষণ ও রোগবীজাণু রহিত করা, ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারীর প্রতিষেধক ব্যবস্থা, শস্য ও গবাদি পশুর সঠিক হিসাব রক্ষণ, গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত ও নূতন রাস্তা তৈরী করা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, গুণ্ডামি, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি প্রতিরোধ করা, গো-চারণভূমি, শ্মশান-ভূমি প্রভৃতির সুপরিচালনা ও সংরক্ষণ, সরকার পরিকল্পিত গ্রামোন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থাদি কার্যকর করা, গ্রামের সেচব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করা, প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অর্থাৎ গ্রন্থাগার, শিক্ষামূলক অন্য ব্যবস্থা, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদান ও গণতন্ত্রের অধিবাসীকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য গণশিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষাদান, কৃষি, কুটীরশিল্প, বাজার প্রভৃতিও দেখা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে গ্রামের যুবশক্তিকে সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা ও গ্রামবাসীকে বিভিন্ন অবস্থায় সাহায্য করা এবং গ্রামবাসীদিগকে স্বাবলম্বী ও পল্লীজীবনকে লোভনীয় করবার জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা পঞ্চায়েৎ অবলম্বন করবে।

ন্যায়পঞ্চায়েৎ পল্লীর বিরোধ ও সঙ্কট মিটিয়ে দেবে। এরই ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালন কাঠামো গড়ে উঠলে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের জীবন সুস্থ ও সবল হয়ে সুখ, শান্তি ও আনন্দের অধিকার পায় বলে এই দেশের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে এবং গান্ধীজির অন্তর্দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন ঃ 'Distinguished travellers from the world come to India in the days of yore from China and other countries. They came in quest of knowledge and put up with great hardships in travelling. They had reported that in India there was no theft, people were honest and industrious. They needed no locks for their doors. In those days there was no multiplicity of castes as at present, It is the function of Panchayats to revive honesty and industry. It is the function of the Panchayats to teach the villagers to aviod disputes, if they have to settle them. That would ensure speedy justice without any expenditure. They would need neither the police nor the military.'

আশ্রম জীবন প্রবর্ত্তন

পল্লীর শিক্ষিত ও সৎ ব্যক্তিদিগকে পরিণত বয়সে গ্রামে মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ ও সাধু জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এই ব্যক্তিরা স্বার্থলেশহীন অবস্থায় তাঁহাদের সুমার্জিত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আশ্রমে বসে পড়লে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার দ্বারা গ্রামবাসীদিগকে পরামর্শ দিতে পারেন। এ ছাড়া গ্রামবাসিরা এই সব লোকদের সাহচর্যে উন্নত জীবন লাভের সুযোগ পেতে পারে। তাঁরা শিশু বা যুবকদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের পথের সন্ধান দিতে পারেন। তাদের জন্য আশ্রম-পরিবেশে বিদ্যালয়, গ্রন্থালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে কিম্বা কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যায়ামাগার করে ভারতীয় চিন্তা ও চর্যার সন্ধান দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী করে দিতে সাহায্য করতে পারেন। আশ্রমে দেবালয় স্থাপন করে প্রত্যহ প্রার্থনা ও বিশেষ দিনে বিশেষ প্রার্থনা, সংকীর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে

পল্লী জীবনের বা জনগণের উন্নততর মানসিকতা এবং নৈতিক উৎকর্ষের ব্যবস্থা করতে পারেন। এই শ্রেণীর সৎ লোকদিগকে মঠে বা আশ্রমে রেখে গ্রামকে বা জনগণকে উন্নততর জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মনীতি, সৎনীতি প্রচারের জন্য সৎ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রাষ্ট্র হতে বৃত্তি দিয়ে এ প্রকার ব্যবস্থায় উৎসাহ দিতে হবে।

প্রাচীন ভারতের আশ্রম চতুষ্টয়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস মানবজীবনকে পূর্ণতা দান করেছে। জীবনের প্রথম ভাগে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির অধ্যায়, দ্বিতীয়ভাগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে জীবনকে রূপদান, তৃতীয় ভাগে জীবনের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজকে গড়বার ব্রত গ্রহণ এবং শেষ ভাগে সমগ্র জীবনের সঞ্চয়কে মোহমুক্ত করে জীবন-দেবতার সঙ্গ লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ। মানব মুক্তির এই পথ আজকের যুগেও সমানভাবেই রয়েছে।

পারিবারিক ব্যবস্থার সংস্কার

ভারতের পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তির উপর যে সামাজিক ব্যবস্থা আছে, তাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। মানুষের উন্নততর জীবন এলে, ত্যাগের ও সেবার আদর্শ থাকলে পারিবারিক জীবন সুমধুর হয়ে উঠে এবং পরস্পরের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতার দ্বারা মানুষের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হয়। ত্যাগ ও সেবার আদর্শের উপর পারিবারিক ব্যবস্থা দাঁড়ালে পরিবারের লোকদের সময়ের প্রাচুর্যের জন্য সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সুযোগ আসে। অর্থনৈতিক দিক হতে চাপ কমে, এতে মনুষ্যত্বের উন্মেষ সহজ হয়। মানবজীবনকে সুখী করবার জন্য গান্ধীজি তাঁর সাধনাকে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন: 'The ideals that regulate my life are presented for acceptance by mankind in general. I have arrived at them by gradual evolution. I claim to be no more than an average man with less than average ability. Nor can I claim any special merit for such non-violence or continence as I have been able to reach with laborious research. I have not the shadow of a doubt that any man or woman can achieve,

what I have, if he or she would make the same efforts and cultivate the same hope and faith.'

নারীর দায়িত্ব

নারী পুরুষের সমান নহে, সমতুল্য। নারীর এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যা পুরুষের নেই। আবার পুরুষের এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যা নারীর নেই। শরীরতত্ত্ববিদ্‌রাও বলেন যে, নারীর এমন কতগুলি স্নায়ু ও নাড়ী আছে, যা পুরুষের নেই এবং পুরুষের এমন কতগুলি স্নায়ু ও নাড়ী আছে, যা নারীর নেই। পুরুষদের যেখানে লাফ-ঝাঁপ, দৌড়াদৌড়ি বা শারীরিক শক্তির বা দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়, নারীরা সেখানে সেই পরিচয় দিতে পারে না। নারীর জন্য প্রাকৃতিক গঠনের দিক হতে কার্যব্যবস্থা করতে হবে! উহা পুরুষের কার্যের পরিপূরকরূপেই আসবে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, সমন্বয়ই আছে। এজন্য পরস্পর সমান (equal) নহে, সমতুল্য (equivalent)। নারী গৃহের রাণী, কর্ত্রী সেই গৃহে পুরুষ থাকবে শিশুর মত। তাহলেই নারীরও বিকাশের সুযোগ আসবে, পুরুষেরও প্রকাশের সুযোগ থাকবে। বাইরের জগতে পুরুষ শক্তির গর্ব ও পৌরুষ দেখাবে, নারী সেখানে থাকবে শিশুর মত। পুরুষকে যেখানে কঠোর রুদ্ররূপে আসতে হবে, নারী সেখানে তার সহজাত প্রকৃতি কোমলতার পরিচয় দিয়ে সামঞ্জস্য করবে।

নারীর মধুর রূপ—ত্যাগ, সেবা, স্নেহ, যত্ন, মায়া, মমতা—পুরুষের কঠোরতা, প্রচণ্ডতা, রুদ্রতার সঙ্গে সৌন্দর্য ও পৌরুষের সমন্বয়ে জীবনকে করে তুলবে মধুময়, গন্ধময়, রূপময়। নারী সেবা ও পুরুষ পরিজীবিকার ব্যবস্থা করে সমাজকে করে তুলবে জীবন্ত, বলিষ্ঠ, সুষমামণ্ডিত। নারী গৃহ ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ, শিশুপালন ও শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কুটীরশিল্প প্রসার, উচ্চ হৃদয়বৃত্তির পরিচয়-দানকারী কাজ করে সমাজের সাম্য রক্ষা করবে। সুন্দরের সঙ্গে থাকবে তার সম্পর্ক। এই সৌন্দর্যবোধের তাগিদে চলবে তার জীবন। তারই সৌরভে সমাজ হয়ে উঠবে—সুন্দর, বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত। জাতিও শান্ত, মধুর রুদ্রশক্তিতে দীপ্ত হয়ে পূর্ণতালাভ করবে। মাতৃ-এষণায় নারীই তার নিজস্ব সুরকে পায় বলে এখানে তার বিকাশের সুযোগ পরিপূর্ণভাবে আছে। প্রকৃত নারীকে

সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছে। নারী প্রকৃতির এই দানকে অস্বীকার করে যদি পুরুষের অনুকরণে লেগে যায় তবে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে। লজ্জা ও সজ্জায় সে হবে উষালোকে স্বর্গলোকের মত। নারী তার সত্তাকে হারালে শুধু তার নিজেকেই হারাবে না, মানবতাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করবে। নৃত্যের ছন্দ এবং সুরের তালে চলবে তার জীবন এবং এই-ই তার প্রতি স্রষ্টার বিধান। তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চললেই তার জীবন হয় সার্থক। তার পরিবেশ হয়—মধুময়, প্রেমময় ও আনন্দময়। তাতে দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র হয় সমৃদ্ধ।

শিশুর প্রতি কর্তব্য

শিশুসমাজ পুষ্পোদ্যানের ফুল। তার সমস্ত প্রাণশক্তিকে বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। অতি সতর্কতার সঙ্গে এই শিশুকে গড়ে তুললে আগামী দিনে এই শিশু তার সুষমায় সমাজকে মধুময় করে তুলবে। শিশু সত্য, শিব, সুন্দরের মূর্তি প্রকাশের সুযোগ পেলে যেমনি পূর্ণতা লাভ করবে, সমাজও হয়ে উঠবে চেতনাময়, জ্ঞানময়, প্রাণময়। শিশুর সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে বিকাশের দিকে নিয়ে চললে সমাজও প্রাণশক্তিতে দুর্বার হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'ঈশ্বর যে এখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি, তারই আভাসরূপে শিশুর আবির্ভাব।' একটা শিশু কত আকর্ষণীয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সে আকর্ষণ হ্রাস পায়। কিন্তু শিশুকে সুশিক্ষিত করে তুললে তার মধ্যে গভীর ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন হয়।

শিক্ষা ও ছাত্রের দায়িত্ব

শিশু কিশোর ও যুবকের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির অধ্যায় আরম্ভ হবে গুরুকুলে, বিদ্যালয়ে। ধন উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধতি, সমাজগঠনের রীতি-নীতি নিয়ম এবং সমাজ মানসকে নতুনরূপ দেবার আশা আকাঙ্ক্ষা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। বিদ্যার্থীর দেহ মন জ্ঞান বুদ্ধিকে দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করে স্বাধীন জাতির উপযোগী করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার প্রথম হতে উপরের ধাপ পর্যন্ত নিয়ে গেলে নতুন যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সন্ধান মিলতে পারে। এতে জীবিকা উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে

জীবনকে উদ্বেগমুক্ত করার আয়োজন হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড যোগে মানুষ করবার আয়োজনও রয়েছে। গান্ধীজি সভ্যতার কলের উর্ধে সজীব মানুষকে চেয়েছেন বলে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কতকগুলি বিশেষ শক্তির বিকাশের পরিবর্তে চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলন দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য করেছেন। তাদের এই শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতি ছাত্রদের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করতে হবে।

স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে নয়—মনকে আলোকিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অন্ধকারকে অভিশাপ না দিয়ে একটি আলো জ্বালানোও ঢের বেশী ভালো বলেছেন গান্ধীজি। মানবাত্মার চিরন্তন প্রশ্ন আলো, আলো। মানুষ চিরকাল আলোর পিয়াসী। সে তো অন্ধকারের প্রাণী নয়। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদিগকে ছুটিতে ছুটিতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং জাতির শিক্ষাহীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বুদ্ধির অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এতে ছাত্রগণ জনগণের সুখ দুঃখের ও তাদের সামাজিক, আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অল্প বয়স হতেই পরিচিত হবে। এই কাজের জন্য উপযুক্ত হতে তাদের নিজদিগকেও প্রস্তুত হতে হবে। তারা দৃঢ় চরিত্র, দুঃখ বরণ, সেবা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ না করলে জনগণের নিকট আকর্ষণীয় হবে না। এজন্য তাদের সত্যাশ্রয়ী, সুস্থ, সবল ও দৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য সংযত জীবনের বা ব্রহ্মচর্যের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই সম্পর্কে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

নৈতিক চরিত্রবলে বলীয়ান, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত এ আচার্যকুলের ব্যক্তিগত চরিত্রের মাধুর্যে ছাত্ররা গঠিত হবে। এ আচার্যকুল সরকার বা দলের বহির্মুক্ত বিচার বিভাগেরই মত স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থার নিয়মে পরিচালিত হবেন। কিন্তু ছাত্রজীবন প্রস্তুতির অধ্যায়। এই জীবনের সঞ্চয়ের উপরই পরবর্তী জীবনের ব্যয় বা দানের ক্ষমতা নির্ভর করে। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণই প্রধান দায়িত্ব। ছাত্রের এই শক্তিকে অপচয় করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করা হলে শুধু তার প্রতিই শত্রুতা করা হবে না, জাতির কল্যাণকেও আঘাত করা হবে। ছাত্রদিগকে জগত ও জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলতে হবে এবং ছাত্র তার এই কৌতূহল মিটাবার জন্য যতই আবরণ উন্মোচন করতে থাকবে,

জগত ও জীবন ততই তার কাছে উন্মুক্ত হবে। গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন : 'Craft, art, health and education should all be integrated into one scheme Naitalim is a beautiful blend of all tbe four and covers the wholle education of the individual from the time of conception to the moment of death.'

অনুন্নতদের প্রতি দায়িত্ব

ভারতবর্ষে সামাজিক ব্যবস্থা এবং পরাধীনতায় এক শ্রেণীর লোক শিক্ষা সংস্কৃতি, আর্থিক এবং অন্যান্য দিক হতে অনুন্নত। তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ওদের সমাজের উন্নত শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করে ফেলতে হবে। ইহা না করা হলে ওরাও জাতির কল্যাণকে ঠেকিয়ে রাখবে। জাতিদেহ এদের বাদ দিয়ে নহে। সুতরাং দেহের একাংশ অপুষ্ট বা অচল থাকলে সমগ্র দেহকে পীড়িত করে তোলে। মাতৃ-এষণার তাগিদই মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়। এদের অনুন্নত অবস্থাও মানবতার আদর্শের পরিপন্থী। এই তথাকথিত অনুন্নতদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই তাহাদিগকে উন্নত জীবনের সন্ধান দিতে হবে। গান্ধীজি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন : 'A non-violent system of Government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class nereby can not last. One day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land. A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is a volountary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good. I adhire to my doctrine or trusteesip inspite of the ridicule that has been poured upon it'

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজ দেহের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডে ক্ষয় ধরলে কিম্বা উহা ভেঙ্গে পড়লে সমাজ দেহ দাঁড়াতে পারে না। এই শ্রেণীর উপরই ভর করে জাতি চলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রোজ্জ্বল এবং জাতিদেহের শুভ্রতা, শুচিতা রক্ষা করে জাতিকে সুন্দরের সন্ধান দেয়। এদের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি জাতিকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। এরাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করে ও সমাজ জীবনে উদারতাকে আমদানী করে সমাজকে সৃজনীশক্তি সম্পন্ন করে রাখে। কিন্তু এই শক্তিশালী শ্রেণী যুদ্ধ, দাঙ্গা, ভারত ব্যবচ্ছেদের ফলে আজ নিঃস্বের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে; উহা রাষ্ট্রের কল্যাণের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুঃখে পীড়ায় অভাবে মহৎ দৃষ্টিকে হারিয়ে হতাশায় বিপথগামী হলে সমাজের কল্যাণকে আঘাত করতে পারে। সহজ বুলির কাছে এরা বাঁচবার সন্ধান করে নিজেদের দুঃখকেও যেমন বাড়িয়ে তুলবে, জাতির দুঃখকে তেমন বাড়াতে সাহায্য করবে।

এরা জানে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য বোধ আছে। এর মূলে রয়েছে ধর্মবোধ ও সহজাত বুদ্ধি। অবশ্য ঐশ্বর্যের দম্ভ ও পারিবারিক কৌলিন্যের ভিত্তিতে মেকী আভিজাত্যও রয়েছে। এ মেকী আভিজাত্যের পিছনে ধর্মবোধের প্রেরণা ও বুদ্ধির দীপ্তি নেই। সামাজিক শিক্ষা, সামাজিক বিশ্বাসের প্রসারে এবং সামাজিক শাসন ব্যবস্থার জন্য এই আভিজাত্য অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক বড় বেশী। পুরান আচার ও আচরণ শিল্পচেতন সমাজে ভেঙ্গে গিয়েছে কিন্তু নতুন সামাজিক দায়িত্ববোধ আজও দানা বেঁধে উঠেনি বলে সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কে এদের সমাজ সচেতনতা এখনও জেগে উঠেনি। সেদিককে তারা এড়িয়ে চলে। এতে বিপদের ঝুকি রয়েছে।

উদ্বাস্তু সমস্যা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত ত্যাগের কালে তাদের পোড়া মাটি নীতির কবলে পড়ে যে লক্ষ লক্ষ লোক উজাড় হয়ে গিয়ে পরাধীনতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে এবং পরাধীনতার মূল্য দিচ্ছে, সেই উদ্বাস্তুরা যে কোন সরকারের উপর এক গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। অর্থ নৈতিক দিক হতে বিপর্যস্ত ও অনুন্নত

সন্তমুক্ত ভারতের জাতীয় সরকারের সম্পর্কে ত কথাই নেই। কিন্তু এদের অগৌণে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা জাতির ও দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, এরা ক্ষুব্ধ এবং যাদের উপর এদের আক্রোশ রয়েছে, তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম এবং গৃহ ও বিত্ত ত্যাগের বেদনায় আহত এই ব্যক্তিদের এক বেপরোয়া ও যাযাবর মানসিকতা গড়ে উঠেছে।

আশ্রয় শিবিরে রাখবার ফলে এদের আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করে তোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বহু লোকের সঙ্গে বা জনাকীর্ণ পরিবেশে থেকে এবং বিভিন্ন অসুবিধা থাকার ফলে এদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ও মানসিক দুর্বলতার জন্য অপরাধ প্রবণতা আসছে। এই অবস্থায় বসবাসের জন্য পল্লীর পরিবেশে বাড়ীঘর ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু ভূমির ব্যবস্থা করে দিয়ে এদের জাতিদেহে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে। দেশ, জাতি, সমাজ, বাড়ীঘর, জায়গা জমির প্রতি এদের আকর্ষণ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা না করলে এরা রাষ্ট্রের কল্যাণের মূলে আঘাত করবে। এরা এক অস্বাভাবিক পরিবেশে থাকার ফলে মানুষের সৎবৃত্তিকে হারাতে বসেছে। মানুষের সৎবৃত্তি নষ্ট হলে দুর্বলতার সুযোগে চটকদার বুলির খপ্পরে পড়লে জাতিকে আঘাত করবে। এরা জানে না যে, ভারতবর্ষ দুর্বল হলে তাদের জন্মভিটার স্মৃতিও চিরকালের মত মুছে ফেলতে হবে।

ভারতীয় জাতি

ভারত ব্যবচ্ছেদে যে কি সর্বনাশের বীজ রয়েছে, দ্রষ্টা মহাত্মাজি তা জানতেন। তাই দেশ ব্যবচ্ছেদের পূর্বে নোয়াখালিতে তাঁর শান্তি পরিক্রমার কালে কর্মীদিগকে অহিংসভাব শান্তির বাণী প্রচার করতে গিয়ে নোয়াখালিতে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে নির্দেশ দিলেন ও বললেন এ প্রচেষ্টা সফল না হলে ভারতবর্ষ—ভারত ও পাকিস্তান দুই রাজ্যে বিভক্ত হতে বাধ্য। তিনি সে সময় আরও বললেন, 'এমন সময় আসতে পারে যখন ভারতে ভাষাগত সংখ্যালঘু প্রশ্ন মাথা তুলবে। যদি আমি সে পর্যন্ত বেঁচে থাকি এবং প্রদেশে প্রদেশে ভাষার প্রশ্নে উন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি। তবে আমি নিজে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিব। এক প্রদেশে এরূপ ঘটলে কাল অন্য প্রদেশে তা ঘটবেই। তখন ভারতের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভারতকে এক বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য রূপান্তরিত করে

অন্তর্বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণের মুখে ঠেলে দিব।' ভারত ব্যবচ্ছেদের ভিতর দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে শুধু এক জাতি গঠনের প্রচেষ্টাই নির্মূল হবে না, দেশও ধ্বংস হবে—ঋষির দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়ছে।

উন্নত, অনুন্নত, বাঙ্গালী-বিহারী, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্থায়ীবাসী-উদ্বাস্তু প্রভৃতি ভেদাভেদ ভারতীয় জাতি সৃষ্টিতে বিরাট বাধা। ভারত ব্যবচ্ছেদ করে আমরা এদের অগ্নিমূল্য দিয়েছি। এই ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখবার মনোভাব শোষণ এবং হীনমন্যতা (Inferiority complex) হতে জাত। ওকে আর টিকতে দিলে ভারতীয় জাতি সৃষ্টি কল্পনাতেই থেকে যাবে। ইহা আমাদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। বিশেষতঃ মাতৃ-এষণা ভেদাভেদ স্বীকার করে না। কারণ, মায়ের কাছে সন্তানে সন্তানে পার্থক্য নেই। ভারতের কোন কোন সম্প্রদায় আরবীয় ও রোমীয় নাম গ্রহণ করে জাতির দুর্যোগের দিনের স্মৃতি বহন করলেও তারা জাতিতত্ত্বের দিক হতে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন হতে পৃথক নহে।

পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা নীতি

মানবতাবাদের ভিত্তিতে মাতৃ-এষণার তাগিদে সৃষ্ট রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি চালিত হবে। উহা হবে মানবতাবাদ প্রচার করে তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের জন্য উৎসাহ দান। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের সংখ্যাবৃদ্ধির উপরই মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নির্ভর করে। এছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করে শান্তি ও মৈত্রীভাব রক্ষা এবং দেশরক্ষা হবে—আত্মরক্ষা নীতি ; মাতৃ-এষণা কোন মতেই আক্রমণ নীতি সমর্থন করে না এবং অপরের উপর বৈরীভাব পোষণ করে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাই তার কাছে বড়। মানুষ নীড় বাঁধে সুখ, শান্তি আনন্দে দিন কাটাবার জন্য। যারা মানুষের সেই সুখ, শান্তি, আনন্দে আগুন ধরিয়ে দেয়, তারা মানুষকে শ্রদ্ধা করে না। প্রাণৈষণা ও অন্নৈষণার প্রয়োজনে এবং বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ, জাতি রাষ্ট্র ও মানবতা বলপ্রয়োগ দ্বারা মানুষের সমস্যা সমাধান করতে চাহে। কেননা মানবের প্রাথমিক স্তর—জৈবপ্রকৃতি (animality) বুদ্ধিবাদ (rationality) বা মানবতার (humanity) স্তরকে অতিক্রম করে উৎকর্ষের চূড়ান্ত পর্যায় উঠে দেবত্ব (divinity) বা দেব জীবনকে লাভ করে।

মানুষের এই বুদ্ধি বৃত্তির পার্থক্য এ মানুষের উৎকর্ষ, জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়। ভারতের সংস্কৃতি শুধু নৃত্য, সঙ্গীত ও নাটক নয়, ধর্ম (soul order) সত্যের (sense of absolute sincerity) উপর গভীর বিশ্বাস ও যজ্ঞ (surrender of the ego) করবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনাকেই বুঝিয়েছে। ইহাই ভারতীয়দের জীবনাদর্শ। ইহারই ভিত্তিতে তার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন। উহা শান্ত অবস্থায় আয়ত্ত হয়।

এই শান্ত অবস্থা মাতৃ-এষণার আবেগেই আসে। মানুষের মহৎ বৃত্তির উৎকর্ষ এবং বুদ্ধি বৃত্তির চরম বিকাশ এনে মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানের আলোতে মানুষের সমস্যা সমাধান করবে। যাদের বুদ্ধি বৃত্তিতে ও মনুষ্যত্বে দৈন্য আছে, তারাই বলপ্রয়োগ বা পশুবলের উপর নির্ভর করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'কোন জাতি কিংবা কোন মানুষ অন্যকে ঘৃণা করে বেঁচে থাকতে পারে না। মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে মহৎ ত্যাগের প্রয়োজন হয়'। তিনি আরও বলেছেন, 'বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাওয়ার নামই জ্ঞান। প্রকৃতিকে জয় করতে এই মানুষের জন্ম, তাকে অনুসরণ করতে নয়।' মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মানবতার মুক্তির জন্য যেমন নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে, তেমনি তাঁরই প্রদর্শিত পথ মানুষের সম্পর্কের সন্ধান দিবে। তারই ভিত্তিতে পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা নীতি চলবে। গান্ধীজি বলেছেন : 'A free democratic India will gladly associate herself with other free nations for mutual defence against aggression and for economic co-operation. She will work for the establishment of a real worldorder based on freedom and democracy, utilizing the word's knowledge and resources for the progress and advancement of humanity.'

আজ এ কথা গোপন নেই যে, ক্রীপস্ মিশনের কালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতীয় নেতাদিগকে ক্রীপস মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন, তেমনি তিনি পরবর্তীকালে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব গ্রহণ না করে ভারত ব্যবচ্ছেদেও বাধা দিয়েছিলেন এবং কিছুকাল অপেক্ষা করে থাকলে ব্রিটিশ সরকার ও ইংরেজ জাতি অখণ্ড ভারতের দাবী স্বীকার করতে বাধ্য হবেন বলে অভিমতও দিয়েছিলেন। গান্ধীজি মনে করতেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ব্যবচ্ছেদ

করার উদ্দেশ্য নিয়েই মুসলীম লীগ নেতারা নোয়াখালীতে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, 'আজ যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা নোয়াখালীতে বাস করতে না পারে তবে আগামীকাল পূর্ববাংলার কোন জেলাতেই সংখ্যালঘু হিন্দুরা বাস করতে পারবে না।' এ জন্যই তিনি নোয়াখালীর শান্তি পরিক্রমাকে সফল করে ভারত বিভাগ রোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের শিবিরই দোদুল্যমান। তাঁর বিরোধীতা সত্বেও ঘটনাচক্রে ভারত ব্যবচ্ছেদ হয়েছে। জাতির অন্তরে ইহা এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ শুধু দ্বিখণ্ডিত বা দুইভাগই হয় নি, ভারত সাত ভাগ হয়েছে। সিংহল, পাকিস্থান, আরিয়ানা, নেপাল, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি ভারতবাসীর ধ্যানে ভেসে উঠে। রাজনৈতিক পৃথক সত্ত সত্বেও সাংস্কৃতিক, সমাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং ভাষাগত ও জাতিগত দিক হতে ভারতের এই খণ্ডিত ভূমি অবিচ্ছেদ্য আছে ও থাকবে। দেবভূমি—ভারতবর্ষের এই অখণ্ড সত্তা পরাধীনতা এবং পররাজ্যের প্রকাশ্য ও গোপন প্রচেষ্টা সত্বেও অটুট থাকবে। তাই কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতাবাদ যেন আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে আত্মঘাতী করে না তোলে, সেই সম্পর্কে রাষ্ট্র ও সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে। আপন অঙ্গকে যেন আমরা চিনতে ভুল না করি; নিজের দেহকে যেন আমরা আঘাত না করি—গান্ধীজির এই শিক্ষাকে আমরা অস্বীকার করলে আমাদের দুঃখের অবধি থাকবে না।

রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্ব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত ত্যাগের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধারা ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ত্রিশ বৎসরকাল এক অভিনব পথে এই যোদ্ধারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মানব মহত্বের শিখরে দাঁড়িয়ে নির্ভীক সংগ্রাম করে বিশ্বকে বিস্মিত করেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এদের এই দানের তুলনা নেই। আজ তাঁর এ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যও তেমনি নির্ভীকতা ও কর্মকুশলতা দেখিয়ে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এই অভিজ্ঞতা জাতির পরম সম্পদ হয়ে থাকবে। শাসনযন্ত্র পরিচালনের জন্য গান্ধীজির আদর্শে পরিচালিত কংগ্রেস ও জাতীয় নেতৃবর্গ অন্যান্য দেশের অনুকরণে বিপ্লবের বা সংগ্রামের পর ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের পরিচালিত শাসনযন্ত্রের ব্যক্তিদিগকে স্বাধীন দেশের সেবা করবার সুযোগ হতে বঞ্চিত করেননি এবং বহু ব্যক্তিই জাতীয় নেতাদের আস্থা রক্ষা করে জাতিকে বিপুলভাবে সেবা করেছেন।

বিদেশীর দাসত্বের মোহ হতে মুক্ত হয়ে ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকেই বড় বলে দেখবেন—শাসন পরিচালকযন্ত্রের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট জাতি ইহা প্রত্যাশা করে। গান্ধীজি বলেছেন : "The true source of rights is duty. If we all discharge our duties, rights will not be far to seek. If leaving duties unperformed we run after rights, they escape us like a will-o'-the wisp. The more wee pursue them, the farther they fly. The same teaching has been embodied by Krishna in the immortal words: 'Action alone is Thine. Leave thon the fruit severely alone.' Action ls duty; fruit is the right."

রাষ্ট্র পরিচালকগণ মানবতাবাদের ভিত্তিতে নিজদিগকে গঠন না করলে বিরাট মনুষ্য সমাজ বা জনগণের সহিত তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসবে। রাষ্ট্র পরিচালকদিগকে রাষ্ট্রের স্বার্থের দিক হতে অত্যন্ত সততা, নিরপেক্ষতা এবং ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সহিত পরিচয় হয়ে তাদের মত খাদ্য, পরিধেয় ও অপরাপর সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। জনগণ হতে পৃথক ব্যবস্থা করা হলে কংগ্রেসের আদর্শে পরিচালিত ও ত্যাগ ক্ষেত্র—ভারতবর্ষের রাষ্ট্র পরিচালকদিগকে জনগণ সহ্য করবে না। যে সকল সরকারী ব্যক্তি দুর্নীতি অবলম্বন করে, তারা স্বাধীন দেশের সরকারের ও জনগণের পরিচালক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। বিদেশী সরকারই পরাধীনতাকে দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে জাতিকে ও তার কর্মচারীকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলবার নীতি গ্রহণ করে। সেই দুর্নীতিপরায়ণ স্বভাব যারা আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জীইয়ে রেখেছে তারা দেশদ্রোহী।

যে সকল রাষ্ট্র পরিচালক সৎনীতি বা সৎপথ ত্যাগ করে, বা দুর্নীতি গ্রহণ করে তাদের প্রতি জনগণ শ্রদ্ধাশীল নহে। রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হলে উহা রাষ্ট্র, জাতি বা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালন যন্ত্রকে সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার উর্ধ্বে রাখতে হবে এবং যে সকল

ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে জাতির সর্বনাশকে ডেকে আনে, তাদের কোন প্রকারেই সহ্য করা সঙ্গত হবে না। দেশদ্রোহীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে জাতি বাঁচে না। দেশের স্বার্থই রাষ্ট্র পরিচালকদের একমাত্র আদর্শ। সেই আদর্শের কাছে অপর সকল কিছুই তুচ্ছ। জাতি, রাষ্ট্র বা দেশ বাঁচলে সকলে বাঁচবে; আর জাতি, রাষ্ট্র বা দেশ না বাঁচলে কে বাঁচবে? রাষ্ট্র পরিচালন যন্ত্রের যে সকল ব্যক্তি জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি স্বার্থকে বড় বলে দেখে, তারা জাতির শত্রু এবং যাদের নৈতিক প্রয়োজনীয় অর্থের ও অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাদের কাছে জাতির বা দেশের কিম্বা রাষ্ট্রের স্বার্থ কিভাবে নিরাপদ হবে? আমাদের গণতন্ত্র ইউরোপ হতে ধার করে আনা হয়েছে আর ভারতে ব্রিটিশ সরকারের আমলাতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রপরিচালন যন্ত্র। গান্ধীজি এ সম্পর্কে বলেছেন: 'It is my firm opinion that Europe to-day represents not the spirit of God or Christianity but the spirit of Satan. And Satan's successes are the greatest when he appears with the name of God on his lips. Europe is today only nominally christian. It is really worshipping Mamon.' পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে গর্বিত ব্যক্তিরা জাতির সকল ক্ষেত্র দখল করে বসে আছে। তারা অর্থ ছাড়া আর কিছু বুঝে না।

যারা বহুর কল্যাণের জন্য কাজ করে, তাদের ত্যাগ ও দুঃখ বরণের আদর্শ গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় তারা দুর্নীতি আমদানী করে। দুর্নীতি এলেই জাতি দুর্বল হয়, দেশের দুর্ভাগ্য উঁকি মারতে থাকে। এছাড়া বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত ধনতান্ত্রিক কিম্বা সাম্যবাদী অথবা ফ্যাসিস্তবাদী এবং পরাধীন দেশে নৈতিক ভিত্তির অভাব হেতু শাসকশক্তিকে অসি হাতে নিয়ে জনগণকে শান্ত করতে হয়, কিন্তু মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসককে বাঁশী নিয়ে জনগণকে শান্ত করতে হয়। যারা অসি হাতে নেয়, তারা মানুষকে শ্রদ্ধা করে না, বিশ্বাস করে না। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে জনগণকে শান্ত রাখতে সত্য, সেবা, ত্যাগ, দুঃখবরণই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। শাসকরা যদি একথা ভুলে যায়, তবে তাদের নিজেদের যেমন আত্মবিনাশ ডেকে আনে, রাষ্ট্রেরও ধ্বংস ডেকে আনে। ভারতবর্ষ সামগ্রিক যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং

দীর্ঘকাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতি সরকার বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করায় বর্তমানে সমাজে দুর্নীতি এবং সরকার বিরোধী মানসিকতা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। সে অবস্থায় শালীনতা বা সুরুচিবোধের ফসল ফলান খুবই শক্ত সমস্যা হবে জাতির ভবিষ্যতের মাঝ থেকে।

যারা রাজনৈতিক ব্যবসায়ের দোকান খুলে বসেছে সেই ক্ষমতালোভীরা এবং যারা অপর রাষ্ট্রের স্বার্থে বিদেশী ও কালোবাজারীদের অর্থে পুষ্ট হচ্ছে, এই আদর্শহীন দুর্বল ব্যক্তিরা জাতির এই দুরবস্থা ও সরকার বিরোধী মানসিকতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। জাতির এই ছিন্নমস্তারূপ জাতির অদৃষ্টে দুর্যোগের ইঙ্গিত। সামগ্রিক যুদ্ধের ফলে শুধু অর্থ নৈতিক বিপর্যই হয়নি, মানুষের মানসিক ক্ষেত্রেও বিরাট বিপর্যয় হয়েছে। মানুষের নৈতিক বোধের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে। এছাড়া সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উৎপাদনের অভাব ও বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অভাব অনটনের তাড়নায় মানুষের মনলোকে বিক্ষেপ এসেছে। মানুষের স্থৈর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জাতি যদি ছিন্নমস্তার রূপ গ্রহণ করে, তবে মেঘমুক্ত সূর্যালোক পুনরায় মেঘের আড়ালে ঢুকে পড়বে; জাতি আবার পরাধীনতাকে বরণ করবে। তখন তার মর্যাদাও বিপন্ন হবেই, তার অভাব অনটনের প্রতিকারোপায়ও থাকবে না, অথচ তীব্র কষাঘাতে তাকে করে ফেলবে—নির্জীব, নির্বীর্য।

অর্থনীতি

গান্ধীজি রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প এবং জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক সংস্থাকেই প্রায় স্বয়ন্তর করে তুলবার কথা চিন্তা করেছেন। প্রত্যেক সংস্থাই কিছুটা পরস্পর নির্ভরশীল হবে আমাদের দেহের গঠনের মত। সামান্যতম অঙ্গটি বাদ দিলেও যে প্রকার শরীরের অঙ্গহানি হয়ে সামগ্রিক সৌষ্ঠব ও শক্তিকে নষ্ট করে, তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার অবস্থা হবে। অর্থনীতি সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব চিন্তা রয়েছে। অনেকে তাকে অভাবের না হলেও কৃচ্ছ্রতার অর্থনীতি বলে ভুল করেন। তিনি অর্থনীতিকে ধর্মনীতি হতে পৃথক করে দেখেননি বলেই বলেছেন:
"That economics is untrue which ignores or disregards

moral values. The extension of the hand of non-violence in the domains of economics means nothing less than the introduction of moral values as factor to be considered in regulating international commerce.' গান্ধীজি আধ্যাত্মিক সচেতন মানুষ ; সত্য, প্রেম ও জ্ঞানের সন্ধানে তিনি উপলব্ধির উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিলেন। মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখেছেন। সে-মানুষের দুঃখ কষ্ট তাঁকে মর ভূমে টেনে রেখেছিল। তাই তিনি বলেছেন : 'ক্ষুধার্তের কাছে ভগবান খাদ্যরূপে আবির্ভূত হন।' তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্নের সংস্থান চেয়েছেন।

গান্ধীজির অভাব স্বল্প ও সীমাবদ্ধ হলেও তিনি পূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর এ বিশ্বাসের সত্যতা আপন জীবনযাত্রায় প্রমাণ করে গিয়েছেন। তিনি জানতেন, ঐশ্বর্য ঔদ্ধত্যের জনক। প্রয়োজনের স্বল্পতাই মানুষের ঐশ্বর্যের প্রকৃত পরিমাপ। শ্রীশ্রীরামঠাকুর বলেছেন : 'মানুষের প্রকৃত অভাব অতি কম, কল্পিত অভাবই সর্বনাশের মূল'। (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১৩৯ সংখ্যা)। গান্ধীজি হিন্দ স্বরাজে বলেছেন : 'I do not believe that multiplication of wants and machinery contributed to supply them is taking the world a single step nearer its goal.' গান্ধীজির সংযমকে বর্ণসুষমাহীন কঠোর নীতিমার্গ বলে কেহ কেহ মনে করেন। অবশ্য এক মহান জীবন হতে আমরা দূরে—বহু দূরে রয়েছি বলেই এ অবস্থা হচ্ছে। একের লোভ অপরকে গ্রাস করছে এবং সে লোভের শিকার হয়ে ধ্বংসকে ডেকে আনছে। প্রেম, সত্য, অহিংসার পূজারী বিপ্লবী মহাত্মাজির কল্যাণময় দর্শনই রক্তাক্ত বিপ্লবের পথের একমাত্র বিকল্প—এ কথা যেন আমরা না ভুলি।

নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি

আজকের এই অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য চাই জনগণের মধ্যে উচ্চ নৈতিক আবহাওয়া, গভীর দেশপ্রীতি, ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ সৃষ্টি ; তা হলেই জাতীয় স্বাধীনতা, জাতির সম্পদ, উৎকর্ষ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ থাকবে না এবং অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত নেতৃত্বেরও অভাব হবে না। আমরা ভারতবর্ষ হতে বিদেশী ইংরেজ শক্তিকে উৎখাত করে স্বাধীনতা পেয়েছি অর্থাৎ

অধীনতা হতে মুক্ত হয়েছি। কিন্তু স্বরাজ লাভ করি নি। আমাদের নিজেদের উপর নিজেদের রাজত্ব অর্থাৎ কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারি নি। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর শ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা, নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন মহৎ হতে মহত্তরের দিকে ছুটে চলে, শ্রেষ্ঠত্ব আয়ত্ত করে জীবনকে সার্থক করে, জাতি, দেশ, রাষ্ট্রকেও সেই পথেই শ্রেষ্ঠত্ব আয়ত্ত করতে হয়। এই মহান কাজের জন্য জাতির যুবশক্তিকে বের হয়ে আসতে হবে। তাদের কর্ম ও আচরণ দ্বারা সর্বপ্রথম জনচিত্তকে জয় করতে হবে।

যুবজনকে ভীতি, ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, লোভ, কুসংস্কার ও ক্রোধ এই সাতটি নেতিবাচক আবেগ (negative emotion) হতে মুক্ত হয়ে চিত্ত-লোকে বাসনা, বিশ্বাস, প্রেম, উৎসাহ, আশা, আনন্দানুভূতি ও যৌন অনুভূতি (emotion of sex) এই সাতটি সৃষ্টমুখী ক্রিয়াশীল আবেগ (positive emotions)কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কর্মকে কল্যাণমুখী করতে হবে। মাতৃ-এষণারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তারা ত্যাগ, সত্য, সেবা ও দুঃখ বরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির কাছে এসে উপস্থিত হলে এই বিক্ষিপ্ত জাতি সম্বিৎ ফিরিয়ে পাবে, যেমনি মায়ের উপস্থিতিতে ক্ষিপ্ত সন্তান শান্ত হয়। ত্যাগ, সত্য, সেবা ও দুঃখ বরণের আদর্শের আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত প্রবল। চিন্তা ভাবপ্রবণতার সহিত যুক্ত হলে গতিশীলতা আসে। উহা অমিত শক্তি। এই শক্তি যাতে সৎপথে পরিচালিত হয়, সেজন্য নিজকে সংযত ও নৈতিক পথে নিয়ে মনকে শান্ত করে সৃষ্টি জগতের বিরাটত্বের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে হয়। এর স্পর্শ অন্তরে গ্রহণের জন্য ধ্যান করতে হয়। তাতে হৃদয়ে স্পন্দন বা অনুরণন হয়। তাহাই বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বশক্তির সহিত সংযুক্ত বা যোগযুক্ত করে বলে দৃষ্টি স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং অজানা বস্তুও চিত্তলোকে ভেসে উঠে।

অন্তর্লোক দীপ্ত হয়ে উঠে বলে সেই আলোতে সমগ্র জগৎ দেখা যায়, সমস্ত মহতী শক্তির উন্মেষ হয়। মানুষের অস্তিত্বের চিন্তাই নিঃসঙ্গতার চিন্তা। সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত রসায়নের সুর মানুষকে অমর্তলোকে নিয়ে যায়। স্বার্থ জড়িত হলে দৃষ্টি হয় ঝাপসা কিন্তু স্বার্থহীন অনাসক্ত হলে সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সমস্ত দেখা যায়। মানুষ তার সীমাকে যত সঙ্কীর্ণ করে, ততই সে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। আর তার সীমাকে যতই প্রসারিত করে, ততই প্রসার লাভ করে, ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। গান্ধীজি বলেছেন: "I do not want my

house to be walled in all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. Mine is not a religion of the prison house. It has room for the least of God's creations, but it is proof against insolent pride of race, religion or colour." গান্ধীজি সকল স্রোতস্বিনীকে মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রের সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন, মানব মহত্বের শ্রেষ্ঠ ধারা—সত্য ও অহিংসার সহযোগে। সেজন্যই কোন সঙ্কীর্ণতা আসতে পারেনি বলে কূয়ো, ডোবা, নর্দমা সৃষ্টি হয়নি এবং স্রোতস্বিনীর স্রোত বন্ধ হয়েও বদ্ধ জলাশয় হয়নি। কিন্তু গান্ধীজির অবর্তমানে আর সে অবস্থা থাকেনি। লুব্ধ, সঙ্কীর্ণমনা, দৃষ্টিহীন, মৃতবিবেক মানুষরা নেতা সেজে ও গদী দখল করে সে বেগবতী স্রোতকে স্তব্ধ করে দিয়ে জাতিকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

প্রার্থনা ও ভারতীয় ধর্ম

গান্ধীজি চয়নকারী নন, ঋষি। তাই তাঁর ধ্যানে ভগবান করুণাময়, কল্যাণময়, প্রেমময়রূপে এসেছেন। তিনি সমুজ্জ্বল হৃদয়োপলব্ধি ও পরীক্ষিত বুদ্ধি এবং সাধনায় উপলব্ধি করলেন—'Truth is God'—'ভগবান সত্যে'র পরিবর্তে 'সত্যই ভগবান'রূপে পেলেন। নির্ভীক নিরাসক্ত চিত্তে যা পরম সত্য বলে জেনেছেন, তাকেই ভগবান বলে মেনেছেন। তাঁর কাছে—একমাত্র তাঁর কাছেই মাথা নত করেছেন। এ উপলব্ধি তাঁর কাছে মানুষকে, প্রাণীকে, চরাচরকে ভালবাসা। তাই তো তিনি বলেছেন: 'My unifom experience has convinced me that there is no other God than Truth. To see the universal and all pervading spirit of Truth face to face one must be able to love the mearest of creation as oneself. And a man who aspire after that cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into the field of politics and I can say without the slightest hesitation and

yet in all humility and those who say religion has nothing to do with politics do not kuow what religion means '

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'লোককে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন।' আর গান্ধীজি বলেছেন, 'কোন একজন সর্বদোষমুক্ত, পুরুষোত্তম ব্যক্তি আমাদের নেতা হিসাবে উপস্থিত হলে তাঁকে আমরা চিনতে পারব না। আমাদের তাড়নায় তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত কোন গুহায় আশ্রয় নিয়ে বাঁচবেন'। তিনি আরও বলেন, 'ঈশ্বরকে যে বন্ধুরূপে পেতে চায় তাকে হয় নিঃসঙ্গতা বরণ করতে হবে, আর নয় তো সমস্ত পৃথিবীকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে হবে।' মানুষ গহন অরণ্যে পৌছলে যেমন বনচারী পশুরা মানুষের উপস্থিতিতে শুধু বিস্মিতই হয় না, মানুষকে বরদাস্তও করতে চায় না। তেমনি মানুষের মধ্যে মহামানবের আবির্ভাব মানুষকে বিস্মিতই করে না, বরদাস্ত করতেও চায় না। যারা বরদাস্ত করেন, সঙ্গ করেন, তাঁরা অনুকরণ করেন, গ্রহণের অক্ষমতার জন্য। নিজের মত করে নেন, বিকৃত করে ফেলেন।

গান্ধীজি এই জন্য প্রার্থনার উপর খুব জোর দিতেন। কেহ কেহ অর্থহীন অনুষ্ঠানকেও প্রার্থনা বলতে চান। সমস্ত ব্যর্থতার পর প্রার্থনা করতেও এক শ্রেণীর লোক অভ্যস্ত। ব্যর্থতায় আহত লোকের মন ভয় ও সন্দেহে পূর্ণ থাকে বলে এই আবেগগুলিই চেতন মন হতে যে রূপ নিয়ে বের হয়ে আসে, তাতে প্রার্থনাকারীর সেই ভয় ও সন্দেহকে মূর্ত করে তোল। আমাদের আবেগ চিত্তলোকের মাধ্যমে বিশ্ব শক্তি হতে শক্তি সংগ্রহ করে বলে সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াশীল আবেগই যাতে রূপ পেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করতে হয়। প্রার্থনাকে ক্রিয়াশীল করতে হলে আমাদিগকে নেতিমূলক আবেগগুলি হতে মুক্ত হতে হয়। এই নেতিমূলক আবেগগুলি জীবনকে পঙ্গু করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। নৈতিক পথেই ক্রিয়াশীল আবেগগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। প্রার্থনা মানুষকে সঙ্কীর্ণতার, ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে বিরাট মহানের ধ্যানের মধ্য দিয়ে জীবনকে করে তোলে সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়। এই সুখ শান্তি আনন্দই সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বদেশে সকল সমাজই কামনা করেছে। এতে পৌছবার জন্যই মানুষের এত তপস্যা, এত সাধনা। বিশ্বাতীগ ভগবানের কাছে আত্মদান এবং বিশ্বরূপের কাছে আত্মসমর্পণ অধ্যাত্মসাধনার একটা ধারা। মানবসমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে আপন অন্তরে আকর্ষণ করতে হলে কাঁটা বাদ

দিয়ে ফল তুলে নেওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে মঙ্গলামঙ্গল, প্রেমশক্তি, দৈব প্রেরণা নিয়ত কাজ করে চলেছে। মহামানবের মধ্যে স্পষ্টরূপে তা দেখা যায়। এটা জড় প্রকৃতিতেও রয়েছে, তা না হলে বিবর্তনের পথে মানুষের উদ্ভব ও উদ্বর্তন হত না, জীব দেবতাতে রূপান্তরিত হত না।

কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা মানুষকে সুখ দেয় না। কোমলতা ও উদারতার মধ্যেই সুখ নিহিত। ত্যাগক্ষেত্র ভারতবর্ষ তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমন্বয়কে খুঁজে নিয়েছে এবং এই সমন্বয়ের পথেই গান্ধীজি মানবের সকল সমস্যার সমাধানের পথ বের করেছেন। ভারতীয়রা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্ম বিষয়েও সমন্বয় করবারই চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নহে, বরং ধর্ম সম্পর্কে গভীর অনুরাগের দ্যোতক। মনুষ্যত্বের বিকাশে আত্মিক উৎকর্ষ কামনা করে বলে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর বা ধর্মানুরাগীরই নিজস্ব পথে চলবার অধিকার স্বীকার—ভারতের ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। গান্ধীজি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ধর্মের মূল পর্যন্ত পৌঁছেছে, সে অন্যান্য ধর্মের মূলের সন্ধানও পেয়েছে'। এদেশের ধর্ম কোন বিশেষ মতের উপর জোর দিয়ে তার বন্ধ্যাত্ব আনে নি।

যিশুর পিতৃরূপে কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃরূপে কল্পিত মানুষের প্রতি দয়া; মহম্মদের ঈশ্বরের সত্তায় একাগ্র বিশ্বাস ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা; জরথুশত্রের ঈশ্বর অর্থাৎ সত্যকে স্বীকার করে পাপ পুরুষের বা মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দাঁড়ান; বুদ্ধদেবের সংসার ও কর্মে নিবৃত্তির উপদেশ এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা; মহাবীরের জীবে দয়া এবং জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা—এ সকলই দেবভূমি—ভারতের স্বভাবজ ধর্মের সম্পদ। বিশেষ ব্যক্তির মতের প্রতি একান্ত ও সর্বগ্রাহী নিষ্ঠার অভাব ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মহাপুরুষের কৃতিকে ভগবানের অংশ বা বিভূতি বলে স্বীকার করাই ভারতীয় ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা ঋতম্ভর। ব্যক্তি-বিশেষ বা মানব অথবা মহাপুরুষের বিচার বা ধারণা হতে নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্ত্বার যে পরিচালনী শক্তি বিশ্বপ্রপঞ্চকে ধরে রেখেছে যে ঋত, সেই ঋতকে ইহা বহন করছে। মাতৃ-এষণার তাগিদে পরিচালিত গান্ধীজি এই পথেই চলে মানবমুক্তির সন্ধান করেছেন এবং এই পথই যুগে যুগে কালে কালে দেশে দেশে

মানুষকে সুখ, শান্তি, আনন্দ দিয়েছে। গান্ধীজি বলেছেন, 'মানবসেবার মধ্য দিয়েই আমি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে চাই, কারণ, আমি জানি ঈশ্বর স্বর্গেও নেই পাতালেও নেই, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছেন।'

সৃষ্টিধর্মী যৌবনকে আহ্বান

আজকের পৃথিবী প্রাণৈষণা কিম্বা অন্নৈষণার তাগিদে উপস্থিত হবে না, উহা মাতৃ-এষণার তাগিদে উপস্থিত হবে। ত্যাগের আলোকে, সত্যের জ্যোতিতে ও দুঃখের আগুনে উহা মানুষের কাছে ধরা দেবে। পীড়িত মানবতা আজ একেই চাইছে, কিন্তু আঘাতে আঘাতে নিষ্পিষ্ট মানবতা আজ একে গ্রহণের ধৈর্য ও স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সাধনা না করলে সিদ্ধি হয় না। হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা রয়েছে তা মনোহর নাও হতে পারে কিন্তু চারিত্রিক বল, মানসিক পরিণতি ও হার্দিক দৃঢ়তার প্রয়োজন একে উন্মুক্ত করতে। ভগবানকে মনের মত করে নাও পাওয়া যেতে পারে। যাঁর এ আকর্ষণ যত প্রবল, তার জীবনে দুঃখ ও দুর্গতিও তত বেশী। মানুষকে ভগবানের মত—কঠিনতম সত্য সহ্য করবার মত—শুধু সত্য নয়, ভালবাসার মত করে তৈরী করে নিলে জীবনে জয় হয়। ইহাই গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা। পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুই সহজে ধরা দেয় না—ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। শিশুকে, কিশোরকে এই পথে চলবার জন্য প্রস্তুত করতে হবে, কিন্তু একে গ্রহণের জন্য যে মানসিকতার প্রয়োজন, প্রস্তুতির অধ্যায়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম না করলে তা আয়ত্ত হয় না। এই পথে পৌছবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও ঘাত-প্রতিঘাতে নির্যাতিত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার মধ্য দিয়া সিদ্ধিতে পৌছান সহজসাধ্য নহে, কিন্তু ইহা যুব মনের কাছে সহজসাধ্য।

যৌবন সৃষ্টিধর্মী। সৃষ্টিই জীবন, অফুরন্ত শক্তি তাকে অন্তহীনের সন্ধান দেয়। মনেই গ্রহণ ও ধারণের মানসিকতা আসে। তার সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সৃষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আবর্জনা নিয়ে নাড়া-চাড়া না করার জন্য তার মন থাকে—সুন্দর, স্বচ্ছ, দৃষ্টি থাকে—সংস্কার-মুক্ত। সুতরাং আজকের পরিস্থিতিতে তারই মধ্যে মাতৃ-এষণার প্রকাশ ও বিকাশক্ষেত্র রয়েছে। সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতি সহজ মমত্ববোধসম্পন্ন যুবমনই জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ ও মানবতাকে সত্যের, শিবের ও সুন্দরের দিকে

নিয়ে যাবে। এই যুব মনে থাকে ভাবপ্রবণতা। এর সহিত সৎচিন্তা বা পন্থাযুক্ত হয়ে গতিশীলতা আনলে মহাকল্যাণ করতে পারে। তেমনি অসৎ চিন্তা বা অসৎ পন্থা যুক্ত হলে উহা ভীষণ অকল্যাণ করে। সৎ চিন্তা ও পন্থায় পরিচালিত যুবশক্তি যখন কালের ধর্মে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে পৌঁছবে। তখন তার মধুর দৃষ্টিভঙ্গী জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবতাকে করে তুলবে সুখময়, শান্তিময় ও আনন্দময়। জীবন হয়ে উঠবে সেদিন সার্থক। রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি বা মানবতা হয়ে হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ। এই অবস্থাতেই গান্ধীজির সত্য ও অহিংস সমাজ এবং রামরাজ্য (Kingdom of god) প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী কিম্বা সাম্যবাদী বা ফ্যাসিস্তবাদী শাসন ব্যবস্থা হিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে উহা মানুষকে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করে এবং আঘাত করে। হিংস্র মনোভাব বন্যজীবন বা কাপুরুষতারই নামান্তর, কেননা, উহা জ্ঞানের দৈন্যের জন্য পশুর প্রকৃতিকে অনুসরণ করে।

মহাত্মাজি জাতির মুক্তি যুদ্ধে হিংসাকে বর্জন করে সত্য ও অহিংস নীতি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, হিংসাত্মক আবহাওয়ায় উৎকৃষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয় না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা ও কর্মীর জন্ম হয় না। মহৎ কল্যাণের প্রেরণা মিলে না। হিংসাত্মক আবহাওয়ায় নিপীড়কের অমানবিকতা গভীরতা লাভ করে; আর নিপীড়িতের তিক্ততা তীব্র হয়ে উঠে। হিংসা সৃজনী প্রতিভাকে নষ্ট করেই; সৃষ্টিশীল কর্মেই ও পূর্ণতার পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হিংসা মানুষের বন্যমনকে চাঙ্গা করে তোলে বলে বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী কোন্দলকে চোরাগলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করে। মানুষের কল্যাণকে ঠেকিয়ে রাখে। মানুষের দুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে। হিংসার আসরে অর্থলোভী স্বার্থপর মৃতবিবেক লুঠেরারা ভীড় করে মানুষকে পীড়িত করে। প্রতারক অপদার্থ, সঙ্কীর্ণচেতা, কর্তব্যবোধহীন নেতৃত্ব প্রগতির নামে মানুষকে নির্যাতন করে তৃপ্তি পায়। তাই গান্ধীজি সত্য ও অহিংসার উপর এত জোর দিয়েছেন।

মানুষ গতিশীল ও আলোমুখী বলেই হিংসা তার স্বভাবধর্ম হতে পারে না। মনুষ্যত্ব চূড়ান্ত বিকাশে পৌঁছতে পারলেই অহিংস অবস্থা আয়ত্ত হয় এবং অহিংসার সঙ্গেই সত্য চলতে থাকে। এই সত্য ও অহিংসাই মানব জীবনের পরম কাম্য এবং এই কাম্য বস্তুকে আয়ত্ব করবার জন্য গান্ধীজি জীবনভোর

সাধনা করেছেন এবং মানুষকে তা গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীজির ধ্যানে গ্রামময় ভারত ভেসে উঠত। গ্রাম সহরের অধিবাসীদের জন্য সর্বংসহ ছিল বলে নিজে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে। সহরের মানুষস্বার্থপর, আর গ্রামের মানুষ স্বার্থত্যাগী। এ ঋণ শোধের জন্য তিনি যুবজনকে আহ্বান করেছেন: 'I ask you young men to go to villages and bury yourselves there, not as their masters or benefectors but as their humble servants. Let them know what to do and how to change their modes of living from your daily conduct and way of living. Only feeling will be of no use. Just like steam which by itself is of no account unless it is kept under proper control when it becomes mighty force. I ask you to go forth as messangers of God carrying balm for the wouded soul of India'.

শুভের আহ্বান ও সত্যের সন্ধান

আজকের পৃথিবী এখানেই এবং আজ এই মাতৃ-এষণারই প্রয়োজন। ইহাই গান্ধীবাদ বা গান্ধীজি প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদ কিম্বা মানবতাবাদের আদর্শ ও লক্ষ্য। মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ বা রাষ্ট্রই গান্ধীজির শোষণহীন সমাজ বা রাষ্ট্র। এই সমাজ বা রাষ্ট্রে কোন প্রকার শোষণই থাকবে না, অথবা কাকেও ন্যায্য দাবী বা অধিকার হতে বঞ্চিত করবার ব্যবস্থা থাকবে না কিম্বা কেহই ন্যায্য দাবী বা অধিকারের অতিরিক্ত সুবিধা পাবে না। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যই গান্ধীজি মানুষের শুভবুদ্ধির আহ্বান করে তার প্রিয়তমের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন—

'ঈশ্বর আল্লা তেরি নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান' এবং ইহাই মানবতাবাদের মূল সুর। মানবতাবাদ মানুষের উৎকর্ষের আহ্বান জানিয়েছে। মানুষের উৎকর্ষই হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ এবং হৃদয়বৃত্তির উন্মেষই মানুষের কল্যাণ বুদ্ধির উদ্বোধন। এই কল্যাণ বুদ্ধির প্রেরণাতেই প্রেমভাব আসে। ইহাই গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও উৎস। প্রতি মানুষের প্রকাশ ও বিকাশের

ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্র হতে এই নব গণতন্ত্রের উদয় এবং ইহাই গণতন্ত্রের সত্যিকার রূপ। এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই প্রতি নরনারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। গান্ধীজি এই পথেই পরাধীন ভারতের জড়ত্ব কাটিয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে সার্থক করে মানব মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। এ দিব্য সম্পদকে রক্ষা করবার দায়িত্ব প্রতি মানবের—একথা আমরা যেন না ভুলি। ইহাই মানবতার গতি এবং এরই ভিত্তিতে মুক্ত ভারত রূপ নিতে চেয়েছে। আজকের দিনে মানব মুক্তির ইহাই একমাত্র পথ। এই পথ ব্যতীত আর দ্বিতীয় পথ নেই।

চরখা সূর্য ও অষ্টাদশ তারকা

মনুষ্যত্বের এ মহাসমুদ্র হতে গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হবে গান্ধীজি এ বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসই তাঁকে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং রামরাজ্য (kingdom of God) প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জুগিয়েছে। মানুষের শান্ত ও সুস্থ মনই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেয়। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশেই সত্য ও অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সত্য ও অহিংস-সমাজেই রূপগ্রহণ করেই হয়—রামরাজ্য। মানুষ বা মানুষ সমাজের চরম পরিণতি এই রামরাজ্যে। আর এই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার বীজ রয়েছে চরখায় বা চরখা সভ্যতায়। 'It (charkha) is the symbol of the nation's property and therefore freedom. It is a symbol not of commercial war, but of commercial peace. It bears not a message of ill-will towards the nations of the earth but of good-will and selfhelp'. চরখার গূঢ়তত্ব গান্ধীজির এ উক্তিতে। তিনি ভারতকে সুখী সমৃদ্ধ সুষ্ঠু সুসংস্কৃত দেশ ও জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন: 'I have no doubt that if India is to live on exemplary life of independence which would be the envy of the world, all the bhangis, doctors, lawyers, teachers, merchants and others would get the same wages for an honest day's work. Indian society may never reach the goal but it is the duty of evry Indian to set his sail towards that goal and no other if India is to be a happy land',

গান্ধীজি কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। এই কঠোর বাস্তববাদী দ্রষ্টা এই সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রগুলিও তাঁর দেশ ও জাতির ও মানব সমাজের সামনে রেখে গিয়েছেন। তিনি চরখাকে সূর্য বলেছেন এবং এই চরখা সূর্য-মণ্ডলের অষ্টাদশ তারকার উল্লেখ করেছেন। এইগুলিই অহিংস বিপ্লবের অষ্টাদশ সূত্র। গান্ধীজি চরখা দিয়েই জাতির সারা দেহে প্রাণ সঞ্চার করে ছিলেন এবং এই অষ্টাদশ তারকা বা সূত্রই জাতির প্রাণ শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সূর্য না থাকলে যেমন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি এই চরখা-সূর্য অহিংস সমাজ বা শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থার শক্তিকেন্দ্র। এই শক্তিকেন্দ্রও অষ্টাদশ তারকাতেই বিধৃত; তাই এই তারকা বা সূত্রগুলি চরখার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং ঐগুলিকে বাদ দিলে চরখা সূর্যের অস্তিত্ব লোপ পায়। এইগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী। এই অষ্টাদশ সূত্রে আছে ঃ

(১) **সাম্প্রদায়িক একতা**—ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেককে একত্ব অনুভব করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসসেবী তাদের নিজের ধর্ম ছাড়া অপর ধর্মের লোকদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার চেষ্টা করবেন। তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা আছে, অন্য ধর্মের প্রতিও তাকে সেই শ্রদ্ধা রাখতে হবে।

(২) **অস্পৃশ্যতা বর্জন**—আজ প্রতেক হিন্দুর হরিজনদের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেবা ও সাহচর্য দিয়ে তাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে হবে।

(৩) **মাদক নিবারণ**—যদি অহিংসার পথে স্বরাজলাভ আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে এই লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভবিষ্যৎ সরকারের ভরসায় তাদের মাদক পরিপ্লুত অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে ফেলে রাখলে চলবে না।

(৪) **খাদি**—খাদি প্রবর্তনের অর্থ দেশের সমস্ত অধিবাসীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যের প্রবর্তন। এর অর্থ, আমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ স্বদেশী হবে, আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা সমস্তই ভারতবর্ষে হবে এবং শুধু তাই নয়, ভারতের গ্রামবাসীদের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সহায়তায় তা করে নিতে হবে।

(৫) **পল্লীশিল্প**—এই শিল্পগুলি খাদির সহায়করূপে থাকবে। খাদি না থাকলে এরা টিকবে না। আবার এরা না থাকলে খাদির মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে। ধানভানা, গম পেষা, সাবান, কাগজ, দেশলাই তৈরী, তৈল প্রস্তুত করা, চামড়া

পাকা করা প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় পল্লীশিল্প না থাকলে পল্লীর গৃহস্থালী চলতে পারে না।

(৬) **পল্লীস্বাস্থ্য**—শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে আমরা যেভাবে গ্রামগুলিকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছি, তা সত্যই অপরাধ। সেইজন্য দেশের চারিদিকে সুদৃশ্য পল্লীর সৃষ্টি না হয়ে কতগুলি আবর্জনাস্তূপের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ কংগ্রেসসেবীরই বাস যদি গ্রামে হয় এবং তাহাই হবার কথা—তাহলে তাদের চেষ্টায় গ্রামগুলি সকল দিক হতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে।

(৭) **নূতন বা বুনিয়াদী শিক্ষা**—এটি নূতন জিনিষ। ভারতে যা কিছু চিরন্তন এবং কিছু শ্রেষ্ঠ তার সহিত কি সহরের কি গ্রামের সমস্ত শিশুদের সংযোগ করবার চেষ্টাই হল—বুনিয়াদী শিক্ষা। এই শিক্ষা এক সঙ্গে শরীর ও মনকে গড়ে তোলে। এই দেশের মাটির সঙ্গে শিশুকে সংযুক্ত করে রাখে এবং তার সামনে ভবিষ্যতের এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে।

(৮) **বয়স্ক শিক্ষা**—আমাকে যদি বয়স্ক শিক্ষার কাজ করতে হত, তা হলে আমাদের দেশ কত বড় এবং কি বিরাট, তাহাই সকলের আগে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। গ্রামবাসীর কাছে ভারতবর্ষ মানে তার গ্রাম। আমার কাছে বয়স্ক-শিক্ষার অর্থ প্রথমে মুখে মুখে বয়স্কদের যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া। মুখের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত শিক্ষাও দিতে হবে।

(৯) **নারী জাতি**—যে সকল আচার ও আইন দাবিয়ে রাখে তা পুরুষের সৃষ্টি। এতে নারীর কোন হাত ছিল না। অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার পুরুষের যতখানি আছে, নারীরও ততখানিই আছে। নারীরা যাতে পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং সমাজে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, তার জন্য তাদের সাহায্য করা কংগ্রেস-সেবীদের কর্তব্য।

(১০) **স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা**—স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান এবং স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল একটা পৃথক বিষয়। এ সম্বন্ধে আলোচনার এবং সে রকম আচরণের প্রয়োজন আছে। একটা সুব্যবস্থিত সমাজে প্রত্যেক লোক স্বাস্থ্যের নিয়ম জানে ও তা পালন করে। এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানা ও পালন না করার জন্যই অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(১১) **প্রাদেশিক ভাষা**—আমরা আমাদের মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষাকে বেশি আদর করি। এইজন্য শিক্ষিত ও রাজনৈতিক ভাবাপন্ন লোকদের এবং জনগণের মধ্যে একটা গভীর বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলি দরিদ্র হয়ে পড়েছে। দেশের জনসাধারণ আধুনিক চিন্তাধারা হতে দূরে রয়ে গেছে। যদি আমরা এই অনিষ্টের প্রতিকার না করি, তা হলে লোকের মন রুদ্ধ থেকে যাবে।

(১২) **রাষ্ট্রভাষা**—সর্বভারতীয় আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতীয় ভাষা-গুলির মধ্য হতে আমাদের এমন একটি ভাষার প্রয়োজন যা সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোক এখনই জানে ও বোঝে এবং যা অন্যেও সহজে শিখতে পারে। ইহা অবিসংবাদিত যে হিন্দীই এই ভাষা। উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই ভাষা বোঝে এবং এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষাই আরবী অক্ষরে লেখা হলে তাকে উর্দু বলে। ১৯২৫ সালে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই প্রস্তাবে এই ভাষাকে হিন্দুস্থানী ভাষা বলা হয়েছে।

(১৩) **ছাত্র**—অভিজ্ঞতা হতে দেখা যেতেছে, যদিও বর্তমান শিক্ষায় সত্য শিক্ষা হয় না এবং ইহা দেশের প্রকৃতি উপযোগী নয়, তা হলেও দেশের যুবকরা এর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কলেজের শিক্ষার ফলে অর্থ ও সুবিধা লাভের সুযোগ হয়। কলেজের শিক্ষা অভিজাতশ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশের পথ করে দেয়। অহিংসার গুণ বুঝতে হলে ধীরভাবে অনুসন্ধান করিতে হবে এবং যা বেশি কঠিন, আরও ধীরভাবে উহাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করতে হবে।

(১৪) **কৃষক**—স্বরাজ একটা বিরাট জিনিষ। কোটি হাত দিয়ে একে গড়ে তুলতে হবে। এদের মধ্যে কৃষকরাই সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশি। কৃষক আন্দোলনের সফলতার মূল কথা এই যে, কৃষকদের নিজেদের অনুভূতি অভি-যোগের প্রতিকার ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করা চলবে না।

(১৫) **শ্রমিক**—আহমদাবাদ শ্রমিক সঙ্ঘ যেভাবে গঠিত হয়েছে সমস্ত ভারতেই সেইভাবে শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ এবং শুদ্ধ অহিংসার উপর ভিত্তি করেই এই এই সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। এর কাজে কখনও কোন বাধা হয়নি। এই সঙ্ঘ কয়েকটি ধর্মঘট পরিচালনা করেছে। এই ধর্মঘট-

গুলি অহিংসভাবে পরিচালিত হয়েছে ও সফলও হয়েছে। যদি আমার মতানুসারে কাজ হত, তাহলে আমি ভারতের সমস্ত শ্রমিক সঙ্ঘ আহমদাবাদের আদর্শেই গঠন করতাম।

(১৬) আদিবাসী—আদিবাসীদের সেবা ও গঠন কর্মসূচীর একটা অঙ্গ। ভেবে দেখলে বোঝা যায় আমরা যে এক জাতি বলে দাবী করি, সেই দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা কত কঠিন। যদি জাতির প্রত্যেকটি অংশ অন্য সকল অংশের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করতে না পারে, তা হলে এক জাতি এই দাবী করা যায় না।

(১৭) কুষ্ঠরোগী—কুষ্ঠরোগী শব্দটির মধ্যে একটা গ্লানির আভাস আছে। সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যেমন সমাজের অঙ্গ এরাও তেমনই। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, তবুও তারাই আমাদের সমস্ত চিন্তা অধিকার করে আছে। কুষ্ঠরোগীদের সম্বন্ধে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু তা আমরা ইচ্ছা করেই অবহেলা করছি।

(১৮) ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা—এই শেষ সূত্রই অহিংস স্বরাজের শ্রেষ্ঠ উপায়। ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার অর্থ, ধনিক ও শ্রমিকের চিরন্তন বিরোধের অবসান। এতে বোঝায় যে, দেশের অধিকাংশ ধনসম্পদ যে মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তাদের অপেক্ষাকৃত নীচের স্তরে নামিয়ে আনতে হবে এবং দেশের কোটি কোটি অর্ধভুক্ত নগ্ন নরনারীকে অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে উঠিয়ে নিতে হবে।

সব বাতাসই এই দক্ষ কাণ্ডারীর পালে লেগেছিল, কোন তরঙ্গই বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে, তেমনি গঠনকার্যে তিনি ছিলেন অনন্য। গান্ধীজি চরখাসূর্যের চতুর্দিকে যে এই অষ্টাদশ তারকার সমাবেশ করেছেন, ওর মধ্যেই মানুষের জন্য তাঁর গভীর মমত্ব ফুটে উঠে এবং এই অষ্টাদশ সূত্রই সমাজবাদের সর্বাধুনিক আদর্শ। তিনি বলেছেন: 'I hold that without truth and non-violence there can be nothing but destruction for humanity. We can realize truth and non-violence only in the simplicity of village life and this simplicity can best be found in the Charkha and all that the Charkha connotes. I must not fear if the world today is going the wrong way. It may be that India too will

go that way and like the proverbial burn itself eventually in the flame round which it dances more and more fiercely. But it is my bounden duty up to my last breath to try to protect India and through India the entire world from such a doom.'

দেহত্যাগের দুই বৎসর পূর্বে গান্ধীজি এই কথা জওহরলালজীর কাছেই লিখেছিলেন, আর ক্ষমতায় বসেই তিনি গান্ধীজিকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে পশ্চিমকেই গ্রহণ করলেন। যাহোক, মাতা যেমন তার সন্তানকে পুষ্ট করবার জন্য কোন চেষ্টারই বাকী রাখেন না, গান্ধীজিও তাঁর জাতিকে সুষ্ঠু ও পুষ্ট করবার জন্য কত দরদীদৃষ্টি নিয়ে আজীবন তপস্যা করে গিয়েছেন এবং তপস্যার উৎস পেয়েছেন এই চরখার মধ্যে। এই চরখা তাঁকে তাঁর স্রষ্টার সহিতও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছিল বলেই তিনি চরখার মাধ্যমে মানবমুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছেন।

শেষ দলিল

গান্ধী-পূর্ব ভারতের সহিত গান্ধীযুগের যে বিরাট পার্থক্য ছিল, ইতিহাস তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছে। বস্তুতঃপক্ষে গান্ধীজিই নর-কঙ্কালে মাংস যোজনা করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনিই কংগ্রেসকে মুষ্টিমেয়ের বিলাস কক্ষ হতে গণদেবতার মন্দিরে পরিণত করে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আয়ত্ত করেছেন। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা গান্ধীজির একক দান, উহা তাঁর মৃত্যুর পর আরও তীব্রভাবে প্রকট হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী জাতির জন্য যে শেষ দলিল রেখে গিয়েছেন তাতে নাবালক সন্তানের জন্য পিতার উৎকণ্ঠাই তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেসের নিযুক্ত গঠনতন্ত্র কমিটির কাছে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের আমূল সংশোধন করে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন—

"ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হলেও কংগ্রেস উদ্ভাবিত উপায়েই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমান কংগ্রেসের অর্থাৎ প্রচার ব্যবস্থা ও পার্লামেন্টারী কার্যকলাপ পরিচালনার যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখনও ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হয় নি। গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের পথে ভারতের অগ্রগমনে সামরিক

শক্তির উপর শান্তিপ্রিয় নাগরিকের প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম অবশ্যই চলবে। রাজনৈতিক দল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত অশুভ প্রতিযোগিতা হতে একে মুক্ত রাখতে হবে। এই হেতু ও অন্যবিধ অনুরূপ কারণে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বর্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দিতে এবং নিম্নোক্ত বিধান অনুযায়ী লোকসেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব গ্রহণ করছে। অবস্থানুসারে উহার পরিবর্তন করা চলবে।

পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাম্য বা পল্লীমনা নরনারী নিয়ে একটি পঞ্চায়েৎ গঠিত হবে, এ জাতীয় দুইটি পরস্পর সন্নিহিত পঞ্চায়েৎ নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত এক নেতার অধীনে একটি কার্য পরিচালনকারী দল গঠন করবে। এরূপ একশত পঞ্চায়েৎ যখন গঠিত হবে, প্রথম শ্রেণীর নেতারা নিজেদের মধ্য হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা স্তরের নেতৃবৃন্দ নির্বাচন করবেন এবং এইরূপেই চলবে। প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীনে কাজ করবেন। সমগ্র ভারতে এভাবে পঞ্চায়েৎ গোষ্ঠী গঠন করা হবে। প্রথম পঞ্চায়েতের ন্যায় প্রত্যেক পরবর্তী পঞ্চায়েৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ পরস্পর যোগে সমগ্র ভারতের জন্য কাজ করবেন এবং স্বকীয়ভাবে নিজ নিজ অঞ্চলে কাজ চালাবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ প্রয়োজন হলে একজন সর্বোপরি বা সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করবেন। তিনি সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে পরিচালনা করবেন।

(যেহেতু প্রদেশ গঠন ও জিলা গঠন ব্যাপার এখনও কোন সুপরিকল্পিত রূপ পায়নি, সেই জন্যই সেবকদলকে প্রাদেশিক বা জেলা পরিষদে বিভক্ত করা হয় নি। সমগ্র ভারতের সেবাই তাদের এই কর্তৃত্বের পরিচায়ক হবে)।

(১) প্রত্যেক কর্মীকে সর্বদা নিজ হাতে কাটা সূতায় প্রস্তুত অথবা নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের অনুমোদিত সূতায় প্রস্তুত খাদি পরিধান করতে হবে। তাঁকে সর্বতোভাবে পানদোষ রহিত হতে হবে। যদি তিনি হিন্দু হন, ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পরিবারে সর্বপ্রকার অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে। তিনি সাম্প্রদায়িক মিলন আদর্শে বিশ্বাসী হবেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হবেন। স্ত্রী পুরুষ এবং জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকারে তিনি বিশ্বাসী হবেন।

(২) তিনি নিজ অঞ্চলের সমস্ত পল্লীবাসীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(৩) পল্লীবাসীদের মধ্য হতে তিনি কর্মী সংগ্রহ করবেন এবং তাদের শিক্ষা দিবেন, এই সকলের একটা রেজিষ্টার তিনি রাখবেন।

(৪) তাঁকে দৈনন্দিন কার্যের একটা বিবরণ রক্ষা করতে হবে।

(৫) কুটির শিল্প ও কৃষির মারফতে পল্লীবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য তিনি তাদের সংগঠন করবেন।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারে তিনি পল্লীবাসীদের শিক্ষা দিবেন এবং তাদের অসুস্থতা এবং রোগ নিবারণের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করবেন।

(৭) নয়ি তালিম পদ্ধতি অনুসারে তিনি তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এই সম্পর্কে তিনি হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করবেন।

(৮) যার নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়নি তার নাম যাতে ভোটার তালিকাভুক্ত হয়, তিনি সেদিকে লক্ষ্যও রাখবেন।

(৯) যারা ভোটার তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেনি, তারা যাতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তিনি সেদিকে তাদের উৎসাহ দিবেন।

(১০) কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে সঙ্ঘের নিয়মাবলী মেনে চলে উপরে বর্ণিত এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে তিনি নিজকে গঠন করবেন।

সঙ্ঘ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুমোদন করবেন ঃ—

(ক) নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ (খ) নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ (গ) হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ (ঘ) হরিজন সেবক সঙ্ঘ এবং (ঙ) গো-সেবা সঙ্ঘ।

অর্থ ব্যবস্থা ঃ—কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সঙ্ঘ পল্লীবাসী ও অন্যান্যদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করবেন। দরিদ্রের নিকট হতে সামান্য সামান্য অর্থ সংগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লোকসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জাতির প্রতি গান্ধীজির শেষ দান। গান্ধী জীবন আলোচনার প্রসঙ্গে জাতির প্রতি জাতির জনকের এই শেষ দলিলের কথা আমাদের স্মৃতিপথে আসে। তিনি চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একজন সর্বত্যাগী কর্মী থাকবে। তিনি রাজ্য বা কেন্দ্রে আইনসভায় যাবেন না, তবে তাঁরই বিশ্বস্ত ব্যক্তি আইনসভায় থাকবেন। মহাত্মাজির আত্মদানের

পর কংগ্রেস নেতারা তাঁর এই শেষ দলিল (testament) বা প্রস্তাবকে আমলই দেন নি। পাশ্চাত্য সংসদীয় ব্যবস্থাকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। অথচ সর্বনীচের স্তর থেকে প্রথমে আত্মশক্তি সহায়ে স্বরাজ গড়ে তুলে দেশকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই ছিল গান্ধীজির উদ্দেশ্য।

বাপু ভিক্ষার গ্লানি হতে জাতিকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছে তার পরম প্রিয় জাতির ও প্রতিষ্ঠানের জন্য মৃত্যুহীন পথেরও সন্ধান দিয়ে বলেছেন: 'There is no escape from the impending doom save through a bold and unconditional acceptance of the non-violent method with all its glorious implications. Democracy and violence can ill go together. The states that are today nominally democratic have either to become frankly totalitarian or, if they are to become truly democratic, they must became courageously non-violent. It is a blashphemy to say that non-violence can only be practised by individuals and never by nations which are composed of individuals.'

১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী সূর্য অস্তাচলে যাবার কালে জাতির জনকের চিতার রক্তিম শিখা দেখে বিহ্বল জনসমুদ্র চিৎকার করে উঠল—"মহাত্মা গান্ধী অমর হো গৈ।" জনসঙ্ঘের এই কণ্ঠের সহিত সেইদিন সমগ্র ভারতবর্ষ কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠেছিল—"মহাত্মা গান্ধী অমর হো গৈ।" আজ গান্ধী শতাব্দীপূর্তি বর্ষের পুণ্য দিবসে জাতি তার সেদিনের বেদনার্ত কণ্ঠের সহিত তার আজকের নিঃসঙ্গতাকে স্মরণ করে গান্ধীজির অমরাত্মার কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। আজ তাঁর স্থূলদেহ নেই। কিন্তু তিনি সত্য ও অহিংসার মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন। সত্য ও অহিংসার শব্দ মন্ত্রের উর্ধে যে নির্বিশেষ চৈতন্য আজ এর থেকে শক্তির উৎস খুলে যাবেই; তাহাই হবে গান্ধীজির নব জন্মলাভ। এ নব জন্ম হতে ভারতে নতুন জাতির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সেদিনই হবে বিশ্ব মানবের আনন্দলোক যাত্রা। ব্যক্তির ভূঃ থেকে মহ:তে উত্তরণ।

গান্ধীজির রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাকে বাস্তবায়িত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে।

তিনি রামকে কল্যাণের দেবতারূপেই দেখেছিলেন। এ রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য হেলায় রাজ্যলোভ ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছেন। প্রজারঞ্জনের জন্য তদ্গত-প্রাণা প্রেয়সী সীতাকে সতী জেনেও ত্যাগ করেছিলেন। যিনি প্রজার ঐশ্বর্য্যের বিশ্বস্ত রক্ষক ছিলেন, দরিদ্র প্রজাকে শোষণ করতেন না। গান্ধীজির কল্পলোকে সেই রামরাজ বা শাসন শক্তিই ছিল আদর্শ। রাষ্ট্রের অধিপতি হবেন নিরাসক্ত, বিষয় বৈরাগী। তা না হলে তো গান্ধীজির ভাষায় 'Power corrupts, chair devours man.' এদিক হতেই রামচন্দ্রকে সর্বহারার অধিনায়ক বা Dictator of the proletariat বলে আধুনিকদের স্বীকার করে নিতে অসুবিধা নেই। গান্ধীজির কাছে তাঁর নৈরাজ্যবাদের আদর্শের দিক হতেও রামরাজ্যের কল্পনা ছিল। সে রাজ্যে মানুষ মনুষ্যত্বে চরম বিকাশ লাভ করবে, শাসন শোষণ থাকবে না।

মহাত্মাজি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: 'I see coming the day of the rule of the poor, whether that rule be through force of arms or of non-violence. Let it be remembered that physical force is transitory even as the body is transitory. But the power of the spirit is permanent, even as the spirit is everlasting.'

গান্ধীজি আরও চেয়েছেন, 'Real Swaraj will come not by the aquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused. In other words, Swaraj is to be obtained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control authority.' আজ পশুশক্তি বিজ্ঞানের হিংসার রথে চেপে মানবজাতিকে ধ্বংস করতে এসেছে। তাই গান্ধীজি মানুষকে ঘৃণার বদলে প্রেমের—ভালবাসার রসে ভরে দিয়ে বাঁচবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। হিংসার মূলে ঘৃণা। আর এ ঘৃণা বিনাশকে ডেকে আনে—কল্যাণকে রুখে দাঁড়ায় আর তিনি সেখানে প্রেমের পূর্ণ পাত্র তুলে দিয়ে মানব-সমাজকে শুধু বাঁচাতে নয়, সুখী করেতও চেয়েছেন।

মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক

পৃথিবীর সামনে আজ দুটি পথ—পারমাণবিক বোমা অথবা মহাত্মা গান্ধী। পারমাণবিক বোমার পথ পৃথিবীর ধ্বংসের পথ, মহাত্মা গান্ধীর পথ মহাজীবনের পথ। তিনি জগৎকে শুনিয়েছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন—আত্মিক শক্তির কাছে আণবিক বোমার শক্তি দুর্বল। সূর্য সকল আলোর উৎস, তাই পৃথিবীর অপর কোন আলোই সূর্যের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে না। তেমনি যে সৃষ্টির উৎস মানুষ, সে সৃষ্টি কখনোই মানুষের শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। ধ্বংসের মারাত্মক অস্ত্রগুলো পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিগুলোর তূণে জমে উঠছে। দু প্রান্ত থেকে দু'টি টিপের অপেক্ষায়. এক পলকে সমগ্র পৃথিবী না হলেও প্রায় অনেকটাই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এরই মুখোমুখি হয়ে সকলে একবার মহাত্মা গান্ধীর দিকে ফিরে চেয়েছে। সে খুঁজছে মাতৃ-এষণাকে। তাঁর প্রাণ বাঁচাবার দায়ে মায়ের আঁচলে, সে মরতে চায় না বাঁচতে চায়।

আত্মত্যাগের নীতি

মহাত্মাজি জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন সত্য ও অহিংসাকে গ্রহণ করতে বলেছেন, তেমনি ইহা হতে জাত আত্মত্যাগকে গ্রহণের পরামর্শও দিয়েছেন। নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্য বলেছেন: 'I therefore suggest that my advice that moneyed men may earn their crores (honestly only, of course) but so as to dedicate them to the service of all is perfectly sound. "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা" is a mantra based on uncommon knowledge. It is the surest method to evolve a new order of life of universal benefit in the place of the present one where each one lives himself without regard to what happens to his neighbour.' লোভী মানুষের প্রচণ্ড লোভকে সংযত করে নতুন সমাজ সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আত্মিক শক্তি কত বড় বিরাট শক্তি সে তো আমরা গান্ধীজির ভিতর দেখেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তুতির অধ্যায়ের পর ভারতে সত্যের সন্ধানী

গান্ধীজিকে দেখলাম। তিনি বলেছেন: 'ভারতের প্রতি আমার গভীর মমতা রয়েছে। জগতকে দিবার মত বাণী ভারতের আছে। ইউরোপকে অন্ধভাবে অনুকরণ করলে চলবে না। ভারত যেদিন তরবারির নীতি গ্রহণ করবে, সেদিনই আমার সত্যিকারের পরীক্ষা। আশা করছি সেদিনও আমি অকৃতকার্য হব না। আমার ধর্মের কোন ভৌগোলিক সীমা নেই। আমার ধর্মে যদি জীবন্ত বিশ্বাস থাকে তবে সে বিশ্বাস ভারতের প্রতি আমার যে অনুরাগ রয়েছে তাকে ছাড়িয়ে যাবে। অহিংসায় আমার গভীর বিশ্বাস রয়েছে আমি সে বিশ্বাসই ভারতের সেবায় নিযুক্ত রয়েছি। তাইতো আমি ভারতের সামনে আত্মত্যাগের সুপ্রাচীন নীতি উপস্থিত করছি। কারণ সত্যাগ্রহ এবং তা হতে সৃষ্ট অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুঃখবরণ নীতিরই নাম। যে ঋষিরা হিংসার মধ্যেও অহিংসার নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা নিউটন অপেক্ষাও শক্তিশালী, ওয়েলিংটন অপেক্ষাও বড় যোদ্ধা। তাঁরা অস্ত্রের ব্যবহার জেনেও অস্ত্র শক্তির ব্যর্থতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ক্লান্ত পৃথিবীকে হিংসার ভিতর দিয়ে নয় অহিংসার ভিতর দিয়েই মুক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন।'

গান্ধীজি আবার বলেছেন: 'বিপথ থেকেও প্রিয়জনকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয় না। হিংসা ও ভীরুতার ভিতর আমি ভীরুতা অপেক্ষা হিংসাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি। অন্ধকে সুন্দর দৃশ্য দেখতে প্রলুব্ধ করবার মত আমি ভীরুর কাছে অহিংস নীতি প্রচার করতে চাই না। অহিংস চূড়ান্ত বীরত্ব। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি হিংসানীতি বিশ্বাসীর কাছে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে অসুবিধা নেই। আমি বহু বছরই ভীরু ছিলাম। তখন হিংসা নীতি পোষণ করতাম। যখন ভীরুতার উর্ধে উঠলাম, তখনই অহিংসার মূল্য বুঝতে লাগলাম'।

মহামানবরা এমন একটা উচ্চ গ্রামে সুর বেঁধে কথা বলেন, যার মাঝে অর্থের চেয়ে ভাবের দ্যোতনা থাকে বেশী। তাঁদের বলার ভঙ্গীও প্রত্যেকই পৃথক কিন্তু নদীর সাগরে মিলনের মত সেখানে থাকে ঐক্য। তাই সাধারণ মানুষের মনে সহজে রেখাপাত হয় না। মহামানবের বাণীর বিকৃত ব্যাখ্যা এবং তার মর্ম অপপ্রয়োগেই হয় বেশী ক্ষেত্রে। তবু আমরা গান্ধীজির জীবনে এক একটি কথা কত শক্তিশালী এবং কি প্রলয় সৃষ্টি করে নতুন ভাব বন্যা বহিয়ে দিতে পারে তা দেখেছি। তাঁর হরতাল, অসহযোগ, ডাণ্ডীযাত্রার পদধ্বনি, 'যব হম যাত্রা

শুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উতল হো যায়গে', ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, ভারত ছোড়—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাসে কি প্রলয় না সৃষ্টি করেছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিলোপ করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সকল বর্বরতা নিয়েও এদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

মহাত্মাজির মূল প্রকৃতি ব্যাপকতায় পৌঁছেছিল বলে মানবসমাজ ও বিশ্ব প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে আপনার জীবনের সকল দিকে উন্মুক্ত করে নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে বৃহৎ চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন, এবং মহৎ জীবনের মধ্যে ডুবে গিয়ে মহামানবত্বে পৌঁছে ব্যক্তি বিশেষের কেন্দ্র বিন্দুকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির হাতে তিনি অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য কি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। গান্ধীপূর্ব যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের এ অস্ত্র অবাস্তব ছিল। বেদনা-কাতর মানুষরা নির্যাতিত মানবতার বেদনায় নিজেদের অন্তরকে দলিত মথিত করেছেন, কিন্তু কোন বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি। টলস্টয় তাঁর 'Kingdom of God is within you' এবং রাস্কিন তাঁর 'Unto this last' গ্রন্থ দিয়ে গান্ধীজিকে সে পথের কিছু সন্ধান দিয়েছেন। থরো ও মহাত্মাজিকে মানব সমস্যা সমাধানে অহিংস নীতি প্রেরণা যুগিয়েছেন। দরিদ্রের দুঃখে টলস্টয় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্য ত্রাণভাণ্ডার খুললেন কিন্তু বুঝলেন 'They do not see the immorality or their lives. They know they are despised and abused but can't understand what there is for them to repent of and wherein they ought to amend.' তিনি দেখলেন জগতে দারিদ্র্যের কারণ ধনিকের শোষণ ও শ্রমিকের হাড়ভাঙ্গা শ্রমে। কারণ, 'if there is one man idle, there is another man dyeing of hunger.'

মহামনীষী টলস্টয় বুঝলেন কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন, কারণ তারা পরের শ্রমে উৎপন্ন সম্পদ চোরের মত ভোগ করে না। তারা চোখের জলে মুখের গ্রাস অর্জন করে। তারাই ধার্মিক, তারাই মানে খৃষ্টের উপদেশ—'In the sweat of thy face shalt thou eat bread'; তিনি নিজে কৃষকের জীবনযাপন করতে লাগলেন। নিজে জমিতে লাঙ্গল দিলেন। নিজেই জুতো তৈরী

করতে লাগলেন। তিনি রুশজাতিকে বললেন—'Go and live as peasents with the peasents.' আর মহাত্মাজি বলেছেন : 'Real socialism has been handed down to us by our ancestors who taught us : "All land belongs to Gopal, where then is the boundary line ?" Man is the maker of that line and he can therefore unmake it. Gopal literally means shepherd ; it also means God. In modern language it means the State, i.e. the people. That the land to day does not belong to the people is too true. But the fault is not in the teaching. It is in us who have not lined up to it.'

ব্যক্তির অধিকার

তারপর গান্ধীজি বললেন, 'কায়িক শ্রম করে সম্পদ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের সেবাকেই আমি স্বরাজ বলি। শুধু ব্রিটিশ শক্তির অপসারণই স্বাধীনতা নয়। অতি সাধারণ গ্রামবাসীর মনে সে নিজের ভাগ্যবিধাতা, আপন মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেই নিজের আইন প্রণেতা সেটাই হচ্ছে স্বাধীনতা।....আমি এমন সংবিধান চাই যে সংবিধান ভারতকে সর্বপ্রকার দাসত্ব ও অনুগ্রহ হতে মুক্ত করবে এবং প্রয়োজন হলে পাপ করবার স্বাধীনতাও থাকবে। দরিদ্রতম ব্যক্তিও ভারতকে তার নিজের দেশ বলে অনুভব করবে। সে দেশ গঠনে তার মতামতের মূল্য আছে। যেখানে সকল সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে। অস্পৃশ্যতা, অভিশাপ অথবা মাদক পানীয় ও ভেষজের অভিশাপ থাকবে না। পুরুষ নারীর সমানাধিকার থাকবে। পৃথিবীর সকলের সাথে সৌহার্দ থাকবে, কাকেও শোষণ করবে না। আমরাও শোষণ করতে দেব না বলে ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী থাকবে। বিদেশের বা এদেশের বিপুল মানুষের স্বার্থের সংঘাত নেই, তা আমরা বিশেষ ভাবে রক্ষা করব এবং বিদেশ ও এদেশের মধ্যে পার্থক্য করা আমিব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করি।....জাগ্রত ও স্বাধীন ভারত বেদনাকাতর জগতকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী শোনাবে। আমার আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা অপেক্ষাও বেশী। ভারতের মুক্তির দ্বারা আমি পৃথিবীর দুর্বলতর জাতিগুলোকে পশ্চাত্যের শোষণের নিষ্পেষণ হতে মুক্ত করতে চাই।'

গান্ধীজি আবারও বলেছেন ঃ 'স্বরাজ অর্থে আমি বুঝি—ভারতে জাত অথবা ভারতের স্থায়ী অধিবাসী প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী, যারা তাদের কায়িক শ্রম দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা করছে এবং নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ভোটদাতারূপে তালিকাভুক্ত হচ্ছে। এদের সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা।....এ স্বরাজে জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য থাকবে না। শিক্ষিত ও ধনীদেরই একমাত্র অধিকার থাকবে না। বিকলাঙ্গ, অন্ধ, ক্ষুধার্ত, শ্রমক্লিষ্ট মানুষেরই স্বরাজ হবে'। তিনি এভাবে নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের স্বার্থের ন্যাসরক্ষক বলে দিয়েছেন। ন্যাসরক্ষকের মালিকের সম্পত্তির সুপরিচালনেরই অধিকার রয়েছে কিন্তু তাকে ভোগ করবার কোন অধিকার নেই বলে মনে করতেন। অবহেলিত, অত্যাচারিত অর্ধনগ্ন, নিরস্ত্র মানুষের সহিত তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাঙ্গী পল্লীতেই থাকতেন না, পুনর্জন্ম হলে এদের ব্যথা বুঝবার জন্য এদের ঘরে জন্ম নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করেছেন। তিনি সুতা কেটে কি বস্ত্র বয়ন করে দরিদ্র ও তাঁতীদের সমগোষ্ঠীভুক্ত হননি, নিজে পায়খানা সাফ করে মেথরদের শরিক হয়েছেন। জুতা সেলাই করে মুচিদের আত্মীয় হলেন। সমাজের তথাকথিত নীচ জাতিদের আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন।

হিন্দুসমাজের সুবিধাভোগী অংশ তথাকথিত নিচদের উপর যে অত্যাচার করেছে, গান্ধীজির বেদনাক্ষুব্ধ মন এর প্রতিকার করবার জন্য হরিজন আন্দোলনে ডুবে গিয়েছিল। এদের বুকে টেনে নিয়েছেন। বহুদিন ধরে সমাজে ক্ষমতার অপব্যবহার সমাজ পাপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সমগ্র সমাজের উপর ধ্বংসের খড়্গ খাড়া হয়ে রয়েছে। কেহ বাদ যাবে না। দেহে ফোঁড়া হলে সারা দেহই যন্ত্রণা ভোগ করে। সমাজের পাপে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই অংশভাগী। 'এ আমার, এ তোমার পাপ'। তাই মহাকবি বহু পূর্বেই বলেছেন ঃ 'রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান, শুধু একমনে হও পার এ প্রলয় পারাবার।' ভগবান ক্ষমা করেন না, ক্ষমা করতে জানেনও না। তিনি মার্জনা করেন। সে মার্জনা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই উত্তীর্ণ হতে হয়। গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ম্যাকডোনাল্ড বাটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন সুরু করলে হিন্দু জাতি হতে তথাকথিত নিচ জাতিদের বিচ্ছিন্ন করা বন্ধ সম্ভব হয়। তিনি সারা দেশ সফর করে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেন। তিনি এদের নামই শুধু

হরিজন দেন নি। তিনি শ্রীশ্রীরামঠাকুরের ভাষায় জেনেছেন : 'এ জগতে চিন্তাময়ী দেবী পরমানন্দ হরিভক্তি স্বয়ং ভগবান। এই যে অদ্বৈত, অনন্যচেতা, ইহাই ভগবৎ শক্তি লাভে পরাকাষ্ঠা। ভগবান ধীর প্রকৃতিতে সতত বিরাজ করেন, সেই শক্তি হইতে বীরত্ব লাভ হইয়া থাকে।' (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ৩৯ সংখ্যা)। তিনি হরিজনদের শিক্ষাগুরু বলে শুধু গ্রহণই করেননি, তাদের সম্পর্কে তাঁর বোধিতে এসেছিল এরা হরির জন। এদের ভগবান বলেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বারে বারে পৃথিবী ধূলিধূসর হয়ে উঠলে সম্ভবামি যুগে যুগে বা 'I shall come again' এর আশ্বাসবাণী মিলে। রুশবিপ্লবে মানব মুক্তির আভাস দেখা দিয়েছিল কিন্তু হিংসার ভয়ঙ্করিতা এড়াতে পারেনি। রুশবিপ্লবের মহান উদ্দেশ্য আশার আলো দেখা দিলেও তার অসুন্দর উপায় দেখে রোঁমা রলাঁ আতঙ্কিত হলেন। তিনি বললেন : 'মার্কস দর্শন একা বিশ্বশান্তি বইতে পারবে না। কারণ বাইরে প্রবল শক্তিমান হলেও অন্তরে নিষ্পাপ নয়। মার্কস দর্শন এবং গান্ধী দর্শনের মিলন হলে উদ্দেশ্য ও উপায় হবে স্বার্থক সমন্বয় আর এই সমন্বয়ই পৃথিবীকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে।' তিনি আরও বলেন যে প্রতীচী হিংসাকে দমন করার জন্য হিংসাকেই অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে; অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে অত্যাচারকেই চালিত করছে। এ আগুন দিয়ে আগুন নেবানো শেষে ব্যর্থ হবেই। আর নব জাগ্রত প্রাচ্য ঐ ব্যর্থ প্রয়াসের অহঙ্কারে অন্ধ না হয়ে হিংসাকে আহত করবার জন্য অস্ত্ররূপে বহন করেছে অহিংসাকে। আগুন নেভাতে সে গ্রহণ করেছে, আগুন নয়, জল। এখানেই রলাঁ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সুন্দর উপায়ের সমন্বয় দেখেছেন এবং জগৎকে জানিয়েছেন—গান্ধীজির পথই আগামী দিনের পথ এবং তাঁর মতবাদই জয়ী হবে। গান্ধীজি, লোকমান্য তিলক, রবীন্দ্রনাথ, অ্যানি বেসান্তও রাশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে উৎফুল্ল হয়েছিলেন এবং বিশ্বের মুক্তির ভরসা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ স্বরাজ বা নিজের রাজের বিনিময়ে ক্ষুধার অন্ন, ভোগের উপাদান পেয়েছে। মানস স্বাধীনতাকে বলি দিয়ে যূথবদ্ধ হয়েছে।

তাই তো গান্ধীজি গণতন্ত্রের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন : 'A born democrat is a born disciplinarian. Democracy comes normally to yield willing obedience of all laws—human or divine-

I claim to be a democrat both by instinct and training. Let those who are ambitious to serve democracy qualifies themselves by satisfying first this acid test of democracy. Moreover, a democrat must be utterly selfless. He must think and dream not in terms of self or party but only of democracy.'

এ গণতন্ত্রীই গান্ধীজির সত্যাগ্রহী। এ সত্যাগ্রহীরাই গ্রামবোধ, গ্রামের সমাজচেতনা জাগিয়ে তুলে গ্রামকে কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যাপারে ক্রমে ক্রমে স্বয়ম্ভরতার দিক নিয়েই গ্রামেই প্রতিরোধ শক্তির স্তম্ভ রচনা করে জাতিকে অপরাজিত করে তুলবে এ ছিল—গান্ধীজির আশা। এখন মানব-হিত, দেশ-হিতের স্থানে ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজনসৃষ্ট দলহিতই স্থান পেয়েছে।

সর্বহারা বিপ্লবের বিপর্যয়

রাশিয়ার মুক্তিদাতা মহামতি লেনিন সোভিয়েটের জন্য শাসন ক্ষমতা, কৃষকের জন্য জমি, ক্ষুধার্তের জন্য রুটি ও জনগণের জন্য শান্তি চেয়েছেন। 'The word must be power to the Soviets ; Land to the peasants ; bread to the hungry and peace to the people,' বলেছেন লেনিন। সোভিয়েট যে আজ এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি (Super Power) তাতে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট নেতারা বিরাট শিল্প গড়ে তুলেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান চরম বিকাশে পৌঁচেছে। মহাকাশে আজ তার নাগরিক বিচরণ করছেন। অশিক্ষা নির্মূল করেছেন। কিন্তু সোভিয়েটের জনগণের কোন স্বাধীনতা নেই। সোভিয়েট কোন বিরোধী বা প্রতিপক্ষদল কিম্বা অভিমত বরদাস্ত করে না। কড়া পুলিসী ব্যবস্থা ও কঠোর দলীয় ব্যবস্থার সাহায্যে সকলকে নিস্তেজ করা হয়। সরকারের সংবাদপত্র ও বেতারের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব রয়েছে। ধর্মপ্রচারের অধিকার নেই। শৈশব হতেই কম্যুনিজম সম্পর্কেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সোভিয়েট নেতারা জনগণের সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলে থাকেন কিন্তু শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে ধর্মঘট কিম্বা ধর্মঘটের প্ররোচনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে।

আর্থিক উন্নয়ন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ শিল্প বা অন্য ব্যবসায়ে যে মূলধন নিয়োগ করেন তা রাষ্ট্রকে পুঁজিপতিতে পরিণত করা হয়েছে। সোভিয়েট জনগণ রাষ্ট্রের একচেটিয়া মুনাফার শিকার। উৎপাদনের ওপর হাত নেই, রাষ্ট্রই সে ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন। এ সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই পুঁজিবাদি ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেটব্রিটেন এবং অন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে কোন দিক হতেই পৃথক তো নহেই বরং কয়েক ধাপ উপরেই রয়েছে। এ ব্যবস্থা মার্কসের নৈরাজ্যের আদর্শের বিরোধী ত বটেই বরং তা হতে বহু দূরে সরে গিয়েছে। দলের কাছে ক্ষমতার উৎস এবং দলই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করছেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র টাকার শুধু এপিঠ ওপিঠের মত নয়, দুইই অবিচ্ছিন্ন। যা সমাজ তাই গণতন্ত্র। সমগ্র সমাজের যা কল্যাণ সমগ্র জন বা গণেরই তা কল্যাণ হবে। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ প্রতি মানুষের সর্বব্যাপী উৎকর্ষ, কল্যাণ। কিন্তু কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে জনগণের সর্বময় কর্তৃত্বে জনের মনকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। কর্মে কথায় কাজে এক সুরে চলবার ব্যবস্থা করে মানুষকে নাবালকে পরিণত করা হয়। এটা সভ্যতার স্বভাবধর্মবিরোধী।

মানুষের বুদ্ধিকে পরিণতি দিয়ে সাবালক করে তোলাই সকল যুগে সকল সভ্যতার মূল কথা। পরিণত বুদ্ধির পথে অগ্রগতিই বিবর্তন। মানুষ বা মানুষের সভ্যতার এ বিবর্তনের পথেই বর্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে। অর্বাচীনতা বিপর্যয়ও ডেকে আনে। সকল মানুষের প্রকাশ বিকাশ বা উদয়ই তো সর্বোদয়। গান্ধীজি ক্ষমতা কেন্দ্রাভিমুখী করা কোনমতেই সমর্থন করতেন না, তিনি সর্ব মানবের সেবার উপরই জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'To serve one's neighbour is to serve the world. Indeed it is only way open to us of serving the world. One to whom the whole world is his family should have the power of serving the universe without moving from his place. He can exercise this power only through service rendered to his neighbour. Tolstoy goes further aue says that at present we are riding other people's backs; it is enough only if we get down. This is another way of putting the same thing, No one can serve others without serving

himself. And whoever tries to achieve his private ends without serving others harms himself as well as the world at large.' সর্বমানবের কল্যাণই পরিণত বুদ্ধির দাবি। কিন্তু ক্ষমতার মত্ততা সমগ্র জনগণকে নাবালকে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অন্য লোভাতুর শক্তির মত নিজেদের কবজিতে রাখা হয়েছে। এতে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। সর্বহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। মার্কসের আদর্শে ও লেনিনের নেতৃত্ব অগ্নিমূল্য দিয়ে সর্বহারারা মানব মুক্তির জন্য যে মহান সম্পদ অগ্নিগর্ভ হতে তুলে এনেছিল, লুব্ধ, ক্ষমতা মাতালদের হাতে তা তুলে দিয়ে তারা সর্বহারা হয়েই রয়েছে। বিপ্লবের বিপর্যয়ের বোঝা সর্বহারাদের বইতে হচ্ছে এবং হবে। আজ তাকে একনায়কতন্ত্রের মূল্য দিতে হচ্ছে।

একনায়কতন্ত্রের বিপদ

ব্যক্তি বা দলই যখনই একনায়কতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে তখনই বুঝতে হবে সেখানে সকল মানুষের প্রতি তার বা তাদের প্রেম নেই। কল্যাণ বুদ্ধির অভাব সেখানে রয়েছে। এক ব্যক্তি একনায়ক হতে পারেন না। ব্যক্তি পশুবলের ভিত্তিতে কিম্বা ধূর্তামি ধোঁকাবাজি দিয়ে দেশের ঘাড়ে চেপে বসলেই সে হয় একনায়ক। সে বলিষ্ঠ মানুষ বা সমাজকে ভয় করে বলেই হিংস্রনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তার বুদ্ধির দৈন্যই অস্ত্রকে সম্বল করে নিরস্ত্র মানুষের উপর খবরদারি করার শক্তির যোগান দেয়। ত্যাগ তিতিক্ষা, শৌর্য বীর্য, প্রেম প্রীতিতে মহিমান্বিত ব্যক্তিই জনচিত্ত জয় করে হন দেশনায়ক—মহানায়ক। রাজতন্ত্রের রাজার মতই প্রজাতন্ত্রের এক নেতা এবং সাধারণতন্ত্রের নায়ক সর্বদিক হতেই অসাধারণ না হলে দেশ অচল—জাতি বাচাল—মাতৃভূমি বেহাল।

স্নেহ-শ্রদ্ধা, প্রীতি-প্রেম, আনুগত্য আত্মত্যাগের ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছিল আর এ সমাজের বনিয়াদ ছিল যৌথ পরিবার। ভারতের যৌথ পরিবারের আদর্শ সুপ্রাচীন; তা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের মনে যে যৌথ পরিবারের বোধ আছে তা রূপ নিয়েছে দল বা সঙ্ঘ বা সমিতিতে। এ দল বা সঙ্ঘ বা সমিতিতে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ রয়েছে বলে এগুলির প্রতি আজ আকর্ষণ বেড়েছে। এ দলীয় আনুগত্য আর সমাজবোধ এক নয়। সমাজবোধে সামাজিক হিতের যে কথা আছে, দলীয়বোধে তা

অনুপস্থিত। অথচ দলীয়বোধ সচেতন করে রাখলে ব্যক্তি বা পারিবারিক স্বার্থে চলতে বিবেক যে বাধা দেয় সে অস্বস্তি আর থাকে না। দলের উর্ধ্বে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন বিচারের স্থান নেই। তাই আজ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তার স্থান নেই। আছে দল বা ব্যক্তি স্বার্থের চিন্তা। এতে দেশ তলিয়ে যাবার আশঙ্কা বিদ্যমান। বহু নেতার আবির্ভাবে দেশ নেতিয়ে পড়ে, খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে। বহু নেতার দেশ ভ্রষ্টা নারীর মত মর্যাদাহীনা, দুর্বল, পঙ্গু।

গান্ধীজি যেমন ছিলেন দ্রষ্টা তেমন ছিলেন শব্দের স্রষ্টা। এ মণিকাঞ্চন যোগেই তিনি ছিলেন অপরিমেয় শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁর অন্তরের এ ধ্যানীসত্তার সঙ্গে কর্মসত্তার সামঞ্জস্য হয়েছিল বলেই তিনি সম্পূর্ণ মানুষ। গিরিচূড়া হতে সমতলের সবাই সমান। উচুনীচু ভেদ নেই বলে গান্ধী চিন্তায় সর্বমানবের কল্যাণচিন্তা। এ শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব কদাচিৎ ঘটে বলে সীমাবদ্ধ মানুষের মনে এ মানুষ কমই ধরা পড়ে। সামঞ্জস্য সৌন্দর্যের জনক। সামঞ্জস্য কল্যাণের যেমন পরিপোষক, আবার অকল্যাণেরও। কারণ ক্ষমাশীল দৃষ্টি সঙ্কীর্ণরা গ্রহণ করতে অক্ষম। সাধারণরা শ্রেয়োনীতিক। মহৎ সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নন। বিরাট বিশ্বভূমিকায় সাদাকালোর বর্ণে যে সুষমা ফুটে উঠে তাতে আনন্দ, বিস্ময়, বিষাদেও তিনি ক্ষমাসুন্দর, স্নিগ্ধ এবং স্বভাবতই উত্তাপ, উদ্বেগ, বিক্ষোভ ও বিক্ষেপ বর্জিত—শান্তো হয়মাত্মা। সাধারণ কিন্তু অশান্ত। অশান্ত হয়েই তাকে মহৎ বা শক্তির দেবতাকে স্পর্শ করতে হবে। আকর্ষণের অপর নামই প্রেম। যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। পিতা পুত্র আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ। পবিত্র আত্মার আবেশ। জগৎ জীব ঈশ্বর—এ তিনই এক। তিনের একত্ব সাধনের মধ্যেই আত্মোপলব্ধি। ঈশাবাস্য-মিদং যৎকিঞ্চিজগত্যাং জগত কিংবা সমুন্নত দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধি, এই তার জীবনের সার্থকতা।

মহাত্মাজি 'আমার জীবনই আমার বাণী' বলে তাঁর জীবনকে সকলের কাছে উপস্থিত করেছেন। বুদ্ধদেবও তাঁর শিষ্যদের 'আত্মদীপোভব'—নিজেই নিজের আলো হবে, বলেছেন। নিজের বুদ্ধির আলোতেই নিজের পথ খুঁজে নিতে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন। মহাপুরুষরা জীবন জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে যান আর অনুগামীরা নিজেদের বুদ্ধিতে বের হয়ে পড়বে মহাজীবনের রাজপথে—এটাই তাঁরা চান। কিন্তু বিরাট জীবন থেকে আমরা সাধারণরা সরে পড়ি তাঁদের

অন্তর্ধানের পর। বুদ্ধের শিষ্যরা বুদ্ধির শরণ না নিয়ে বুদ্ধের শরণ নিয়েছিলেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলে। আর গান্ধীজিরও বাণীকে গ্রহণ না করে 'মহাত্মাজি কি জয়' ধ্বনি দিয়ে বুদ্ধের মতই ভারতের অন্তর হতে গান্ধীকে বিদায় দিয়েছেন। অপরিণত বুদ্ধির অসতর্ক আত্মসমর্পণ অপেক্ষা পরিণত বুদ্ধির সতর্কতা কিছুটা কাম্য হলেও ভণ্ডামি নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। গান্ধীজির রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল— মানবতাভিত্তিক। যন্ত্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই যন্ত্র। জীবনের মূল, জীবকোষ—এমিবা হতে মানুষের উত্তরণ। অতি মন্থর গতিতে যুগযুগান্তের পারাবার পাড়ি দিয়ে তৃণ-লতা-গাছ-পশু হতে মানুষ হবার ইতিহাস বিস্ময়কর। কত অন্ধকার, বন্ধুর পথ আলোকিত ও সুগম হয়েছে। কত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

জীবের অস্তিত্বের অভাবনীয় রূপই নিয়েছে গুণে, মাত্রায়, স্থানে ও কালে—পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস, বিদ্যুৎ, সূর্যের আলো ও তাপের স্পর্শে। ধীর পদক্ষেপে অনেক বাধা-বিপত্তি ও ব্যর্থতা ডিঙ্গিয়ে তার মধ্যে এলো সমাজবোধ, কল্যাণ বোধ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও রূপের তৃষ্ণা। জন্ম নিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ। এ বিবর্তনের পথে কত মহামানব এলেন, এলেন গান্ধী। সত্য ও অহিংসাকে তুলে ধরলেন এবং তারই ভিত্তিতে মানবসমাজকে গড়তে চাইলেন। কিন্তু তারপর যাঁরা এলেন, তাঁরা তারই জয়ধ্বনি দিয়ে দেশের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরই ছবি সামনে টাঙ্গিয়ে রেখে তাঁর আদর্শকে বিকৃত করে প্রচার করলেন। যা সত্য নয় তাকে সুবিধাবাদীদের প্রয়োজনে সত্য বলে চালিয়ে যাবার কি বিপদ তা তাঁদের কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু যেদিন তার হিসাব হবে সেদিন প্রাণঘাতী মূল্য দিয়েও রক্ষা পাওয়া যাবে না। স্বার্থের তাগিদ নোংরা পরার্থ শুভ্র, পবিত্র, বিশাল।

আজ চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: 'The night is darkest before dawn but the coming of dawn is inevitable.' গান্ধীজিও বলেছেন মানুষের জীবন প্রবাহ থেমে যে যায়নি, তা বুঝা যায় যখন দেখি যে মারকশক্তি অপেক্ষা ধারক শক্তিই প্রবল। সুতরাং প্রেমের শক্তিই বলবান। সত্যাগ্রহ মন্ত্রের ঋষি মহাত্মাজি civil disobediencecক আইন অমান্য না বলে সবিনয় অবজ্ঞা বলেছেন। সত্যাগ্রহীকে এ অস্ত্র গ্রহণের পথ দেখিয়েছেন; কারণ এ অস্ত্র দিয়ে তিনি যেমন ব্যক্তি তাঁর দেশের কল্যাণ করবেন, তেমনি অপর ব্যক্তি বা সমাজ বা দেশেরও কল্যাণ

চেয়েছেন। কিন্তু এ অস্ত্র ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: 'I do believe that when there is only a choice between cowards and violence, I would advise violence. I would rather have India resort to arms in order to defend her honour than that she should in a cowardly manner become or remain helpless victim to her own dishonour. But I believe that non-violence is infinitly superior to violence, forgiveness is more manly than punishment.'

ভারত এবং বিশ্বমানবকে গ্লানি হতে মুক্ত করবার জন্য তিনি সত্য ও অহিংসার অস্ত্র তুলে ধরেছেন এবং দৃঢ়ভাবেই বারবার এ অস্ত্রের কার্যকারিতা বলেছেন। সবার পিছনে সবার নীচে সমস্ত মানুষের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্যই অহিংস হতে বলেছেন এবং অহিংস না হলে মহৎ জীবনের সন্ধান মিলে না। সত্য দর্শনও হয় না। সূর্য অপেক্ষাও কোটি গুণ জ্যোতিময় এ সত্যকে তিনি বলেছেন। গান্ধীজি জানতেন যে ভারতবাসীদের খাদ্য, জলবায়ুর প্রসাদগুণে ব্যক্তিজীবনে যেমন, সঙ্ঘ সমাজ বা জাতীয়জীবনেও তেমন অবজ্ঞা বা প্রতিবাদের ভঙ্গী ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এতে বলিষ্ঠ জীবনের পরিচয় মিলে না। আমরা হয় ভয়ে আত্মসমর্পণ করি, না হয় প্রশ্রয়ে মারমুখো হয়ে উঠি। মর্যাদাবোধ ও কর্তব্যবোধ খুবই শিথিল। অধিকারবোধ আছে কিন্তু দায়িত্ববোধ নেই। মহাত্মাজি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে এ ব্যক্তিচরিত্র, সমাজচরিত্র ও জাতীয় চরিত্রকে পরিবর্তন করে মহৎ জীবনের প্রকাশের—সর্বোদয়ের জন্য কাজ করে গিয়েছেন।

মুক্তি যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ

মহাত্মা গান্ধী পার্থিব সত্যকে অবজ্ঞা করে নয়, স্বীকার করেই, নিজের গুণে নয়, অখণ্ড সত্তার সঙ্গে মিশে যাবার ফলেই বিশ্বমানবকে তাঁর ধ্যানে ধরতে পেরেছেন। অসত্যের থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যুর থেকে অমৃতের পথে এ যাত্রা। এ পথের অন্ত নেই। অনন্ত পথ চলাই আমাদের জীবনের সত্য স্বরূপ। আমরা চলতে থাকব তখনই প্রকাশ আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হবে। ভগবানের প্রেমময়, করুণাময়, কল্যাণময় মূর্তি উপলব্ধি করতে ও করাতে গান্ধীজি অবিরাম চেষ্টা করেছেন। তিনি

মানুষের মন হতে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ উৎপাটিত করে সে শূন্য স্থানে প্রেম, প্রীতি, মৈত্রী বপন করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন যে দরিদ্র, দলিত মানুষের সেবার জন্য হিংস্র পথ যারা গ্রহণ করে, সে হিংসার দাবানলেই এদের সর্বাগ্রে ভস্ম করা হয়। পতিত জমিতে পতন পদার্থই উৎপন্ন হয়। হিংসাই প্রতিহিংসাকে ডেকে আনে নয়, সেখান হতেও মারাত্মক হিংস্রমূর্তি জন্মগ্রহণ করে। অসত্য ও হিংসার কোলে কল্যাণ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তাই সত্যের প্রতি আগ্রহীদের সন্ধান করেছেন এবং এজন্যই আজন্ম কাজ করেছেন।

গান্ধীজি মীরাবেনকে (Miss Slade) লিখেছিলেন : 'I am trying to put people on the road. But it will need many Gandhis to bring the experiment of non-violence to perfection.' তিনি তাঁর পথের পথিকদেরও তিনি যা বলেছেন, তার অনুসরণ বা অনুকরণ না করে সে ভাবনাকে দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী প্রয়োগ করতেও বলে গিয়েছেন। আজ ভারত বা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অহিংস নীতির প্রয়োগ কৌশল পৃথকরূপে দেখা গিয়েছে। তিনি আমাদের বলেছিলেন, 'ঈশ্বরবিরোধী ব্যক্তিও সত্যাগ্রহী হতে পারেন, কারণ সত্যই ঈশ্বর। সত্যাগ্রহীকে চিন্তায় বাক্যে, কাজে অহিংস হতে হবে। সাধকেরই সত্যাগ্রহ করবার শক্তি থাকে। যে সত্যাগ্রহীর আত্মার উপলব্ধি আছে তাঁর সত্যাগ্রহ করবার অধিকার হয়। সত্যের পরিবর্তন নেই। এ তো অনন্তকালের সম্পদ। স্যাণ্ডো মাংসপেশী সঞ্চালনের উৎকর্ষ সম্পর্কে যে পথ আবিষ্কার করেছিলেন তার অস্তিত্ব এখন আর নেই। এখন আবার মূলারের পথ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণদেব আত্মার উপলব্ধি সম্পর্কে যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, তা তো চিরন্তন কালের! এর কোন পরিবর্তন কখনও হবে না'। (১৯৩৪ সালের দেশ-এর ১৬ই জুনের সংখ্যায় গ্রন্থকারের লেখা প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত।) তিনি আরও বলেছেন, 'আমার সব কাজ আধ্যাত্মিকতার দাবি রাখে, সেগুলি যদি অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয় তবে বুঝতে হবে যে, সে সব কাজ নিষ্ফল হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যে কাজ সত্যই আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কাজ সব চেয়ে বেশী বাস্তব হতে বাধ্য'।

মহাত্মা গান্ধী ভগবানকে সত্য শিব সুন্দররূপে জেনেছেন, জীবের উপর তিনি নিরন্তর করুণা প্রেম বিলিয়ে চলেছেন। কিন্তু যে হাতে তিনি প্রেম করুণা

বিলান, সে হাতেই সুধার সঙ্গে গরলও ঢেলে দিচ্ছেন। বিশ্বপতাকায় পদ্ম-ফুলের মাঝে বজ্র আঁকা।—খরা, প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ, নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের অসহায়ের আর্তনাদ, যন্ত্রণা, দয়া ও নির্দয়তার, প্রেম ও ভয়ঙ্করের সহাবস্থান। কিন্তু তিনি জানেন, মেঘে বজ্র রয়েছে, চাতক সে মেঘ থেকেই জল খাচ্ছে। কল্যাণ অকল্যাণকে স্বীকার করেই বুঝতে হবে মানুষে মানুষে সবাই এক। সমাজদেহের এক অংশে বিষ সঞ্চার হলে সারা দেহেই বিস্ফোটক হবে, দুঃসহ যন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। দুঃখ বজ্রকঠিন সত্য, কিন্তু সুখও আছে। পরের ব্যথা নিজের ব্যথা—এটাও ভয়ঙ্কর সত্য। এ সত্য বোধই পরের সেবায়, কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করে সুখ, তৃপ্তি এবং তার মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্যের উপলব্ধি।

গান্ধীজি বলেছেন, 'প্রতিদিন আমি এত দুঃখ কষ্ট ও নৈরাশ্য দেখি যে, আমি যদি আমার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব না করতে পারতাম তবে এতদিনে আমি বদ্ধ উন্মাদ হতাম এবং গঙ্গায় ঝাঁপ দিতাম।' তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন, 'মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন লোককে ভাল লোক বলা যায় না। আমার মৃত্যুর পর কোন আপন লোক আমার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে আমি ছড়িয়ে থাকব।'

ভারতে আচার্য বিনোবাভাবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে ভূদান আন্দোলন করছেন। তিনি কয়েক কোটি একর জমি সংগ্রহ করেছেন। গান্ধীজিও স্বাধীন ভারতে প্রয়োজনভিত্তিক ভূমিসমস্যা সমাধানর আশ্বাস দিয়েছিলেন। গান্ধীজির পরম প্রিয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সেনাপতি খান আবদুল গফুর খান খোদাই খিদমদগারদের নিয়ে পুস্তভাষীদের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার করছে তার প্রতিকারের পথও অহিংস নীতিতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে অহিংস পন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় পাঠানদের মুক্তি নেই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং নিগ্রোদের মুক্তির জন্য অহিংস পথে সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁর স্বপ্ন রূপায়নের পথে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'The whole concept of satyagraha was profoundly significant to me.' তিনি আরও বলেছেন যে বেন্থাম ও মিল, মার্কস ও লেনিনের কাছে আমার জ্ঞানের ও নৈতিক তৃষ্ণা মিটবার সম্পদ

পাইনি, গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধের দর্শনে আলো পেয়েছি। কিং-ও আইন অমান্য ও বয়কট আন্দোলন করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আলবার্ট জন লুথুলি নাগরিক অধিকার লাভের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ পথে কাজ করেছেন বলে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিং এবং লুথুলী বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধেই অহিংস পথেই সংগ্রাম করেছেন।

সিসিলির গান্ধী ডানিলো ডোলসি মানবতাবাদী ও সমাজবিজ্ঞানী। তিনি দরিদ্র বেকারদের নিয়ে সিসিলিতে কাজ সুরু করেছেন। তিনি অহিংস আদর্শে সমাজের গঠন পুনর্বিন্যাসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ অহিংস নীতির প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ওয়েলদি ফিসার, পিয়ারে সিরোসোল, প্যারিসে আবে পিয়ারে কাজ করছেন। অবশ্য বার্টাণ্ড রাসেল শান্তিপূর্ণ উপায়ে দরিদ্র জাতিদের উন্নতি সম্ভব কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। রেভাঃ মাইকেল স্কটের আণবিক যুদ্ধ ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন উল্লেখ করতে হয়।

হিংসাকে মার্কস 'ইতিহাসের ধাত্রী' বললেও অন্য পথ খোলা থাকলে বিপ্লবী হিংসার পথ সমর্থন করেননি। মার্কাসবাদীরা বিপ্লবের নামে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত ও প্রাণহানি এরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের সমর্থন করেন না। লেনিনও বিপ্লবী হত্যা, রক্তপাত, বোমাবর্ষণ কখনও সমর্থন তো করেনইনি বরং তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। জর্জ সোরেল সন্ত্রাস ও হিংসাতত্ত্বের সমন্বয় করে অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতবাদ চালিয়েছিলেন। তিনি সংসদীয় ব্যবস্থাকে ঘৃণা করেন এবং সাধারণ ধর্মঘটকে শ্রমিকশ্রেণীর ব্রহ্মাস্ত্র বলে মনে করেন। তিনি শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেন এবং সংগ্রামের অনিবার্যভাবে প্রলেটারীয় হিংসা আসবে। কিন্তু মার্কস ও লেনিন উভয়েই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেছেন। তাঁরা হিংস্রাশ্রয়ী ও রক্তাক্ত বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়তিবাদীর মত মেনে নেননি। আবার বর্জনও করেননি। কিন্তু পরবর্তী-কালে মার্কস ও লেনিনকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতবাদকে গ্রহণ করেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজি মানুষের স্থায়ী কল্যাণ চান বলেই হিংসাকে যথাসম্ভব বর্জন করে মানব কল্যাণ বা মানবতাবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

গান্ধীজি তাঁর সত্যের সন্ধানের বইর শেষে বিদায় অধ্যায়ে বলেছেন যে, রাজনীতির আসরে নেমে তাঁকে নানারকম পরীক্ষা করতে হয়েছে, সেগুলির

ওপর তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। তবে এ সব পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। সত্যকে মুখোমুখি চিনতে হলে, সৃষ্টিজগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীকেও নিজের মতই ভালবাসতে হবে। তাই লিখেছেন ঃ 'যে মানুষের মনে এ উচ্চাশা রয়েছে, তিনি আপনাকে জীবনের কোন কর্মক্ষেত্র হতেই সরিয়ে রাখতে পারেন না। ঠিক এ কারণে আমার সত্যানুরাগই আমাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টেনে এনেছে। সামনে আমার এখনো দুর্গম পথ পড়ে রয়েছে। আমার অস্তিত্বকে নিঃশেষে শূন্য করে ফেলতে হবে। অহিংসাই হল নিরভিমানত্বের শেষ সীমা। অহংজ্ঞানের বিলুপ্তি। পাঠকের কাছে বিদায় নেবার সময় এসেছে। তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই আমার সাক্ষী হতে। কায়মনবাক্যে অহিংস ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ বর দিতে সত্যরূপী ঈশ্বরের কাছে আমার এ আকুল প্রার্থনায় সকলকে যোগ দিতে আবেদন করছি'।

মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের ৭ই জুন শেষ রাত্রে উড়িষ্যার ভদ্রকের কাছে গরদপুরে বাঁশবন, আমবাগান আর খেজুরগাছে ভরা আশ্রমে গিয়ে পৌছলাম আর শান্ত গম্ভীর পুণ্য প্রভাদীপ্ত পুরুষের সামনে উপস্থিত হলাম। শিশুর মত নির্মল চোখ, দৃষ্টি সমুদ্রের মত গভীর, চাহনি আকাশের মত উদার, উদাস। প্রাণ জুড়ানো হৃদয় ভরানো কান্তমধুর রূপ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের অংশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় পড়বার পর সঙ্কল্প নিলেন ঃ

> 'ন ত্বং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গ ন পুনর্ভবন।
> কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশম্॥

'আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্মও চাই না, শুধু আর্তের দুঃখ নাশ করতে চাই'—পরমাত্মার কাছে জীবাত্মার এ আত্ম নিবেদন মর্মস্পর্শী, আরক্ত আভায় যে দিকটা রাঙা হয়ে উঠেছিল আবার শুধু সে উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম।

উন্নত জীবনের পথ

মানুষের অন্তর্নিষ্ঠ সত্যতায় গান্ধীজির ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস, আর এ অসামান্য মানবপ্রীতি তাঁর সমস্ত জীবন ও কর্মকে পরিচালিত করেছে। তাঁর সমাজ দর্শনের ভিত্তি হল—সেবা, নির্যাতীত, স্বাধিকার চ্যুত মানুষের সেবা। আর দার্শনিক মূল সূত্র হল—সত্য এবং অহিংসা। অবিরত নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণায় ছিল তাঁর

একাগ্র শিক্ষা। জীবন থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে না রেখে বৃহত্তর সমাজ জীবনের মধ্য দিয়েই তিনি আত্মজীবনের পূর্ণ পরিণতি কামনা করেছিলেন। তিনি বাসনা আর অহমিকার বিবর থেকে মুক্ত হয়ে বিশাল পরার্থপরতায় উন্নীত হয়েছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় তাঁর মনুষ্য জীবন উন্নত এ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এইখানে মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানব-জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।' আর শ্রীশ্রীরামঠাকুর জানিয়েছেন: 'জীবের মুক্ত-দেহ লাভ করিবার জন্যই এ জগতে জীবের ভোগদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্ব স্বরূপকে জানা ; এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরমব্রহ্ম ইনিই নিজের স্ব স্বরূপ। আমি আর পরমব্রহ্ম এক ; মায়ার দরুণ জানতে দেয় না।' গান্ধীজি ভোগ দেহ ধারণ করেই মুক্তদেহ লাভ করেছেন কঠোর সাধনায়। ষড়রিপুকে জয় করে মোহনই মহাত্মাতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

গান্ধীজি তাঁর শক্তির উৎস সম্পর্কে বলেছেন: 'Rationalists are admirable beings, rationalism is a hideous mother when it claims for itself omnipotence. Attribution of omnipotence to reason is a mad piece of idolatry as is worship of stock and stock and store believing it to be God' ; তিনি ১৯৩৪ সালের ৭ই জুন আমাদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন: 'যিনি জানেন না যে তিনি কিছু জানেন না, তিনি জ্ঞানী, এবং যিনি জানেন যে তিনি সব জানেন, তিনি তো ভগবান। আমার ত্রুটি কোথায় আমি জানি। তোমরা ধৈর্য ধর, অনলসভাবে কাজ করে যাও।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'ঈশ্বর নররূপ গ্রহণ করেছেন ; মানুষও আবার ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহ করবে। তাই তোমার নিজের প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে তবে ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আসতে পারে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অপমানিত মনুষ্যত্ব, গিরমিটিয়া, চম্পারণে নীলকরের অত্যাচার, খেরার কৃষকদের উপর করের বোঝা, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নারকীয় লীলা, পঞ্চম জাতি বা হরিজনদের প্রতি অমানুষিক

মা—১২

আচরণ, অস্পৃশ্যতা, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা, আবার নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের প্রতি মুসলমানদের অমানবোচিত ব্যবহার, বিহার দিল্লীতে হিন্দুদের হৃদয়হীন আচরণ—এর সব কিছুর পেছনেই গান্ধীজির মানবপ্রেম হতে উৎসারিত বেদনার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ এ মানুষকেই খুঁজেছিলেন। আর তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন: 'তুমি যে কোন সৎচিন্তা বা সৎকার্য কর, তাহা কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে আর সেই প্রকৃতির অন্তরালস্থ শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন।'

তিনি বারবার সমাজতন্ত্র উচ্চারণ করেননি কিন্তু বারবারই সামাজিক অবিচার উচ্চারণ করেছেন। তাঁর নিজের জীবনের আদর্শ অপরিগ্রহ করেছেন। সমস্ত দরিদ্র মানুষের সাথে একাত্ম হয়েই লজ্জা নিবারণ ও শীততাপ হতে রক্ষা পাবার উপযোগী কটিমাত্র বস্ত্র খণ্ডকে নিজের পোষাক করেছেন। সমাজের দরিদ্রতম মানুষের মতই নিজের খাদ্য গ্রহণ করেছেন এবং রসনা তৃপ্তির জন্য কোন আহার্যই গ্রহণ করেননি। তাঁর মত সংযম ও শৃংখলাবোধসম্পন্ন মানুষ দুর্লভ। তিনি বিড়লার বাড়ীতে যেমন উঠতেন, আবার হরিজন পল্লীতে নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজকে তাঁতী ও কৃষক বলতেন এবং তাহাই পেশা বলে উল্লেখ করতেন। তাঁর আপনপর বড় ছোট, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা, জাতি বর্ণ ধর্মে ভেদ ছিল না। তিনি বলেছেন: 'আমার জীবন লক্ষ্য করুন—আমি কি ভাবে থাকি, কি খাই, কি ভাবে বসি, কি ভাবে কথা বলি, কি আমার চলন বলনের ধরন। এ সব কিছু মিলিয়েই আমার ধর্ম।'

শত শত বৎসরের পরাধীন ও নিষ্পেষিত জাতির অঙ্গে অঙ্গে যে সংস্কার দানা বেঁধে উঠেছিল এবং যে সংস্কারে পঙ্কিলতা পড়েছিল, তার থেকে রেহাই সহজসাধ্য নয়। শুধু বক্তৃতা এবং লেখায় তা দূর হয় না। নীতিকথা শক্ত কাজের বিকল্প নয় এবং উচ্চস্তরের কথায় সুসংস্কার সম্ভব হয় না। সে সব না করারই সামিল হয়, তাই গান্ধীজি হিন্দু মুসলমানের ভিতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার উপবাস করে তার পরমপ্রিয়ের কাছে যেমন আবেদন জানিয়েছেন তেমনি মুসলিমদের সত্যিকার অভিযোগের প্রতিকারের জন্য জিন্না সাহেবের কাছেও বারবার ছুটেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতদিন মুসলমানদের যেমন হিন্দুদের কাছ হতে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিল তেমনি ১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ড বাটোয়ারার সাহায্যে বর্ণ হিন্দুদের কাছ থেকে অন্য হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন করবার

উদ্যোগী হয়েছিল। গান্ধীজি আমরণ অনশন আরম্ভ করেই সে দুর্যোগ হতে জাতিকে বাঁচিয়েছিলেন এবং হরিজন আন্দোলন করে হরিজনদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন।

গান্ধীজি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে যেমন সংগ্রাম করেছিলেন তেমনি সুস্থ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রভাব মুক্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন : জাতিদেহ হতে অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করে হরিজনদের উন্নয়নের জন্য বিড়লার সভাপতিত্বে হরিজন সেবক সঙ্ঘ, ঠক্করবাবার নেতৃত্বে 'আদিবাসী উত্থান সঙ্ঘ' গঠন করে আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাজের ব্যবস্থা করতে কুমারাপ্পার কর্তৃত্বে কুটীর ও পল্লীশিল্প বোর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। জীবনব্যাপী লেখায়, বক্তৃতায়, বিবৃতি ও প্রার্থনায় যে বিশাল গান্ধী সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল, তার পরিচালনের জন্য নবজীবন ট্রাষ্ট হল। চরখা ও খাদি প্রচারের জন্য কৃষ্ণদাস জাজুর পরিচালনায় চরখা সঙ্ঘ করেছিলেন। উৎপাদন ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে নঈ তালিম সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হিন্দুস্থানী প্রচারের আবশ্যকতাবোধ করেন এবং হিন্দী প্রচারণী সভা সৃষ্টি করেছিলেন, এমন কি গোরক্ষার জন্য 'গো সেবক সঙ্ঘ'ও গঠন করেছিলেন। মানবিকতার প্রবল আবেগ বা মাতৃ-এষণার প্রেরণায় সমাজের সেবার জন্য তিনি আরও বহু প্রতিষ্ঠান করেছিলেন।

বাপুজি বৃহৎ শিল্পকে অস্বীকার করেননি। আত্মার মুক্তির প্রয়োজনে দেহের অস্তিত্বও তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তা সত্ত্বেও যেমন দেহ আছে, সমাজজীবনে বৃহৎ শিল্পও তেমনভাবেই থাকবে বলেছেন। কিন্তু সমাজ বা রাজ্যের ভিত্তি শিল্পপ্রধান হবে না, কারণ শিল্প প্রধান হলে মানবসমাজ উৎসন্ন যাবে। তিনি মানবতাভিত্তিক সমাজ চেয়েছেন। এ জন্যই তিনি কৃষি ও কুটীর শিল্পের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। সমাজকে কৃষি ও কুটীর শিল্প ভিত্তিক করা হলে একদিকে যেমন সমাজ জীবন সুস্থ হবে, অন্যদিকে ব্যাপক কর্মব্যবস্থার ফলে সমাজ জীবন হতে উন্মত্ততা উত্তেজনা হ্রাস পাবে। এতে সমাজ সুখী শান্ত সমৃদ্ধ হবে। এর ভিত্তিতে সমাজ রাষ্ট্র গঠিত হলে হিংসা অসদাচার সমাজজীবন হতে উৎখাত হত এবং সে অবস্থায় সাচ্চা গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হয়ে দরিদ্র, দলিত, সর্বহারার স্বার্থ রক্ষিত হত। দগ্ধ যুগের অবসান হত।

অসহায় মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর উদ্যোগের বিরাম ছিল না। গান্ধীজি অসঙ্কোচেই বলেছেন : 'আমার মনের সীমা সঙ্কীর্ণ। আমি সাহিত্য খুব বেশি কিছু পড়িনি ; পৃথিবীরও বেশি কিছু দেখিনি। জীবনে আমি বিশেষ কয়েকটি জিনিষের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছি এবং তার বাইরে আমার আর কোন ঔৎসুক্য নেই'। তিনি আরও বলেছেন : 'মানুষ কতকটা স্ববশ আর কতকটা অবস্থার দাস, কতকটা তার ইচ্ছাশক্তিতে কাজ করে আর কতকটা সে ভাগ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়—এ সমস্ত রহস্য জালে আবৃত হয়ে আছে এবং থাকবে। মানুষের জীবন একটি মাত্র সরলরেখা নয়, তা হচ্ছে কতগুলি কর্তব্যের সমষ্টি—যে কর্তব্য প্রায়শই পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে'।

ভারতের গ্রামগুলি ভারতের হৃদ্‌যন্ত্র, প্রাণকেন্দ্র বলে গান্ধীজি মনে করতেন। এ বোধের উৎস হতেই তিনি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে গ্রামগুলিকে পুষ্ট করবার ব্রত নিয়েছিলেন। মানুষকে শোষণ করে এক শ্রেণীর লোক ধনী হয় এবং শোষণেরই ফলস্বরূপ অসহায় লোকরা দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। একদিন পুরোহিততন্ত্র ধর্মের ধ্বজা ধরে তীর্থ এবং তীর্থসহর গড়ে তুলে গ্রামবাসীদের সহরে নিয়ে এলো ; চতুর লোক তার থেকে সম্পদ কেড়ে নিয়ে পাণ্ডা হয়ে পড়ল। তারপর রাজারা রাজধানী গড়ে তোলে সহর প্রস্তুত করেন। শাসনযন্ত্রের রথ চক্রে বাঁধা লোকরা গ্রাম ছেড়ে সহরে এলো। গ্রামের কৃষকের সম্পদ এনে উজাড় করে দিল। ব্রাহ্মণ বা পুরোহিততন্ত্রের পর ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের পর এলো বৈশ্য। সে এসে নদী খালের পাড়ে গঞ্জ সহর এবং পরে রেল ষ্টেশনকেও কেন্দ্র করে নগর মহানগর গড়ে তুলল। কৃষি ও কুটীর শিল্পের নির্ভরশীল মানুষরা তাদের সম্পদই শুধু এই নগরকেন্দ্রিক বাক্য সর্বস্ব অতি স্বার্থপর ব্যভিচারী বিলাসী লোকদের কল্যাণে ঠেলে দিয়ে গেল না সে নিজেও সর্বনাশে পা বাড়িয়ে দিল। সে নিঃস্ব—সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তির আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নির্মূল প্রায়। নানা দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশও হচ্ছে। আবার পারমাণবিক বোমা হুমকি দিচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদীরাও বলছেন, 'যুদ্ধ অনিবার্য নয়, সশস্ত্র বিপ্লব,

রক্তাক্ত বিপ্লব অনিবার্য নয়, শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব।' শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর সর্বব্যাপী সর্বনাশা ধ্বংসের সামনে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের মত দেশে গণভোট আছে। সংসদ আছে, বিধানসভা আছে। ট্রেড ইউনিয়ন এবং নানা সংগঠন রয়েছে। সংবিধানে বহুবিধ মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত আছে। পশ্চিমের এ গণতন্ত্র প্রথা সম্পর্কে মহাত্মাজি বলছেন : 'Democracy of the West is, in my opinion only socalled. It has germs in it, certainly, of the true type. But it can only come when all violence is eschewed and malpractices disappear. The two go hand is hand. Indeed malpractice is a species of violence. If India is to evobve the true type, there should be no compromise with violence or untruth.' গান্ধীজির কথা সত্য হয়েছে। অর্থ, বিত্তবান কিম্বা বিভ্রান্তিকর শ্লোগান কণ্টকিত ও কণ্ঠাশ্রয়ী বিপুল বিত্তশালী দলের সমর্থিত ব্যক্তি ব্যতিত কোন সৎ, বিবেকবান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবপ্রেমী মানুষের এ সকল রাষ্ট্র পরিচালন যন্ত্র বা সংস্থার স্থানলাভ অসম্ভব বললেই হয়। তাই গান্ধীজি সমাজকে গোড়া থেকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের নির্যাতন

গান্ধীজির আজন্ম সাধনা ছিল এই নিঃস্ব, নিরীহ, নিপীড়িত, নিরহঙ্কার, নিষ্পাপ মানুষদের দুষ্টচক্রের কবল হতে মুক্তিদান। শিল্প দানবের আবির্ভাবে প্রাচীন কৃষিপ্রধান অনুন্নত সমাজ ভেঙ্গে বৃহদাকার শিল্প গঠনের উদ্যোগ এবং বৃহৎ বৃহৎ শিল্পনগর সৃষ্টি এ যুগের বৃহত্তর ঘটনা। এ শিল্প পরিচালকদের রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্রকে আপন কবজিতে রেখে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করবার প্রবণতা রয়েছে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রাভিমুখী করে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে অগ্রসর হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রমোহের যুগে কলপাগলা মানুষকে রক্ষা করবার প্রেরণায় গান্ধীজি বলেছেন : 'Ideally ...I would rule out all machinery, even as I would reject this verybody, which is not helpful to salvation, and seek to absolute liberation of soul.

From that point of view, I would reject all machinery, but machine will remain, because like the body they are inevitable. This body itself is the purest piece of machinism.' গান্ধীজি যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, 'যন্ত্র এসেছে ও থাকবে কিন্তু মানব কল্যাণের জন্যই তাকে থাকতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যন্ত্র মানুষের দাস, মানুষ যন্ত্রের দাস নয়। মানুষ সবার উপরে, তার বিকাশই চরম লক্ষ্য—যন্ত্রের জয়গান নয়।

আধুনিক সমাজ কুসংস্কার ও জড়তা হতে কিছুটা মুক্ত হয়েছে কিন্তু হৃদয়হীন নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের অবিচারের শিকার হয়েছে। গান্ধীজি মানুষের প্রতি হৃদয়হীনতা ও অবিচারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন। আজ দেশে দেশে মানবতাবিরোধী হৃদয়হীন শক্তির বিরুদ্ধে তরুণদের যে বিদ্রোহ চলেছে তাতে গান্ধী ভাবনার অসঙ্গতি নেই। কিন্তু এ তরুণের বিদ্রোহকে সুস্থ ও সবলপথে পরিচালিত করা না হলে তারা মানব কল্যাণকে ঠেকিয়ে দেবে। মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়হীন আচরণ, স্বার্থসন্ধ ব্যক্তিদের প্রতারণা, অতি লোভীদের অমানুষিকতা দেশে দেশে অবিশ্বাস অনাচারের ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছে। আকাশ পরিষ্কার করার জন্য মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কিন্তু সুস্থ নেতৃত্ব আজও অস্পষ্ট। সর্বহারা মানুষের কল্যাণের নাম করে তাদের ভাঁওতা দেবার জন্য যারা ঘুরছে তারা মানুষের এ অন্তর্জ্বালাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ নিচ্ছে। তাই মানুষের এ বেদনা যাতে কল্যাণের কাজে প্রবাহিত হয় তাহাই দেখতে হবে।

গান্ধীজি গ্রাম প্রধান দেশে তথা ভারতে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন এবং কৃষির উন্নতি ও কুটীর শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতা কেন্দ্রাভিমুখী করবার প্রবণতা রোধ করতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন: 'Just as the cult of patriotism teaches us that the individual has to die for the village, the village for the district, the district for the country, even so a country has to be free inorder that it may die, if necessary, for the benefit of the world. My love, therefore, of a nationalism or my idea of nationalism is that my country may die so that the human race may live.'

কোন রাষ্ট্রে বিশেষ শ্রেণী কিম্বা অধিক সংখ্যক লোকের কল্যাণের জন্য অল্প সংখ্যক লোককে উপেক্ষা করার আদর্শ গ্রহণ করা হয়। গান্ধীজির দৃষ্টিতে কেহই উপেক্ষিত নয়। কোন লোকই মানবতার আদর্শ হতে বিচ্যুত হবে না। এই তাঁর আদর্শ। সে আদর্শের দিক হতেই তিনি শিল্প প্রসার কিম্বা যন্ত্রের কথা ভেবেছেন। তিনি বলেছেন: 'What I object to is craze for machinary, not machines as such. The craze is for what then call labour-saving machinery. Man go on 'saving labour' till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation. I want to save time and labour, not for a fraction of mankind but for all. I want the concentration of wealh not in the hands of a few, but in the hands of all. Today machinery marely helps a few, to ride on the backs of millions. The impetus behind it is not the philanthropy to save labour, but greed. It is against this constitution of things that I am fighting with all my might.'

তিনি আরও বলেছেন: 'যন্ত্রশিল্পের প্রসার মনুষ্য জাতির পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে—এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির শোষণ চিরকাল চলবে না। বৃহৎ যন্ত্রে মানুষের শ্রম লাঘবের প্রেরণা নেই, আছে লোভের প্রজ্বলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে বলেছেন: 'ওরা যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণা-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে—মানুষ বলি চায়। দেবতাকে ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে'।

সমাজসেবীর পথ

গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে, কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যারা সমাজসেবা করবে তাদেরই স্থান সমাজ ও রাষ্ট্রের শীর্ষে হবে। কেউ কারো উপর চেপে বসে থাকতে পারবে না। অন্যের পরিশ্রমের উপর যারা জীবনধারণ করে তিনি তাদের চোর মনে করেন। শোষণমূলক এ সমাজকে শোষণহীন সমাজে রূপান্তরিত করতে তিনি অহিংস অসহযোগের পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে নতুন ইতিহাস তৈরী করতে বলেছেন। পূর্বাচার্যেরা যা রেখে গিয়েছেন, তাকে বাড়িয়ে তুললে মানব সভ্যতার অগ্রগতি মিলবে বলেছেন। তিনি সত্যাগ্রহ করে, সত্যাগ্রহী ও প্রতিপক্ষকে রূপান্তরিত করে সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি শিল্পকেন্দ্রিক নগর সভ্যতাকে পল্লীমুখী করতে চেয়েছেন নির্যাতিত মানবতার দিকে চেয়ে। তিনি জানতেন, চারদিকে যখন অস্ত্রের ঝনঝনা, সমস্ত আইনই তখন বোবা হয়ে যায়; আর সর্বহারারাই বেশী নির্যাতিত হয়। সেই পল্লীকেন্দ্রিক সভ্যতা আত্মতুষ্ট, পরস্পরের সহিত প্রেমাবদ্ধ, স্বয়ম্ভর। লুব্ধ মানুষের পীড়ন বন্ধের সুযোগ থাকে। শিল্পকেন্দ্রিক নগরসভ্যতা সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে থাকে; তবে সে ফাঁকি একদিন নিজকেই বিঁধবে।

অবশ্য চীনের নেতা মাও সে-তুং অসন্তুষ্ট কৃষকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নগর সভ্যতাকে আঘাত করতে চেয়েছেন। গান্ধীজি গ্রামে গ্রামে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েত মারফত নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সুস্থ সমাজের পথ দেখিয়েছেন। মাও সে-তুং গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র ফৌজ গঠন করে তাদের সাহায্যে ক্ষমতার কেন্দ্র নগরকে অবরোধ করতে বলেছেন। অহিংস পথে তালিম প্রাপ্ত গ্রাম্যফৌজ যদি নগরকে পরাজিত করে শক্তি গ্রহণ করে, সে অবস্থায়ও অত্যাচারের যন্ত্র হতে সাধারণ মানুষ রক্ষা যে পাবে তার নিশ্চয়তা মিলছে না। হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের অবসান হবে না—এ ছিল গান্ধীজির দৃঢ় বিশ্বাস। তাই একদিকে অন্যায়ের সাথে অসহযোগ করে অন্যায়কারীকে মানসিক দিক হতে শক্তিহীন করে তুলতে বলেছেন এবং অপর দিকে গঠনমূলক কাজ করে মানুষকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন।

গান্ধীজি সুস্থ সমাজ বা প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য নিয়মশৃঙ্খলার উপর জোর দিতেন। তিনি Civil disobedience আন্দোলনের জনক। কিন্তু একে শিষ্ট আইন অমান্যই বলতে চেয়েছেন। কারণ, সরকারের নীতিহীন পীড়নমূলক আইনকে অমান্য করতেই বলেছেন। কোন অবস্থাতেই সমাজবিরোধী—চুরি, ডাকাতি খুন জখম রাহাজানি সম্পর্কিত আইন অমান্য করতে বলেননি। এইজন্য আইন অমান্যকারী হতে নৈতিক শক্তিসম্পন্ন সত্যাগ্রহীদের কথাই বলেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই হবে। তিনি বলেছেন: 'দোষ স্বীকার করা

সমার্জনী ব্যবহার করার মত। এতে মনের নোংরা ময়লা দূর হয় এবং মন মার্জিত ও পবিত্র হয়।' ভগবানও মার্জনা করেন, ক্ষমা করেন না মেজে নেন।

তিনি বলেছেন : 'To me political power is not an end, but one of the means enabling people to better their condition in every department of life. Political power means capacity to regulate national life through national representatives. If national life become so perfect to become self-regulated, no representatives become necessary. There is then a state of enlighted anarchy. In such a state everyone is his own ruler. He rules himself in such a manner that he is never a hinderance to his neighbour. In the ideal state, therefore, there is no political power because there is no state. But the ideal is never fully realised in life. Hence the classical statement of Thoreau, that Government is best which governs the least'.

রাসকিনের 'আনটু দিস লাষ্ট' গান্ধীজির জীবনে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। তিনি এই বইয়ের গুজরাটি অনুবাদ করেন এবং বইখানার নাম রাখেন—'সর্বোদয়'। এই বইখানিই বাপুজির গঠনমূলক কাজের প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'সর্বোদয়' আন্দোলনের রূপ ধরেছে এবং মানব সভ্যতায় সর্বোদয় আন্দোলন এক বিরাট অবদান হয়ে থাকবে। গান্ধীজির মত সব্যসাচী ইতিহাসে কদাচিৎ মিলে। তিনি মানুষের কল্যাণেই নৈরাজ্যের ভাবনা এনেছিলেন। মানুষের চরিত্রের সর্বদিক হতে মহত্ত্বের প্রকাশ হলে কোন মানুষের সাথে কোন মানুষেরই দ্বন্দ্ব থাকবে না। মানুষের মন সঙ্কুচিত হয়ে এলেই দ্বন্দ্ব আসে ; হিংসা বিদ্বেষ সমাজকে গ্রাস করে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র মানুষকে পীড়া দিয়ে থাকে। সে অবস্থাতেই ক্ষমতা ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয়ের কবলে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথও এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন : 'ডিক্টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি জানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখছি। সেটা হল শিক্ষা—জবরদস্তির একেবারেই উল্টো।' যখনই মানুষের বুদ্ধি ভোঁতা

হয়ে পড়ে তখনই মানুষ অনুদার হয়ে পড়ে। কল্যাণবিমুখ হলেই বুদ্ধি ভোঁতা হয়, বুদ্ধিভ্রংশ হয়।

মানবাত্মার মুক্তি

গান্ধীজির চিন্তায় মানবাত্মার মুক্তি রয়েছে বলেই তিনি মানুষকে সসম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন। মানুষের সকল মহত্ত্বের প্রকাশ চেয়েছেন বলেই সর্বোদয়ের কল্পনা। সকল নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যেই তাঁর নৈরাজ্যবাদের চিন্তাই পরিণত। তিনি মানুষকে 'অভয়' মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাকে স্বয়ম্ভর, অন্যনিরপেক্ষ করেছেন। দুর্বলকে সবল, কাপুরুষকে সাহসী, অধমকে উত্তম এবং ভীরুকে বীরে রূপান্তরিত করেছেন। মানবসভ্যতার চিন্তার ভাণ্ডারে তাঁর এই মহৎ দান আজ স্বীকৃতি লাভ করছে। তিনি মানুষকে ভয়ের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ব্যক্তির জীবনে স্বরাজের সন্ধান দিয়েছেন। এ স্বরাজ সমষ্টি বা জাতি বা দেশের স্বরাজ অপেক্ষাও শক্তিশালী। এর জোরে মানুষ জড় জগতের অংশ হয়ে তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যাবার শক্তি লাভ করে। গান্ধীজি বলছেন, 'It is swaraj when learn to rule ourselves. Such swaraj has to be experienced by each one for himself.' তাঁর সমষ্টি বা জাতির স্বরাজ সম্পর্কেও ধারণা : 'My notion of Purna swaraj is not isolated independence but healthy and dignified independence. My nationalism, fierce though it is, is not exclusive, is not designed to harm any nation or individual.' শাসনযন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন : 'Self-government means continuous effort to be independent of Government control whether it is foreign or it is national.'

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা গঠনমূলক কাজে অথবা সমাজে কুসংস্কার মুক্ত করার ব্রতে কিম্বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাধনার সর্বক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে গান্ধীজির মানবপ্রীতি। এ মানবপ্রীতির উৎস মাতৃ-এষণায়। যিশুও রাজনীতির যুগ-ধর্মে জড়িত হতে চাননি, তাঁর বাণী : 'আমার রাজ্য অপার্থিব, ইহজগতের সামগ্রী নয়'। কিন্তু গান্ধীজি নরনারায়ণকে ফেলে ভগবান খুঁজতে হিমালয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবনের অবিচ্ছিন্ন একাত্মবোধের প্রেরণায় চলেছিলেন। অতীত ও

বর্তমানের কল্যাণ কর্মের সঙ্গে সমপ্রাণতা, সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে যে অনাদি জীবন আজও সম্প্রীতি, প্রেম ও সৌন্দর্যের সূত্র বয়ন করে চলেছে তার সঙ্গে অনন্ত সংযোগ, সূক্ষ্ম একাত্ময়—এই তো ছিল গান্ধীজির উপলব্ধির স্বরূপ। তাইতো তিনি বলতে পেরেছেন, 'If love was not the law of life, life would not have persisted in the midst of death. Life is a perpetual triumph over the grave. If there is a fundamental distinction between man and beast, it is former's progressive recognition of the law and its application in practice to his own personal life'.

আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় স্নেহ প্রেম প্রীতিই ছিল মূল উপাদান। সে পরিবার সে সমাজ ভেঙ্গে যেতেছে। আত্মীয়তা বোধ ও ত্যাগের ভিত্তি ছিল এ পরিবার ও সমাজের শক্তি। আচার ও অধিকার দিয়ে এ বোধকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। মায়ের ধর্ম বলেই মা সন্তানকে ভালবাসেন, অধিকার বলে নয়। সমাজ ভিত্তির মূলেও ছিল এ প্রবণতা। এর পিছনে যে নীতিবোধ ছিল শিল্প প্রাধান্যের যুগের সমাজ জীবনে আত্মীয় ও বিচিত্র রুচির মানুষ রয়েছে বলে প্রাচীন নীতি বোধের সঙ্গে আধুনিক নীতিবোধের মৌল পার্থক্য এসে গিয়েছে। আচারই দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব জানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রাচীন আচারের স্থানে নতুন আচার এখনও আসেনি বলে দায়িত্বহীনতার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এতে কর্তব্যে অবহেলা, দুর্নীতি, মাদকের নেশার মত অলসতাও এসে যাচ্ছে। আমরা মানুষের অধিকারও খুবই কম বুঝি। দয়া বা ভয় বুঝি। দরকার হলে হাত পাতি আবার মারমুখো হয়ে উঠি। কৃপা বুঝি বা পায়ে লুটিয়ে পড়ি। ঝামেলা মুক্ত থাকবার জন্যই কৃপা বুঝি, না হয় বিনয়ী সাজি। এতে ব্যক্তি চরিত্রে ও জাতীয় চরিত্রে মেরুদণ্ডের অভাবই সূচিত হয়। সমাজজীবনে যখন নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হয়ে আসে তখন মানুষের লজ্জা সঙ্কোচের বোধও ভোঁতা হয়ে যায়।

মানবধর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব বোধ

গান্ধীজি ব্যক্তি ও জাতিকে এ দৈন্য হতে মুক্ত করে মেরুদণ্ডকে সোজা করে দাঁড় করাবার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা মহৎ ব্যক্তিদের জীবনমন্থন ধন ও

মানুষের মাহাত্ম্যের বাণী হৃদয়ের এককোঠায় রাখি আর এক কোঠায় প্রাচীন সংস্কারকে লালন করি। এদের সহ অবস্থান চলে যুক্তিবাদী চিন্তার দৈন্যের জন্য। জীবন দর্শন ও জীবন চর্যায় এ অভাবই এ প্রগতিশীলতার বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং এজন্যই জাতীয় সংহতি দানা বাঁধেনি। গান্ধীজি অবহেলিত, অপমানিত মানুষের বেদনায় ছিলেন বেদনাবিধুর। তাই তাঁর হরিজন আন্দোলন। তিনি সমাজের এই অবজ্ঞাত মানুষদের ভগবানের সান্নিধ্য খুঁজেই তো তাদের হরির জন বলেছেন এবং তাদের আর্থিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য কাজ গিয়েছেন। হিন্দু সমাজেরই এক অংশ একদিন মুসলমান বা পরবর্তীকালে খৃষ্টান হয়েছিল। মানুষের অবিচার এবং শাসকশ্রেণীর প্রলোভন কিম্বা কোন কোন ক্ষেত্রে আউল বাউল ফকিরদের প্রভাবই এদের হিন্দুদের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। মুসলমানরা সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ স্নেহপ্রবণ শ্রদ্ধাশীল কিন্তু ধর্মত্যাগী বলে হিন্দুদের তাদের প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অবজ্ঞার ভাব দানা বেঁধে উঠেছে।

মুসলমানদের অনিষ্ট হয়েছে হিন্দুরা কিছুটা আত্মরক্ষা করতে পারলেও তাদের জীবনকেও ভণ্ডামি, দৃষ্টিহীনতা ও বিকৃতিতে পঙ্গু করেছে। হিন্দুর দর্শন সাহিত্য ঐতিহ্য সৃজনশীল বলে মহৎ ও বৃহৎ জীবনকে আলো দিয়েছে। কিন্তু বিরাট সমাজকে সমগ্রভাবে অন্ধকারের গহ্বর হতে তুলতে পারেনি, কুসংস্কার হতে মুক্ত করে বলিষ্ঠ করতে পারেনি। অবশ্য আধুনিককালে আধ্যাত্মিক জগতের এক মহাসাধক বলেছেন যে, হীনতা জয় করতে না পারলে হিন্দু হয় না, আর ইমানকে মুছে ফেললে মুসলমান থাকে না। যন্ত্রণায় কাতর মানুষের আর্তনাদে গান্ধীজি চঞ্চল হতেন। তাই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় সাদা চেক দিতে চেয়েছেন। অস্পৃশ্য, অচ্ছ্যুত বলে পরিচিত দলিত নির্যাতিত মানুষ গোষ্ঠিকে হরির জন বলে গ্রহণ করে দেবতার আসন দিয়েছেন এবং নিজে দেবতা বলে জেনেছেন, মেনেছেন। নারীকে সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রগতিশীল বর্ণ হিন্দুর অবচেতন মনে অস্পৃশ্যতাবোধের অস্তিত্ব খৃষ্টান মুসলমান বা অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হিন্দুদের ব্যবহারও অস্পৃশ্যতা বোধ হতে মুক্ত নয়। এদের বোধে একটা অপবিত্রতার ভাব রয়েছে। এমনকি এদের প্রতি স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধার ভাবও যাঁরা পোষণ করেন তাঁরাও অপবিত্রতার সূক্ষ্ম অনুভূতি হতে মুক্ত নন। এটা একটা গুরুতর সমস্যা তা স্বীকার করতেও তাদের মনের জড়তা থাকে। আমাদের সকলের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বে মহাপ্রাণের বা ভগবানের

অস্তিত্বের কথা মুখে আওড়াই কিন্তু তথাকথিত নিচ জাতিদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে মনের সাড়া নেই। সাম্যের কথা মুখে বলি কিন্তু আচার ও ব্যবহারের অসাম্যে আমাদের বিবেক পীড়িত হয় না। অস্পৃশ্যতা বা অপবিত্রতাবোধ কর্মভেদ হতেই এসেছে। স্পর্শদোষ দুষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র, অস্পৃশ্য; তা হতে জাতিভেদ, আর এ জাতিভেদ জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক। ভারতবর্ষ এর যে অগ্নিমূল্য দিয়েছে তা প্রাণঘাতী। আরও বহু মূল্য দিতে হবে আমাদের বহু যত্নে লালিত কুসংস্কারের জন্য এবং আমাদের হৃদয়হীন আচরণের প্রায়শ্চিত্ত গান্ধীজিকে করতে হয়েছিল। তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্মের কাছে মানবধর্মের পরাজয় স্বীকার করেননি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান—দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরই আলো হয়; নিজের ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্যের আলোর ন্যায়, সে আলোতে ঘরের ভিতর বাইর সব দেখা যায়।' এ সর্বত্যাগী মহামানব সর্বমানবের কল্যাণ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বলেই জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন।

সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিব যুক্ত। সত্য ও সুন্দরের সাধক জ্ঞানী ও শিল্পী বলে ধ্যানী মানুষ। আর ধ্যানী মানুষ কল্যাণ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্মমার্গে বিচরণ করেন। এরা দুর্ভাগা মানুষের বেদনায় ক্লিষ্ট বলে তাদের স্থায়ী সুখ স্বাচ্ছন্দের সন্ধানে থাকেন। এ দুঃস্থদের আত্মীয় বলে জেনেই অসম্পূর্ণতাবোধে কষ্ট পান। আইনষ্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, এমিবার মত এককোষী জীব কিম্বা তারও অতীতে ভাইরাস-কণা থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রাণধারায় ক্রমবিবর্তনবাদ—পরমাণুতত্ত্ব বোধগম্যতার স্বাদে শুধু বুদ্ধিকেও নয়, এক রহস্যালোককে উদ্ভাসিত করে। একেই বলে—সত্য এবং হৃদয় দিয়ে অনুভবে যখন পাই তখন হয় সুন্দর। খণ্ড খণ্ড সত্য ও সুন্দর দিয়ে পরম সত্য এবং পরম সুন্দরকে লাভ করে শিবত্ব লাভ হয়। সেই অবস্থায় অন্তরে প্রেমের দেবতার আবির্ভাব হয়। মাতৃ-এষণায় মানুষকে সত্য সুন্দর ও শিবের সন্ধান দিয়ে সৌন্দর্য প্রাচুর্য ও মাধুর্যে ভরে দিতে চায় এবং মানবতাবোধকে প্রোজ্জ্বল করে তুলতে চায়। বাপু অন্ধকার ঘরে আলো জেলেছিলেন।

গান্ধীজি প্রত্যয়ের সুরে বলেছেন: "প্রতি মানুষের মধ্যে আমি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে চাই। কারণ আমি জানি, ঈশ্বর স্বর্গেও নেই, পাতালেও

নেই, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন।" তাইতো তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ হরিজন, পার্শী শিখ, ইহুদী খৃষ্টানে ভেদাভেদ ছিল না। মানুষের ক্রন্দনরোলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। দেশ, ধর্ম, সম্প্রদায় পীড়িতের নামে প্রতারকের পায়ে পিষ্ট মানুষের দুরবস্থা, ক্ষুধার্ত শিশু, উৎপীড়কের শিকার, স্বৈরাচারীর ব্যভিচার, পরিবারের ভার বহনে অক্ষম অসহায় বৃদ্ধের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য, নির্যাতিত নারীর অমর্যাদা, বেদনাক্লিষ্ট এ জগৎ তাঁকে পীড়িত করেছে। এ অশুভকে দূর করতেই তিনি আজীবন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি তাঁর প্রবল অনুকম্পা বেগবতী নদীর মতই প্রবাহিত হয়েছে। আর শেষদিনে পীড়িত মানুষের অন্তরকে শান্ত করার জন্য প্রার্থনা সভায় বসেছেন। আর গেয়েছেন: 'ঈশ্বর আল্লা তেরি নাম সবকো সম্মতি দে ভগবান।'

দেশ ব্যবচ্ছেদ করে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান হয়েছে এবং দেশ আজ উপমহাদেশে, আর ভারতবর্ষের প্রদেশ আজ ভারতে রাজ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ এক অখণ্ড সত্তা,—ভৌগোলিক ঐতিহাসিক আর অর্থনৈতিক অস্তিত্বই নয় আধ্যাত্মিক ঐক্য বিধৃত এক মহা সত্য। ভারতের এক প্রান্তের সন্তান আর এক প্রত্যন্ত প্রদেশের সন্তানের সহিত রংয়ে রসে রক্তে মনে মেজাজে মেধায় শুধু এক নয় আত্মীয়—আত্মার আপনজন। তারা লুব্ধ মানুষের বলি। ক্ষমতামাতাল অর্থলোলুপ মানুষ জনগণের নাম করে এদের দিয়ে যূপকাষ্ঠ তৈরী করে সেখানেই এদের বলি দেয় দেশহিত, মানবপ্রেমের নামে। কাপালিক এদের রক্ত পান করে বিকট হাস্যে বিচরণ করে। তারা কখনও সম্প্রদায়প্রেমী, কখনও সর্বহারা প্রেমী, কখনও ভাষাপ্রেমী, কখনও অঞ্চলপ্রেমী। এ মৃত বিবেক মানুষের মত্ততার মহোৎসবে আজ বিশাল ভারতের তথা অখণ্ড সত্তায় বিধৃত ভারতবর্ষের অসহায় মানুষের নরবলি চলছে। এক বিরাট পুরুষের অন্তর্ধানের পর জলকল্লোলের উত্তাল মাতাল আলোড়নে মানুষ আজ দিশেহারা। প্রলয়ের ডাক এসেছে। প্লাবন নেমে যাবে; উষার পূর্বক্ষণের গাঢ় অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়। আজকের এ অবস্থা মানুষের ইতিহাসের শেষ কথা নয়—শেষ কথা হতে পারে না।

সমাজকে দেশকে জাতিকে সংহত করবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, কর্মে চিন্তায়, বৈরাগ্যে বিনয়ে, চরিত্র মহিমায় সর্বজন ব্যক্তি খুঁজেছেন। "একটি লোককে আশ্রয় করে আমাদের সমস্ত সমাজকে এক জায়গায় আপন

হৃদয়ে স্থাপন, আপন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখি না'। মহাকবির দৃষ্টিতে দেশে দুর্দৈবের আশঙ্কা জেগেছিল। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোক এক হতে পারলেই অসাধ্য সাধন হয়। দেশঅন্তপ্রাণ নেতার আবির্ভাব না হলে দেশ প্রাণান্ত হয়। 'ইচ্ছা হয়ে জন্মেছিলি মনের মাঝারে'। নেতা জনগণ-মন অধিনায়ক। ভারতের সৌভাগ্য মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেই সেই মহানায়কের সন্ধান মিলেছিল। এতে দেশ নবজন্ম লাভ করেছিল। হেনরী ডেভিড থোরো বলেছেন: 'স্বর্ণযুগের জন্য আক্ষেপ করা আসলে সোনার মত নির্মল ও উজ্জ্বল চরিত্রের মানুষের জন্য আক্ষেপ করার নামান্তর মাত্র'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ এবং মহাত্মা গান্ধীর মহান নেতৃত্ব ভারতের ইতিহাসের তেমনি এক স্বর্ণযুগ। তেমনি চরিত্রের এক মহামানবের আবির্ভাব ভারতের আকাশ বাতাসকে পবিত্র করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষ আজ তেমনি এক মহামানব—মহানায়কের আবির্ভাবের অপেক্ষায়।

মানুষের দৈহিক বিকাশ চরমে পৌঁচেছে। আজ মানুষ তার মানসিক ও আত্মিক প্রকাশের দিকে ছুটবে এটাই বিশ্ব বিধানে রয়েছে। এই পথেরই মহাপথিক গান্ধী আগামীদিনের মানুষের পথ দ্রষ্টা। সত্যদ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টি পরিধি বিশাল বলে তাঁরা মানুষের অনুভূতি শক্তির পরিমাপ যাচাই করেন। প্রতিটি মানুষের মানসিক পরিবর্তন উন্নতি ও উজ্জীবনের সম্ভাবনার খোঁজ রাখেন। তাই তাঁরা ইঙ্গিতময় বাণী, সঙ্কেতভরা আহ্বান, গূঢ় দৃষ্টান্তের সূক্ষ্ম আবেদন দিয়ে মানুষের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলেন। তাই তো 'সত্য ও অহিংসার' শব্দ মন্ত্রে চৈতন্যের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। এ শক্তিতেই মানুষের শক্তি রয়েছে। চীনদেশের মনীষী লিন্ ইউ টাং বলেছেন: 'আত্মশক্তির বিপুল সত্যবেদ গান্ধীজির স্বরচিত জীবনভাষ্যকে এতখানি অর্থ গৌরব আর ঋজু মর্যাদায় মণ্ডিত করেছিল, আদি এবং অকৃত্রিম দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল যে, অনাগত কালের অগণিত মানুষ এই অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর তার অপরূপ দ্যোতনার কথা হতবাক বিস্ময়ে বহু—বহুদিন ধরে কেবলই চিন্তা করতে থাকবে'। তিনি আরও বলেছেন—'গান্ধী হলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় অঘটন-ঘটন। এ ব্যাপার একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব আর কোথাও নয়। চীন দেশেও নয়, প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অন্য কোথাও হতে পারে না। তিনি আধুনিক যুগের মহর্ষি'।

আকাশ নীল, পর্বত নীল, সমুদ্র নীল, সাধকের চক্ষু নীল, শিশুর নয়ন নীল—সব বিরাট বিশাল নীল। এ নীলে এক অপরাজেয় শক্তি। সে শক্তি হৃদয় হরণ শক্তি। এরা যে প্রবল তা বল দিয়ে নয়। বলকে বিসর্জন দিয়েই পরকে জয় করে। মৃত্যুহীনের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। অভাবের দিক হতে ডালশাখা মেলে বিশাল। কিন্তু ভাবের দিক হতে ক্ষুদ্র বীজ। মানুষের চিত্তের গভীরে সহজ জীবনের অমৃত উৎস আছে। মানুষের শক্তি আছে, উপলব্ধি নেই। এ যেন ডালপালায় ঝাঁকড়ামাকড়া গাছে ফল নেই। বাপুজি ফলের সন্ধান করেছেন। তিনি খুঁজলেন সৌন্দর্যের সুর, আনন্দের সঙ্গীত—আকাশ ও আলোকের অনির্বচনীয়তার স্তবগান—বিরাট প্রাণসমুদ্রের লহরী লীলার কলস্বর, চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে ফুলের ফলের সমারোহে সংসার সংগ্রামে মানুষের জয়লাভ। সমস্ত কোলাহল জলকল্লোলের মধ্যে নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতার আহ্বানের পর প্রাণের আহ্বানে—প্রাণের উপলব্ধিতে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ। জীবনের সমস্ত গ্রন্থিমোচনের কি আগ্রহ কি উদ্যোগ ; মনকে সহজ করে প্রকৃতিকে স্বচ্ছ করে পরম সত্যকে বাধামুক্ত করবার কি ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম। 'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় ; সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালবেসেছিলাম'। সত্যের সে দক্ষিণ মুখকে স্পষ্ট করে নিরন্তর দেখার ব্যবস্থা করে চিরকালের মত রক্ষা পাবার কি উদ্যম! গান্ধীজি সর্বমানবের জন্য যে কল্যাণ চিহ্ন রেখেছেন তাকে চিরকাল ধরে রাখবার তপস্যাই মানুষ জাতির দায়।

মহাত্মা ও ভারতীয় সাধনা

ভারতের ঋষিরা যুগ যুগান্তর ধরে জড়বাদের ঊর্ধ্বে মানুষের অধ্যাত্ম চেতনাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁরা জেনেছেন, জড়বিজ্ঞান বাষ্প, বিদ্যুৎ, পরমাণু প্রভৃতি বাহ্য প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে ; কিছুটা সেভাবেই মানুষ তার আভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তিকে নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা বা সাধনা করে মানুষের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করেছে। আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার পথে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে, সুসংযত অবস্থা আয়ত্ত করে নতুন শক্তি ও জ্ঞানলাভ সম্ভব। গান্ধীজি সুশৃঙ্খল ও সংযত জীবন আয়ত্ত করেছেন, আর করেছেন 'রাম' নাম। এ নামের সহিত সর্বদা থাকবার জন্যে এসে যায় অবতার শক্তি। এ শক্তির সঙ্গ করেছেন—শয়নে, স্বপনে ভোজনে, দানে—সকল কর্ম উপাসনায়। তিনি বলেছেন ঃ 'আমার বিচার বুদ্ধি ও অন্তর দিয়ে সত্যই যে ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপ ও নাম—তাহা বহু পূর্বে উপলব্ধি করলেও এখন সত্যকে 'রাম' নামের ভিতর দিয়ে অনুভব করছি। আমার জীবনের ঘোরতর পরীক্ষার মূহুর্তে এই একমাত্র 'নাম' আমাকে রক্ষা করছে ও আজও রক্ষা করেছে। ইহা আমার শৈশবের সংস্কার হতে পারে, অথবা তুলসীদাস আমার মনে যে অনুরাগ সৃষ্টি করেছে তাও হতে পারে। তবে 'রাম' নামে আমার বিশ্বাস চিরদিন ছিল। 'সকল অবস্থাতেই এ 'রাম' নাম সঙ্গে রেখেছেন, 'রাম'কে জাগিয়েছেন। তাতে তাঁর মন প্রাণের সঙ্গী হয়েছিল বলেই তিনি এক মহাশক্তি লাভ করেছেন। ভারতে এ পথ নতুন নয়, পুরাতন, চিরপরিচিত পথ। এ পথেই গান্ধীজি আজীবন চলেছেন। নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন বলেও তাঁর দাবী নেই।

তাই তো মহামানব গান্ধীর কণ্ঠে শুনি—'There is no such thing as 'Gandhism' and I do not want to have any sect after me. I do not claim to have originated any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems....I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. All I have done is to try my

experiments in both on as vast a scale as I could do.' গান্ধীজি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনের সম্পর্কে জীবব্যাপী সাধনা করেছেন। তিনি মানবীয় জীবনধারণকে রিক্ত করে বাইরে মৃত্যুর মূল্য দিয়ে অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা চাননি। আবার বহিরঙ্গের দিকে ফিরে জীবনকে জয় করে ভগবানকে হারাতেও চাননি। এ সামঞ্জস্যের পথ তিনি ভারতীয় সাধনাতে পেয়েছেন।

মাহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবন শুভ্র, জ্যোতির্ময়, সুষমামণ্ডিত। তিনি আশক্তিপরায়ণ জীব নন, ঈশ্বর কোটী মানুষ। তাই এক বিরাট জীবনের ছায়ারূপে যাঁকে দেখেছি, তিনিও রামায়ণের লক্ষণের সহধর্মিনী উর্মিলার মতো আড়ালে থেকে এক মহামানবের শুধু সহধর্মিনীই হননি, সহকর্মিনীও হয়েছিলেন। সবরমতী আশ্রম পরিচালনে কোন আত্মীয়ের সামান্য অর্থ নিজের শিশু পৌত্রদের খেলনা ও খাবারের জন্য রাখলে মহাত্মাজি সহধর্মিনীকে শুধু চোরই বলেননি, আশ্রম ভেঙ্গে দিতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ মহীয়ষী নারী স্বামীর মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধিতে তাঁর অনুগমন করেছিলেন, তাঁর শরণ নিয়েছিলেন। গান্ধীজি বলেছেন: 'নারী আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি, পুরুষের উপর নারীর কি বিপুল প্রভাব, আজ নারীদের তা বুঝবার ক্ষমতা নেই। টলষ্টয় বলতেন, পুরুষের সম্মোহন প্রভাবে নারী চলে। যদি তারা অহিংসার শক্তি উপলব্ধি করত, তবে তারা অবলা হোত না'। মাতা কস্তুরবা গান্ধীজির মত বিরাট পুরুষের জীবনে বোঝা হননি, বরং গান্ধীজিকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে চলতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বিরাট পুরুষের সাথে চলেছিলেন বলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অপ্রকাশিত ছিল না। আতিথ্যের স্বাভাবিক দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন ভরপুর। অপর্যাপ্ত মাতৃভাব এ মৌনমুখী মহিলার হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর সান্নিধ্যের স্নিগ্ধতায় সকলকে অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রাচুর্য দূর ও নিকটের সকলকে আপন করে নিত। তাঁর মধ্যে মাতৃভাবের এক বিরাট ও মুক্তস্বরূপ দেখা গিয়েছে। কস্তুরবার পাতিব্রত্যের পরিধিও সঙ্কীর্ণ ছিল না। তিনি মহান স্বামীর সেবার সঙ্গে মানবসেবা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন তো করেনইনি বরং আনন্দের সঙ্গে তা বহন করেছেন। এ কর্মকুশলতার সঙ্গে সহৃদয়তার সম্মেলনে নারীত্বের আদর্শকেও উজ্জ্বল করেছিলেন। গান্ধীজির সহধর্মিনী বা ধর্মসঙ্গিনী হয়ে নারীত্বকে গৌরবান্বিত করেছেন।

গান্ধীজি কারও কাছে মহাত্মা গান্ধী, কারও কাছে মহাত্মাজি, কারও কাছে বাপু, বাপুজি। তবে তাঁর কালের মানুষদের কাছে মহাত্মা গান্ধী নামেই পরিচিত ছিলেন। অতি ঘনিষ্ঠ লোকরা বাপু বা বাপুজি ডাকতেন। অন্যরা গান্ধীজি ডাকতেও সঙ্কোচ করতেন। নামের সঙ্গে মহাত্মা না বললে নিজকে অপরাধী মনে করতেন। তিনি দেবতার স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশাল বন্দীশালা হতে ভারতকে মুক্ত করেছেন। ভারতকে মুক্ত করে এশিয়ায় এক বিরাট জাগরণ এনে কুড়ি বৎসরের মধ্যে সমস্ত পরাধীন দেশ ও জাতিকে উপনিবেশবাদের কবল হতে উদ্ধার করেছেন। তিনি হিংস্র পথকে বর্জন করে এবং হিংস্রতার সম্মুখীন হয়েও তাঁর সত্য ও অহিংসার পথ ত্যাগ করেননি। বলকে বর্জন করে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়েও আজীবন সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাই হোক, কি ভারতেই হোক বুবুক্ষু, বোবা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বেদনায় তিনি আজন্ম কষ্ট পেয়েছেন। হরিজনদের উন্নততর জীবনের জন্য কঠোর তপস্যা সুশৃঙ্খল জীবনলাভের জন্য রচনাত্মক ও আত্মিক কর্মের উপাসনা—সমস্ত কিছুর পিছনেই মানুষের জন্য গভীর অনুভূতি হতে উৎসারিত হয়ে পরিচালিত হয়েছিলেন বলেই তিনি অমরতায় পৌঁচেছেন।

ধূলি-বালি, অণুপরমাণুর সংযোজন শক্তিই এ পৃথিবীকে সংযুক্ত রেখেছে আর এ পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র সৌরমণ্ডলে বিধৃত রয়েছে। এ সংযোজন শক্তি যদি না থাকতো তবে সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, সব হাওয়া হয়ে যেতো। সত্যও এ প্রকার এক সংযোজন শক্তি। এ শক্তি যার যত শিথিল সেও তত অস্থির, অশান্ত। জড়বাদী সভ্যতা পরম সত্যকে ধ্যানে আনতে পারে না বলে তার ঈশ্বর গণ্ডীবদ্ধ, ধর্ম সীমাবদ্ধ, সমাজ সঙ্কীর্ণ, রাষ্ট্র প্রলুব্ধ। আর ভারতের সভ্যতা '—ওঁম ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম'—এর ভিত্তিতে রয়েছে বলে 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরান্তি সিন্ধবঃ'—বলতে পেরেছে। আর দ্যুলোক ভূর্লোক অন্তরীক্ষের শান্তি—সর্ব-মানবের শান্তি প্রার্থনা করেছে—সর্বজীবের কল্যাণ চেয়েছে। সত্য নিত্য। বাপু এ নিত্যের সঙ্গী হয়ে জীবন প্রহেলিকার উর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন। নিম্নতর ব্যক্তিসত্বাকে অর্থাৎ অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে উর্ধ্বতর ব্যষ্টিসত্বার কাছে আবেদন করতে গিয়ে তাঁর আত্মবেদন হয়েছিল। আত্মবেদন হতেই আত্মচেতন।

ধর্মের ব্যাপারে বাপু ছিলেন এমন মানুষ যিনি রিচ্যুয়েল বা আচারে বিশ্বাস করতেন না। মুখের কথা মনের ভাবনা, নিত্যদিনের কাজ কর্মের মধ্যেই প্রকৃত ধর্মাধর্মের প্রকাশ আছে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আচারের থেকে আচরণকেই বড় স্থান দিয়েছেন। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন—'আমার জীবনই আমার বাণী।' গান্ধীজি আজীবন তাঁর জীবনদেবতার সঙ্গে বাস করেছেন বলে তাঁর দেহাত্মবোধ ছিল না ; তাই তো বারে বারে উপবাস করে প্রাণের সাথে—রামের সাথে বাস করেছেন। এ উপবাসের কালে মনের কোন কাজ ছিল না, ছিল প্রাণের কাজ। এটা অর্জন করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বিসর্জন সম্ভব হয়েছিল। দধিচীর মত সর্বস্ব দিয়ে দেশকে - মানবতাকে ভরে দিয়ে গিয়েছেন। অজ্ঞানতাকে অতিক্রম করে জ্ঞানের পথে, প্রেমের পথে চলে সত্যকে পেয়ে সকল লোকের ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছেন। গান্ধীজি সর্ব ধর্মের মৌলিক ঐক্য স্বীকার করেছেন। তিনি একাধারে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ এবং অন্য সকল ধর্মেরই মূল সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাতে ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন। জীবনের শেষ স্তরে মানবজাতির হাতে তাঁর সারাজীবনের সঞ্চিত সম্পদ তুলে দিতে গিয়েছেন। এ দেশের পূর্বাচার্যদের পথে এবং বর্তমানকালে ভগবান রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামঠাকুর এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের মতই সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সত্যের সেবক

ধৈর্য ধরেই সত্যের সেবক বা সত্যাগ্রহী হয়। তখনই জন্ম জয় হয়। সত্যাগ্রহী বা সত্যসেবী মানুষের ইতিহাস প্রবাহের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে ফেলে দিয়ে অমরতার স্বাদ গ্রহণ করেন। নদীতে ঢেউয়ের উদয় বিলয় আছে কিন্তু নদী প্রবাহ অবিলয়। ব্যষ্টি মানুষ মৃত্যুর অধীন কিন্তু সমষ্টি মানুষ অমর। ঢেউ বিলীন হয়েও নদীর সাথে মিশে গিয়ে বিলয়ের অতীত হয়। ব্যষ্টির সমষ্টিতে মিশবার চেষ্টাই সত্যাগ্রহ এবং সত্যের আগ্রহের বেগবান অবস্থাতে পৌঁছলে হল—সত্যের সেবক। আর সেই অবস্থাই তো অমরতা। মানুষ মানব অস্তিত্বের প্রবাহমানতা স্বীকার করেই অন্তর্লীন জ্যোতির্ময়তাকে স্বীকার করে সত্যে বা সত্যলোকে পৌঁছতে পারে। 'বহু ধৈর্য ধরি দিবস সর্বরী কাটাতে হবে।' 'আপনার মাঝে আপনার আমি পূর্ণ দেখিব যবে।'

উপনিষদীয় দার্শনিক প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমান শ্বেতকেতুকে তাঁর পিতা যে বিদ্যা জানলে সব জানা যায় তা জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা জানাবার জন্য বললেন। পিতা তখন বললেন, একটু মাটিকে জানলে সব মাটিরই স্বরূপ জানা হয়। ভিন্ন মাটির জিনিষ সব নামে আলাদা কিন্তু মাটি হিসেবে এক। সেরূপ সে যে চরম সত্য তাকে জানলে সব জানা হয়। অন্য সব তার বিকার। এ সৎই জগতের মূল তাকে আশ্রয় করেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। মৌমাছিরা নানা গাছের নানা ফুল থেকে মধু নিয়ে এসে চাকে মধু জমা করে কিন্তু কোন্ ফুলের মধু কোনটুকু তা পরে বলতে পারে না। তেমনি সকলের মূলে যে সৎ তাতে সব বস্তু বিলীন হয়ে গেলে কোনটা সিংহ কোনটা মানুষ তা বলা চলে না। এ জগতে এদের সকলের মূল তিনি, তবে মূল কথা এরা জানে না। এ সকলের মূল সৎ; ইহারই নাম আত্মা। একটা বটের বীজের সূক্ষ্ম বীজ দেখা যায়। সে বীজকে ভাগ করলে আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এ বীজে যে সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু আছে তা হতে বিশাল বটগাছের উৎপত্তি। শ্বেতুকেতু তুমিই সে আত্মা। কিছুটা নুন জলে ফেলে দিলে তা গলে যায়, তারপর জলভাণ্ডের যেখান থেকেই জল নাও না তাতে লবণের স্বাদ পাবে। লবণ যেমন জলের সর্বত্র অদৃশ্যভাবে রয়েছে, সূক্ষ্ম আত্মাও জগতের সর্বত্র তেমনি রয়েছে, আর তুমিও সেই আত্মা।'

বেদের ঋষিরা জল, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করতেন এবং অনুভূতিতে পৃথক দেবতা রূপ পেতো। পরে সর্বত্র ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের অনুভূতি আসে। সে অনুভূতির পরিচয় উপনিষদে মিলেছে। ঐ উপনিষদই জানিয়েছেন জগতের সর্বত্র ভগবান রয়েছেন; চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বিশাল বস্তুতে যেমন তিনি রয়েছেন, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরতম দেশেও তিনি রয়েছেন। এ জগতের মূলই তিনি শুধু নন, জগত তাকে আশ্রয় করে চলেছে। ইহা যখন ধ্বংস হবে তখন আবার উহা তাতেই বিলীন হবে। যে জিনিষ নষ্ট হয় তা তাতেই লয় পায়; জীব বা মানুষ মরে তাতেই আশ্রয় পায়। কিভাবে ভগবান এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তাও এ উপনিষদে রয়েছে। প্রথম আকাশ, পরে বায়ু, এর পর আগুন বা তেজ, তারপর জল এবং সর্বশেষে এ মাটির পৃথিবী। তবে আত্মা সৃষ্টি, উহা ভগবানেরই অংশ।

বেদ-উপনিষদের যুগে দার্শনিকরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষত্রিয় রাজারাও

দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন। পাঞ্চালের রাজা প্রবাহন জৈবলি, কাশীরাজা অজাতশত্রু আর সকলের শ্রেষ্ঠ বিদেহরাজ জনক তার দৃষ্টান্ত। জনকের জন্যই যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক চিন্তা স্ফূর্তি লাভ করেছিল। সে যুগে পরাক্রান্ত রাজারা অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয় যজ্ঞ করতেন। সম্পন্ন ব্রাহ্মণরা নানারকম যজ্ঞ করতেন। সে যুগে দার্শনিক চিন্তার বিকাশও প্রথম এভাবে হয়েছিল। জনক-রাজের সভাতেই বিজয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের পদগৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রশ্ন উপনিষদের পিপ্পলাদ ঋষি শ্রেণীর লোকরা ভারতের আদর্শ দার্শনিক। সেদিনের ঋষিরা দরিদ্রও ছিলেন না, সন্ন্যাসীও ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তার দুই পত্নী—গার্গী ও মৈত্রেয়ী। সত্যকাম জাবালও যেমন বড় দার্শনিক তেমনি ধনীও ছিলেন। তিনি গৃহী ছিলেন, তাঁরও স্ত্রী ছিল। উপনিষদের যুগে দার্শনিকরা বনবাসী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁরা গ্রামবাসী, সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। শেষ বয়সে গৃহী যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীদ্বয়ের কাছ হতে বিদায় নিয়ে বনবাসে চলেছেন, কারণ লোকালয়ে তাঁর সম্পর্ক তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সারাজীবন ভগবানের আলোচনা করেছেন, আর জীবনের শেষ অঙ্কে ব্রহ্মে লীন হতে চেয়েছেন।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পর দার্শনিকদের এ জীবনধারার পরিবর্তন হয়। বুদ্ধদেব যৌবনেই সন্ন্যাসী হয়েছেন এবং আবাল্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়েছেন। মঠের প্রতিষ্ঠাও তখন থেকেই আরম্ভ হয়। সে সময় হতেই হিন্দুরা বিয়ে না করে সন্ন্যাসী হতে লাগলেন। তাঁরা তখন মঠ বা আশ্রমে গেলেন। উপ-নিষদের ঋষিরা যজ্ঞ করতে গিয়ে যজ্ঞের অর্থ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করতে লেগে গেলেন। তখনই দার্শনিকতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। ক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন, আর অশ্রদ্ধা আসতে লাগল এবং যজ্ঞ অনাবশ্যক মনে হল। বুদ্ধের সময় হতেই এ পরিবর্তন এসেছে। বুদ্ধদেবের উপর বাপুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছেন : 'বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির সার নিয়েই বর্তমান হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছে। গৌতম বুদ্ধ হিন্দুধর্মের যে বিপুল সংস্কারসাধন করেছিলেন তাকে বাদ দিয়ে হিন্দুর পক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক ধারা অনুসন্ধান অসম্ভব। তাঁর অসীম আত্মত্যাগ, অতুল বৈভব বিসর্জন, তাঁর জীবনের অকলঙ্ক পবিত্রতায় তিনি হিন্দুধর্মের উপর অনপনেয় ছাপ রেখে গিয়েছেন। হিন্দুধর্ম এক মহান লোকগুরুর প্রতি অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। হিন্দুধর্ম যা গ্রহণ করতে

পারে নি তাহাই আজ বৌদ্ধধর্মরূপে চলছে। সেগুলি বুদ্ধদেব ও উপদেশভিত্তিক নহে'।

মহাত্মা গান্ধী অন্তরে ছিলেন—চির বৈরাগী, সন্ন্যাসী কিন্তু ত্যাগের প্রতীক গৈরিক গ্রহণ করেন নি। তিনি সর্বজীবে সর্বমানবে সত্যকে—ভগবানকে খুঁজছেন। তিনি এ মানবপ্রেমের টানেই এসেছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তিনি মানুষের বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে অন্তরের পরিবর্তনও চেয়েছেন। সেটা ছিল তাঁর আত্মশুদ্ধি। বাপু বলতেন যে মৌন না থাকলে প্রানে বা ভগবানের মৃদু গুঞ্জন শোনা যায় না। তাই মধুকর মধুপানে ডুব দিয়ে বিশ্রাম পায়। জীবনে মধুর সন্ধান না পেলে তো ডানার বিশ্রাম নেই। তাই তো তিনি বলেছেনঃ 'মৌনব্রত সত্যসাধকের অঙ্গ, তা অভিজ্ঞতা হতে শিখেছি। জ্ঞাতসারেই হোক, সত্যের অতিরঞ্জন, গোপন অথবা বিকৃতিসাধনের আগ্রহই মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং তা জয় করবার জন্য মৌনব্রত আবশ্যক। স্বল্পভাষী ব্যক্তি কদাচিৎ তার বাক্যে চিন্তাহীনতার পরিচয় দিবে। সে প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করে বলবে।'

বাইরের জগৎকে মনের মত করে গড়ে তোলা ও অন্তর্লোককে বহির্জগতের মত সাজিয়ে দেওয়ার সাধনাই তিনি করেছেন। এজন্যই তিনি কর্মী শ্রেষ্ঠ হয়েও ধ্যানস্নিগ্ধ মহামানব ছিলেন। তিনি যাঁদের অন্তরে পূজা করতেন কর্মের মধ্য দিয়ে সেবা করতেন জীবনের শেষ অঙ্কে তাদের প্রার্থনা সভায় ডেকে নিয়ে এসে তাদের সাথেই স্রষ্টার নাম গান করতেন। গান্ধীজি বলেছেনঃ 'দেহ রক্ষার জন্য আহার্যের যেমন আবশ্যক, আত্মার জন্যও তেমনি প্রার্থনায় প্রয়োজন। ম্যাকস্থইনি বিনা খাদ্যে সত্তর দিন বেঁচেছিলেন। মানুষও তেমনি বিনা খাদ্যে কিছুদিন বাঁচতে পারেন, কিন্তু ভগবদবিশ্বাসী লোকের পক্ষে বিনা প্রার্থনায় বাঁচা মুহূর্তও সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়'। পীড়িত মানুষের অন্তর্লোককে শুভ্র শান্ত করে তোলবার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু সাধনায় জীবনদেবতার সঙ্গে সজ্ঞ নিঃসঙ্গতারই সাধনা। হিন্দুর ভজন নিঃসঙ্গ সাধকেরই সাধন সঙ্গীত। অবশ্য কীর্তন ব্যবস্থাও আছে। মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী ধর্মে উপাসনার ব্যবস্থা রয়েছে। গান্ধীজি সে মিলিত উপাসনার ব্যবস্থাই এনেছিলেন। তাঁর নিজের সুর ছিল অন্তর্মুখী। বিপুল বিশালের সাথে তিনি মিশে যেতেন তাদেয় প্রেমে, তাদের গানে।

মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন সাধারণের বেশে চলেই অসাধারণ হয়েছিলেন। তাই জীবনের শেষ দিকে মানুষকে উন্নত জীবনে উন্নীত করার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: 'মন্দির মসজিদ অথবা গির্জায়—ভগবানের এ তিন গৃহকে পৃথকভাবে দেখি না। ধর্মবিশ্বাসই এদের রূপদান করেছে। যে কোন ভাবেই হোক এরা মানুষের সেই চির অগোচরের কাছে পৌঁছবার আকুলতার পরিপ্রকাশ'। তিনি আরও বলেছেন, 'মন্দিরের অবস্থিতি আমি অন্যায় বা কুসংস্কার বলে মনে করি না। কোন না কোন প্রকারের সর্বজনীন উপাসনা এবং উপাসনার সাধারণ স্থানের প্রয়োজন মানুষের আছে মনে হয়। মন্দিরে মূর্তি থাকবে কি থাকবে না, তা প্রকৃতি ও রুচির বিষয়। হিন্দু ও রোমান ক্যাথলিকদের উপাসনার স্থানে মূর্তি আছে বলে আমি তা খারাপ অথবা কুসংস্কারপূর্ণ বলে মনে করি না এবং মসজিদ ও প্রটেষ্টাণ্টদের উপাসনার স্থানে মূর্তি নেই বলেই তা ভাল অথবা কুসংস্কারমুক্ত বলেও মনে হয় না। ক্রুশ অথবা গ্রন্থের মত কোন কোন প্রতীক চিহ্ন অনায়াসেই পৌত্তলিকাসূচক, সুতরাং কুসংস্কারপূর্ণ হতে পারে। আবার শিশু কৃষ্ণ অথবা ভার্জিন মেরীর মূর্তি উপাসনা মহান ভাবের উদ্বোধকও এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে। উপাসকের ভাবের উপরই তা নির্ভর করে'।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এক প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজি ভারতবাসীর পক্ষে মূর্তি পূজা (Idolatry) মঙ্গলজনক বললে কবি তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি একে ধর্মান্ধতা মনে করতেন এবং 'ভারতবাসীর পক্ষে মিথ্যার প্রয়োজন আছে ও যদি ভারতবাসীকে মিথ্যা দিয়েই ভোলাতে হয় তা হলে ভারতবাসী স্বরাজের উপযুক্ত নয় প্রমাণিত হয় এবং ইংরেজের প্রভুত্বই তার পক্ষে স্বাভাবিক'—তিনি বলেছেন। এ নিয়ে গান্ধীজি মহাকবির সঙ্গে কোন বিতর্কে যাননি। কিন্তু রূপকে না দেখলে অরূপকে উপলব্ধি হয় না। সাধারণের কাছে অরূপ ধোঁয়াটে হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'ধরবার জন্যই ধর্ম। যার পেটে যা সয়, মা তাই ব্যবস্থা করেছেন—কারও ভাত কারও বার্লি'। বর্তমান যুগের মহাসাধক শ্রীশ্রীরামঠাকুর বলেছেন: "নাম আর রূপ ভিন্ন হইতে পারে না। যেখানে নাম উদয় হয় সেখানেই রূপের উপস্থিত জানিবেন।—মন্ত্রাদির প্রতীক্ষা করে না, ভক্তি প্রেম শ্রদ্ধা হইতেই সেবা কার্য সম্পাদন হইয়া থাকে। ঐশ্বর্যাদির

উপাচারদিগকে প্রয়োজন করে না। গুরুর কৃপা ভিন্ন আনন্দ হৃদয়ে সঞ্চালন হয় না।" গুরু বলতে ইনি ভগবানকেই বুঝেন।

ছেলেবেলায় গান্ধীজি যখন ভূতের ভয় করতেন তখন পরিচারিকা তাঁকে বলেছেন, 'যখন ভূতের ভয় পাবে তখন রাম নাম করবে'। এ রাম নামই কালে তাঁর মানস আকাশকে অধিকার করেছিল। জন্মকালে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাহাই তিনি পরে লাভ করেছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে রায়চন্দ্র ভাইর পরিচয় ছিল। তিনি বিরাট ব্যবসার মালিক হয়েও ছিলেন শুদ্ধজ্ঞানী। গান্ধীজি কোন সঙ্কটে পড়লে রায়চন্দ ভাইর শরণ নিতেন। তিনি গান্ধীজির গুরু ছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে গান্ধীজি বলেছেন—রায়চন্দ ভাই, টলস্টয় ও রাসকিন তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। গীতা তাঁকে পথ দেখিয়েছে আর উপনিষদের আলো তাঁর অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করেছে। বাপুজি বলেছেন: 'আমি যখনই কোন কষ্টে পড়ি, তখনই আমি আমার মাতৃরূপী গীতার শরণ লই এবং এখন পর্যন্ত তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে কখনো অসমর্থ হননি'। তিনি আরও বলেছেন: 'আজ গীতা কেবল আমার বাইবেল বা কোরাণ নয়, উহা তাহা অপেক্ষাও অধিক—ইহা আমার মাতা। এ পৃথিবীতে যে মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাঁকে আমি পূর্বেই হারিয়েছি। কিন্তু আমার এ চিরন্তনী মাতা—গীতা আমার কাছে থেকে মায়ের স্থান পূর্ণ করেছেন।'

মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক আবর্তে কিম্বা সমাজসেবায় বিভোর থাকতেন অথবা নৈতিক ভিত্তির উপর জোর দিতেন তখনও তিনি অসঙ্কোচে বলতেন 'আমার কাছে এহ বাহ্য'। তখনও তিনি ঈশ্বর নিরাকার, নিরঞ্জন বলেছেন; আর বলে চলেছেন সারাদিন রাম নাম করতে হয়। সন্ধ্যা, গায়ত্রী, নমাজের সময় নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু রাম নামের সময় নেই। নাম না করলে বেঁচে কি হবে? রত্নের সন্ধান পেলে মানুষের খাওয়া থাকে না, ঘুম থাকে না, সে দু হাতে রত্ন সংগ্রহ করে। এ রত্ন রাম নাম। এ সত্য নীতিই তাঁর রাজনীতি। তিনি মর্তলোকে মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখেছেন কিন্তু নিজে পৃথিবীর সমস্ত কালিমার ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁকে দেখতে হলে বালুকণাকে না দেখে বালির পাহাড়ে মুক্তাকে খোঁজ করতে হবে। তিনি ছিলেন সাগর—মহাসাগর; সেখানে নদী নালা নর্দমার জল গিয়ে পড়েছে। পুকুর দীঘির পক্ষে যা হজম করা সম্ভব নয়, নদী সমুদ্রের পক্ষে তা হজম করা অতি সহজ। গান্ধীজি আগুনের মত সব

পাপকে ভস্ম করে দিয়ে সেখানে জ্যোতির জন্ম দিয়েছেন। মানুষের আত্ম-কেন্দ্রিকতা বা পশু সত্তার শূন্য স্থানে প্রেমের সত্তাকে বুনে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'If we are to make progress, we must not repeat history, but make new history. We must add to the inheritance left by our ancestars'.

সাধকের আবেদন

ধর্মের মূল সত্য এক। সাধকের সাধনার বিভিন্ন পথ সাধারণের কাছে সেই সত্যকে আলাদা মনে হয়। সাধক তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত মালিন্যকে কঠোর আঘাতে সরিয়ে দিয়ে নিজের চিত্তলোককে করে তোলেন স্বচ্ছ, নির্মল, শুভ্র পবিত্র। সাধারণরা সাধকের চিত্তলোকের এই শুভ্রতার সহিত অপরিচিত। এই অপরিচয়ই সাধক ও সাধারণের সঙ্গে হয় ব্যবধান। এই ব্যবধানের প্রাচীরের আড়ালে থেকে তপস্বীরা আলোর থেকে আলোকলোকে চলে যান এবং সাধারণরা নেমে আসে অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারের দিকে। কালে কালে এই দূরত্ব এত ব্যাপক হয়ে পড়ে যে যাদের কাছে মহাপুরুষদের আহ্বান, আবেদনও করেন, তাঁরাও তাঁদরে মুখস্থ করেই দেখতে চান। মুখস্থ বা অনুকরণের ভিতরে জ্ঞানের সন্ধান নেই, মুক্তিরও সন্ধান নেই। মুক্তি আসে জ্ঞানে, তপস্যায়, সাধনায়। এ অবস্থা সাধক ও সাধারণের পক্ষে প্রীতিপদ নয়।

মহাত্মা গান্ধীর ভারতে আবির্ভাব মানব ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তিনি শত শত বৎসরের পরাধীনতা ক্লিষ্ট একটা জাতির দাসত্ব দূর করে দিয়ে গিয়েছেন—এ ঘটনা বিরাট এবং কালজয়ী সত্য কিন্তু মানবের অন্তর্লোককে শুভ্র এবং মানুষকে মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রোজ্জ্বল করবার জন্য কাজ করে গিয়েছেন, সে ঘটনাও অত্যাশ্চর্য। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা অতীতেও এ দেশের পূর্বাচার্যেরা করে গিয়েছেন। আগামী কালও এ চেষ্টা চলতে থাকবে। কারণ ইহা ভারতের নিজস্ব পথ। কিন্তু গান্ধীজির পূর্বে এমন ব্যাপক ভাবে অন্য কোন সাধককে এ চেষ্টার ক্ষেত্রে চলতে দেখা যায়নি। তার অবশ্য একটা কারণও আছে। আজ পৃথিবী প্রত্যেকের কাছে এত নিকটবর্তী হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে পূর্বে এমনতরো ছিল না। সেদিন এত দূরত্বের পৃথিবীর দিকে দিকে রন্ধ্রে

রন্ধ্রে এমন দুর্গতিও প্রবেশ করেনি। এই দুর্গতিকে রুখে দাঁড়াবার জন্যেই গান্ধীজির এমন বিশাল চেষ্টার আয়োজন হয়েছে। আমাদের সমাজ রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দিকে তাকালে কোন ভরসা আমরা পাইনে। মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা আজ সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কাছে রয়েছে, তা দেখে আমরা শিহরে উঠি।

পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতা আজ সমগ্র মানবজাতির উপর মোড়লী করছে। তাদের কাছে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সমগ্র মানবের কল্যাণের আশা ও দাবী বৃথা, কারণ এরা আত্মস্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না। আত্মোদরপূর্তি ব্যতীত সমগ্রের কল্যাণ এদের কাছে অপরিচিত। তাই এদের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, অনাচার, অবিচার, চক্রান্ত, নিপীড়ন, ভণ্ডামী, শঠতার ভয়াল মূর্তি দেখি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হাতীর শুঁড়, বাঘের থাবা এবং ছুচোর নখের যা ভাল তার সব কিছুর মিলন ঘটেছে মানুষের বাহুতে। জীব প্রভৃতির অদ্ভূত খেয়ালে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ যদি প্রাণীদের সেই সকল অঙ্গের সংমিশ্রণে গঠিত হয় তাহলে তার কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি হতো প্রকৃতি দেবীর এক বিরাট পরিহাস।' ভগবান যখন মানুষকে এমন করে সৃষ্টি করেননি তখন সে মানুষ সামঞ্জস্য করে সমন্বয়ের পথে চলবে এটাই স্রষ্টার বিধান বলে জানতে হবে। আজ মানুষের অন্তরে বাইরে পৃথক জীবন যাপনের ব্যবস্থা মানুষের অন্তরের দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে। একদিন গভীর অনুতাপে আসবে নূতন উপলব্ধি। অজ্ঞতা লজ্জার নয়, জ্ঞান লাভের অনিচ্ছাই লজ্জার। মূর্খের চেয়েও পণ্ডিত মূর্খই বেশী নির্বোধ। তাই কুয়াশা একদিন কেটে যাবে—এ ইঙ্গিতই মিলছে।

গান্ধীজি মনুষ্যত্বের এমন ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আত্মার আলোক-বর্তিকা তুলে ধরেছিলেন। তিনি আজন্ম তিল তিল করে আপন চরিত্র গঠন করেছেন। মিথ্যাকে রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে সত্যকে আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বাক্য ও কর্মের সঙ্গে ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই তাঁর প্রত্যেক বাক্য মানুষের অন্তর্লোককে নাড়া দিয়ে তুলত। কারণ মানুষ শান্ত মনে আপন অন্তরে সেই ভাষা খুঁজে পেত। মিথ্যাকে ধ্বংস করে তিনি যে সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপন চিত্তলোকে, সেই চিত্তলোকে ভেসে উঠত সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির প্রতিচ্ছবি। এই শক্তিই তো চিরসত্য। শুভ্র চিত্তলোকে এ সত্য ভেসে উঠে, আর সেই সত্য যখন প্রকাশলোকে রূপ লয়, তখন মানুষ তার

মধ্যে দেখতে পায় আপন আত্মার বাণী। কিন্তু মিথ্যা ভণ্ডামি নোংরামী মানুষের অন্তরকে করে ফেলে দীন। সেই দীন অন্তর বলিষ্ঠ মন সৃষ্টি করতে অক্ষম। সেই অক্ষম মন সত্যকে দেখেও তাকে অনুসরণ বা ধারণ করতে পারে না।

গান্ধীজি তাঁর উনাশী বৎসরের জীবনে এক বিশাল শক্তি লাভ করেছিলেন, তার মূলে ছিল এ সত্য। তিনি আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেননি। গান্ধীজি মানুষের পরম ভরসা। কারণ তিনি অতি সাধারণ থেকে অতি অসাধারণে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আপন জীবনে শুধু এ সাধনার ক্ষেত্রে বিচরণ করে নিজের ত্রুটিকে দূর করে স্রষ্টার জ্যোতির্ময় লোককে অবারিত করেন। তাই গান্ধীজি ছিলেন দ্রষ্টা। তিনি চয়নকারী নন, তিনি ছিলেন ঋষি। চিত্তলোকে যা ভেসে উঠত তা সমগ্র মানবতার কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি অকুণ্ঠভাবে বলেছেন: 'Evolution is always experiment. All progress has gained through mistakes and their rectification. No good comes fully fashioned out of God's hand, but has to carved out though repeated failures by ourselves. This is the law of individual grown. They save law and controls social and political evolution also.'

গান্ধীজি যে পথের অনুসরণ করেছেন ইহা অনন্তকালের যাত্রীরই পথ। মহামানবরা সেই পথেই বিচরণ করে মানবতাকে আলো দিয়ে প্রসন্ন করেন, শান্ত করেন, তৃপ্তি দেন আর তার মধ্য দিয়ে তাঁরা মানবাত্মার মুক্তির সন্ধান করে কালজয়ী হন। গান্ধীজির এই সাধনার ক্ষেত্র শুধু তাঁর জন্যই রেখে দেননি, অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি এক অভিনব পথে ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে নিঃস্ব নির্যাতিত মানুষের জন্য এক মুক্তিঅস্ত্রের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন; ব্যর্থ মানবতা তাঁর কাছে এক আশার বাণী পেয়ে গিয়েছে। তিনি ভারতের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবাত্মাকে নিষ্কলুষ করবার পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আধুনিককালে তিনি সান্ধ্য প্রার্থনায় যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন, সেটা তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের কর্মযজ্ঞ অপেক্ষাও আরও বিশাল। তিনি মানব অন্তরকে মালিন্যমুক্ত করে নির্মল করবার জন্যই প্রতি সন্ধ্যায় জনতার মাঝে গিয়ে বসেছেন;

জনারণ্যে মানুষরূপী বন্যজীবের বুলেটে তাঁর পার্থিব দেহ তার দেহাধিরাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

ভারতীয় সভ্যতার মূল কথা

যাঁরা ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন আর্যপূর্ব জাতি ও আর্য জাতির সভ্যতার সংমিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যখনই নূতন নূতন ভাব ও প্রেরণা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঢেউ ভারতে এসেছে, মানব জাতির এই যাদুঘর ভারতবর্ষ তা সানন্দে গ্রহণ করে আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্টি দান করেছে। এই প্রকৃতির গতি ও ভাষা। এই পথই অমরার পথ। কারণ মানুষের গোঁড়ামির বা অন্ধত্বের ভিতর জীবনের সন্ধান নেই। তাতে রয়েছে দৃষ্টিহীনতা ; দৃষ্টিহীনতার মাঝে জীবনীশক্তির প্রসারের সুযোগ নেই। কারণ জীবনীশক্তির প্রসার অচলায়তনের মধ্যে তো হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস দেখি যেখানে সে সভ্যতা বাহু বাড়িয়েছে সেখানেই স্থানীয় পুরানো সভ্যতাকে ধ্বংস করে নির্মূল করে তার তৃপ্তি মিটিয়েছে। অনগ্রসর সংস্কৃতি পূর্ণ দেশেই নয় আমেরিকায় সুসভ্য 'মায়া', 'ইঙ্ক' ও 'অস্তেক' সভ্যতাকেও ধ্বংস করেছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে তা ঘটেনি।

আর্যরা আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে ধ্বংস করেনি। এমন কি অসংস্কৃত জাতির ভূতপ্রেত পূজাও ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটা স্থান করে নিয়েছে। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কৃতিলোক গড়ে উঠেছে। কাউকে সে ধ্বংস করেনি। ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ সর্বন্ধর বা বিশ্বন্ধর রূপ এবং 'ঋতম্ভরা' ভারতীয়দের সর্বত্র স্রষ্টার মহিমা দর্শন এবং মহিমা প্রকাশের বোধকে জাগ্রত রেখেছে। ভগবানের সকল প্রকাশকেই সানন্দে গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে যেমন বিধাতার জয়গান গেয়েছে, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে অপৌরুষের এবং অমর করেছে। এই পথেই ভারতীয় পূর্বাচার্যরা —মহাবীর, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ, বসব, রামানন্দ, রবিদাস, কবীর, চৈতন্য, দাদূ প্রভৃতি সাধকরা প্রাচীন যুগে এবং আধুনিককালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, রমণ মহর্ষি, রামঠাকুর প্রভৃতি কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মত ভাবগুরু ও জ্ঞানগুরুরা এই ঐক্যের পথে সমন্বয় সাধনের পথে স্রষ্টার বিভূতিকে স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সাধকরা 'ডোগমা'র সন্ধান

দেননি, কারণ তাতে স্থাণুর কথা আছে, চলমান জীবনের সন্ধান নেই। তাঁরা সর্বত্রই ভগবানের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টিকে এবং সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে দেখেছেন। সেখানে তাঁরা প্রত্যেকের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। 'যত মত তত পথই' স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন প্রদীপের পরিচয় তার শিখায়, মানুষের পরিচয় তার প্রাণে। তাঁরা যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য দেখেছেন, তাকেই প্রণাম জানিয়েছেন।

গান্ধীজি ভারতের এই চিরন্তন ধারাই অনুসরণ করেছেন। সান্ধ্য প্রার্থনায় তিনি বৈদিক স্তোত্রের সঙ্গে কোরাণের বয়াদ, আবেস্তার মন্ত্র, বাইবেলের গান, ত্রিপিটকের শ্লোক আবৃত্তি করেছেন। ইহার ভিতর ভারতীয় আদর্শের দিক হতে বিরোধের ত কোন প্রশ্নই নেই এবং উহাই ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সঙ্গতিই রয়েছে। যাঁরা এতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন, তারা ভারতীয় সংস্কৃতি বা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। উদ্দেশ্য বিস্মৃত শক্তির দুর্দম প্রকাশের নামই ধর্মান্ধতা। এ ধর্মান্ধরা হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও তাঁরা 'ডোগমা' বা ক্রীড বা গোঁড়ামীমূলক ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সনাতন ধর্মের ঋতম্ভরের আদর্শ হতে চ্যুত হয়েছেন। একশ্রেণীর লোক আচার-আচরনকেই ধর্মের চরম পরিণতি বলে জানেন কিন্তু উহা ধর্মানুসরণের হাতে খড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মান্ধতা ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই মৃত্যুর পথ গ্রহণ না করেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে মৃত্যুহীনের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। স্বামিজী বলেছেন: 'যে ধর্মমত তোমার ঈশ্বরানুভূতি লাভে সাহায্য করবে তাকেই স্বাগত জানাবে। কারণ, ভগবদুপলব্ধিই আসল ধর্ম।'

গান্ধীজি কঠোর তপস্যা করে এগিয়ে বলতে পেরেছেন: 'I have never made a fetish or consistency. I am a votary of truth and I must say what I feel and think at a given moment on the question without regard to what I may have said before on it—as my visions get clearer my views must grow clearer with daily practice.'

তিনি জানতেন, সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে এবং কাঁদতে জানে। বৃদ্ধের হাসি এবং যুবকের কান্নায় হৃদয়ের পরিচয় মিলে। এটি মানুষের সব চাইতে বড় গুণ এবং সেই কারণে ভগবানেরও। কারণ নিজের

সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলি তিনি মানুষকেই দিয়েছেন। প্রকৃত রসিকজনের মত ভগবান রহস্যপ্রিয় ও পরিহাসপ্রিয়। এই পরিহাস প্রিয়তা কখনও কিছু কঠিন হলে তাকে হিউমার না বলে অদৃষ্ট বলা হয়। ইহাই চরম রসিকতা। সেখানেই মানুষের চরম পরীক্ষা। যিনি অদৃষ্টের পরিহাসকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত জীবন-রসিক। গান্ধীজি বলেছেনঃ "সঙ্কটে পড়লে ও সঙ্কটমুক্ত হবার জন্য মানুষের উপবাস ও প্রার্থনা করা উচিত।" উপবাস বলতে তিনি ভগবানের সহিত বাস বা তাঁর শরণই বুঝতেন। এ জীবন-রসিক যা দৃষ্ট নয় সে অদৃষ্টের পরিহাসকে হাসিমুখে গ্রহণের সন্ধান পেয়েছেন—নামে-'রামে'। সত্যকে পেয়েছেন তপস্যায়। এ রত্নের সন্ধান পেয়েছেন মহাপুরুষদের তপস্যালব্ধসম্পদে। তাহাই জীবনের শেষদিকে প্রার্থনা সভায় সবাইকে বিলিয়ে গিয়েছেন।

গান্ধীজির প্রার্থনা মন্ত্র

মহাত্মাজি যখন, "যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ—
বেদৈঃ সাংগপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ
ধ্যানাবস্থিতদ্গতেন মনসা-পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ!

বলে সন্ধ্যায় প্রার্থনা মন্ত্র পড়তেন তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে আবার বেরুতো—

আউজো বিল্লাহে মিনশ শৈত্বা নিরর্জীম।
বিস্মিল্লা হির্‌র্হমা নিরহীম॥
অল্ হম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলমীন
অর্‌র্হমা নির্‌র্হীম মালেকেয়ব্ মিদ্দীন।
ইয়াকা ন্ আবুদো বঈয়াকানস্তঈন
এহদেন স্বিরাত্বল্ মুস্তকীম,
সিরাত্বল্লাজীনা অন্ অম্‌তা অলয় হিম্
গয়্রিল মগদূবে অলয় হিম্ বলদ্দ্বাল্লীন্ আমীন্
বিস্মিল্লা হির্‌র্হমা নির্‌র্হীম।
কুল্‌হো বল্লাহো অহ্‌দ্ আল্লাহুস্সমদ্
লময়লিদ বলম্য়ুলদ্ বলম য়কুঁল্লহু
কোফোরন অহদ।

(অর্থ ঃ—আমি পাপাত্মা শয়তান হতে বাঁচবার জন্য পরমাত্মার শরণ নিচ্ছি। হে প্রভু, তোমার নামেই সব কাজ আরম্ভ করি। তুমি দয়ার আধার, তুমি কৃপাময়, তুমি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, তুমিই মালিক। আমি তোমারই আরাধনা করি—তোমারই সাহায্য চাই। শেষ সময়ে তুমিই ন্যায় বিচার করবে। তুমি আমাকে সরল পথ দেখাও। যাঁরা তোমার কৃপাদৃষ্টি পাবার যোগ্য হয়েছেন তাঁদের চলার পথ দেখাও। যারা তোমার অপ্রসন্নতার পাত্র, যারা ভুল পথে চলেছে তাদের পথ আমাকে দেখাবে না। ঈশ্বর এক, তিনি সনাতন, তিনি নিরালম্ব, তিনি জন্মহীন ও অদ্বিতীয়, তিনি সমস্ত সৃষ্টি করেন, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেননি।)

উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কোরাণের এই বয়াদের কোথায় অসঙ্গতি ? আরবী ভাষায় এই বয়াদের ঋষি একে রচনা করেছেন। এতে যদি কারও আপত্তি হয়, তবে তিনি অন্তরকে নির্মল করেননি। তাঁর জন্যে হয়তো অনন্ত ক্ষমা আছে, কিন্তু বিধাতার মন্দিরে স্থান নেই।

গান্ধীজি যখন, "মজদা অত মোই বহিশ্‌তা
স্রবা ওসচা শ্যোননাচা বওচা
তা-তূ বহু মনং-ঘহা
অশাচা ইবুদেম স্তুতো
ক্ষমা কা ক্ষথা অহুরা ফেরষেম্‌
বস্না হইথ্যেম দাও অহুম্‌॥

(অর্থ ঃ—হে হোরমজদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শব্দ এবং কর্মের বিষয় আমার নিকট বর্ণনা কর, যাতে আমি সৎপথে থেকে তোমার মহিমা উচ্চারণ করতে পারি। তুমি যেমন ইচ্ছা আমাকে পরিচালিত কর। আমার জীবন চির নূতন হয়ে থাকুক আমাকে স্বর্গীয় প্রসন্নতা দান কর।)

—জরথুস্ত্রীয় ধর্মের এ মন্ত্রের আবৃত্তির পর খৃষ্টানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন,

Lead, kindly light amid the encircling gloom
Lead Thou me on ;
The night is dark and I am from home,
Lead Thou me on.

তখন কি আমরা সেই উপনিষদের প্রিয় স্তোত্রটির সুর শুনতে পাই না ? কোন মহাপুরুষের কণ্ঠ দিয়ে সুন্দর চিন্তা বা শ্রেষ্ঠ কথা যদি বেরিয়ে আসে, তবে

কি সেটা তাঁর বা তাঁর সম্প্রদায়েরই সম্পদ হয়ে থাকবে? যদি আমরা সেটাকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখি, তবে মানবলোক গণ্ডীবদ্ধ হয়ে যাবে, মানবসভ্যতা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। ঈশ্বরের আরাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানব অন্তর দীন হয়ে পড়বে। পৃথিবীর সৌন্দর্য মাধুর্য, প্রাচুর্য ধ্বংস হয়ে পৃথিবীকে মরুভূমিতে পরিণত করবে। শ্রেষ্ঠ লোকরা দীনাত্মাদের এই দাবীপূরণ করতে পারেন না। মহাত্মাজি যেমন এ দাবী পূরণ করেননি, তাঁর পূর্বগামী লোকগুরুরাও সেই পথ অনুসরণ করেননি। কারণ, সে পথ দেবতার পথ নয়, সে পথ দিতির পথ, দীনের পথ। মহাত্মা গান্ধী ভারতের এই চিরপরিচিত পথেই চলে আর একবার ভারতীয় সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করলেন, ঐশ্বর্যশালী করলেন। ভারতের পূর্বাচার্যরা এই সামঞ্জস্য সাধনের পথেই ভারতকে প্রাণবন্ত করেছেন। গান্ধীজি সে পথেই চলে আর একবার গেয়েছেন :—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সবকো সম্মতি দে ভগবান।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম॥
জয় রাম জয়রাম জয় জয় রাম
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।
সিয় স্বামী কি জয় প্যারে রাঘব কী জয়
বোলো হনুমান কৃপালু কী জয় জয় জয়।
রসুল ঈশা কী জয় জরাথুস্ত্র কী জয়
বোলো জীন মুসা গৌতম কী জয় জয়, জয়।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
সীতারাম রাজারাম ভজরে মনা,
ভজরে মনা, ভজরে মনা, ভজরে মনা।

গোপাল কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ জয় কুঞ্জ বিহারী
মুরলীধর গোবর্দ্ধন ধারী
রামধুন লাগী গোপালধুন লাগী
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রক্ষমাম্,
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্ ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
ভজ মন নিশিদিন প্যারে ।
ভজলে ভজলে সীতারাম
মঙ্গল মুরত সুন্দর শ্যাম
গোপাল গোপাল গোবিন্দ গোপাল
ভজ মন প্যারে রাম রহিম
ভজ মন প্যারে কৃষ্ণ করিম ।

সমন্বয় সাধনের পথ

এই ভজনের পথই ভারতের নিজস্ব পথ। ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেকেই জানেন এই দেশের সাধকরা এই সমন্বয় সাধনের পথেই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগাযোগ করেছেন। সকল ঝঞ্ঝাট হতে মানবসন্তানকে শান্ত রেখেছেন। জগদীশ্বর, রব্বুল আলমীন, লর্ড অব দি য়ুনিভার্স—শব্দগুলির অর্থ এক এবং সে অর্থ ব্যক্তির কাছে ধরা পড়লে তাদের ভাবচ্ছবি ও তৎসংশ্লিষ্ট মানুষের প্রত্যয় মানুষের মনের জন্ম গ্রহণ করে পুষ্ট হয়ে উঠে। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার নিয়ন্ত্রা সম্পর্কে চেতনা প্রখর হয়ে উঠে। ইহাই তপস্যা।

এই ভজনের মধ্যে যে তাল ও সুর চলে, তারই তালে তালে সুরে সুরে অন্তর্লোকে অনুরণন হয়। তাতে অন্তর, মন, বাক্য, কর্ম শান্ত ও সংহত হয়ে আসে। গান্ধীজির সমস্ত জীবন একটা ফুলের মত। তার কোথায়ও অসামঞ্জস্য নেই, সে নিজেই সুসম্পূর্ণ ও সুন্দর। গান্ধীজির চরখার সুতার টানেও তিনি এ তালের এই জপেরই সন্ধান পেয়েছেন। সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখেছেন। এর সঙ্গে

প্রকৃতিরও পরিচয় আছে, যেন সকলেই এই সুরেই একই তারে বাঁধা। গান্ধীজির পূর্বাচার্য—এমন কি এই বাংলায় সত্যপীর জোরালো ভাষায় বলেছেন—কোরাণে পুরাণে ভেদ নেই। আবার সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ অভিন্ন। নানক চৈতন্য এবং আধুনিক যুগে রামঠাকুর এই সমন্বয়ই করেছেন। কবীরও এই সমন্বয়েরই তপস্যা করেছেন। গুহকমিত্র রাম এবং আভীর বন্ধু কৃষ্ণই এ দেশে পরিচিত। বুদ্ধদেব বিষ্ণু অবতার রূপে আজও বিরাজ করছেন! আর্যপূর্ব দেবতা শিব হিন্দুর উপাস্য দেবতা। অনার্য শূদ্রার সন্তানই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং তিনিই সেই অমর বাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

চরণ কৈ মধু বিন্দতি চরণ স্বাদুমু দুস্বরমং
সূর্যস্য পশ্য প্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি॥

চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোক সম্পদ যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

এই দীপ্তির বাণীই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বাণী। উহাও সমন্বয় সাধনের পথে এসেছে এবং এ বাণীই আমাদের ভবিষ্যৎকে পরিচালিত করবে। ইহাই গান্ধীজির আজন্ম সাধনার কথা। ইহাই গান্ধীজির জীবনবাণী। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন ঃ 'There fancy or method in my inconsistensis. In my opinion there is consistency running though my seeming inconsistencies, as in Nature there is unity running though seeming diversity.'

এই বাণীর ভিতরই চলমান জীবনের ঈঙ্গিত রয়েছে। গান্ধীজির সমগ্র জীবনই এই আলোমুখী এবং তারই আলোক লোকে মানবতা আবার শুভ্র হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে আলোর প্রয়োজন রয়েছে। গোঁড়ামিই অন্ধকার, প্রগতি বিরোধীতা স্থাণুত্ব এবং অসত্যাচারই মৃত্যুর সাথী। গান্ধীজি ভারতীয় সাধনায় জীবন ও মৃত্যুর এই পরিচয় পেয়েছেন এবং এই সাধনাই সত্যদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টিতে ভেসে উঠে মানুষকে পুনরায় আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন এ ভারত তীর্থে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে আলো জ্বালিয়ে জাতিকে জ্যোতির সন্ধান দিয়েছেন।

একলা চলোরে

কবিগুরু ও মহাত্মা দুই জনে একই সুরে সর্বভারতীয় সাধনার সাথে সুর মেলাবার জন্য সবাইকে ডাক দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে আগামী যুগের সংহার মূর্তি ধরা দিয়েছিল। তাই তাঁরা হিংসা উন্মত্ত পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সামনে ভারতীয় সাধনা তুলে ধরেছেন।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলোরে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে—
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলোরে' ॥

নব সৃষ্টির আনন্দে মত্ত এ জীবনশিল্পী—বিশ্বপথিক গান্ধীজি তাঁর লক্ষ্যর দিকে ছুটছেন। তাঁর পথের কাঁটাকে উপেক্ষা করে ছুটেছেন মানব মহত্বের প্রকাশের জন্য। রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্গীতে কত গভীর ভাবে গান্ধীজির অন্তর্লোককে টেনেছিল। মহাকবির নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবিও এ মহাসঙ্গীত, মানবাত্মার চরম বিকাশের এ পরম পরিণতি। মানুষ তপস্যার ঊর্ধ্ব স্তরে নিজেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। আলোমুখী জীবনের উপরের দিকে ভীড় নেই। মানুষের সাধারণ পর্য়ায়ে ঠাসাঠাসি। সেখানে চলবার পথ সঙ্কীর্ণ, অতি সঙ্কীর্ণ। হিমালয়ে, মহাসাগরে, আকাশে মহাকাশের নিঃসঙ্গতা এদের জীবনে ওতোপ্রোত। উন্নত মানসের বা মুক্ত লোকের মানুষরা সম্পূর্ণই একা। তাঁদের জীবনে তাঁরা দুর্যোগ মুক্ত নন। ঊর্ধ্বলোকে থেকেও তারা বিপন্ন, কারণ সুখের প্রহরী দুঃখ। এদের ভাষা আলাদা। এ ভাষা মধুর কিন্তু সাধারণ গ্রহণ করতে পারে না। তাঁদের কথা কেউ বুঝে না। লক্ষ তারকাখচিত ছায়াপথের পথিক এ মানুষরা রূপাতিত, বিশ্বাতীগ, নিরুপাধিক, নিস্প্রপঞ্চ সত্বা নন। এরা মনকে ভগবানের মত কঠিনতম সত্য সহ্য করবার মত, শুধু সহ্য নয় ভালবাসার মত তৈরী করে নেন। তাই কোমল-কঠোর প্রেমভক্তির আশ্চর্য প্রকাশ এদের ভেতর দেখা যায়। এজন্যই তো সৎ সাহসী লোকের গরিষ্ঠতা নেই। কোটিতে গুটি মিলে। তাঁদের চলার ভঙ্গী পৃথক, তাঁদের সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হয় না। তাই তাঁদের দেখে আমরা মুগ্ধ হই অভিভূত হই। আত্মীয় বলে জানি কিন্তু

কাছে গিয়েও পৃথক হয়ে পড়ি। এরিক্ত মানুষদের ভরসা দিয়ে তুলসীদাস বলেছেন ঃ

"তুলসী অসময়কে সখা ধৈরজ, ধর্ম বিবেক।
সাহিত্য, সাহস, সত্যব্রত, রাম ভরসা এক॥"

'হে তুলসী, দুঃসময় মানবজীবনে আসবেই। যার জীবনে দুর্দিন আসেনি এমন মানুষ নেই। ধর্ম, ধর্মসাধন, শুভ অশুভ বিচার, সদগ্রন্থপাঠ, সৎসাহস, সত্য-নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি রাম বা ভগবানে নির্ভরতাই বিপদের সহায়।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'দুঃসময় যদি আসে, তাতে কি আসে যায়? ঘড়ির দোলক তার দোলার গতিপথে অন্য কোণে গিয়ে পৌছবেই। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধান হবে দোলকের যদি গতি বন্ধ হয়ে যায়'।

গান্ধীজিকে বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, দরদী কর্মযোগী, মানবপ্রেমী, মহাতপস্বী রূপেই আমরা সাধারণরা জানি, কিন্তু এ পরিচয়ও বাহ্য। মায়ের সাথে রামজীর মন্দিরে গিয়েছেন, এ ছাড়া জেনেছি তিনি রাম নাম করতেন। রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম। মঙ্গল পরশন রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম॥ তিনটি গুলীতে বিদ্ধ হয়েও তিনি বললেন, 'রাম রাম'। সারাজীবন রাম রাম সতরামকেই চেয়েছেন।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহারন মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্॥"

ভগবানকে স্মরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তাঁর পরমগতি হয়। গীতা এ আশ্বাস দিয়েছেন। গান্ধীজি মর্তলোকে তাঁর শেষাবস্থায় সত্যবানের সঙ্গ পেয়েছেন। শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর বলেছেন, 'মাতৃগর্ভে সন্তান এলেই তার দীক্ষা হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান দিয়েই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সে সত্তাকেই শুধু গুরু স্মরণে এনে দেন'। গান্ধীজি সারা জীবন 'রাম' নাম করেছেন। 'রাম' হল রমন, আনন্দ স্বভাব প্রাপ্তি পূজা অর্থাৎ স্বরূপে যাওয়া। বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীতের স্বস্বরূপে যাবার ব্যাকুলতা। ফিরে চলো আপন ঘরের ডাক। এ নামের সাথে মিলন হয়েছিল, ভাব হয়েছিল, যোগ হয়েছিল। তিনি জেনেছিলেন যে, এ নাম ছাড়া ত্রাণ নেই। মহাত্মাজির এ 'রাম' নাম জপতে গিয়ে সব দ্বার খুলে গিয়েছিল ; তিনি নামময় হয়ে গিয়েছিলেন। নামের মালা জপ করলে শ্যামকে—শান্তকে পাওয়া যায়। গো হল সত্য, বিদ্ হল জানা তাই তো গোবিন্দ। তিনি

সত্যকে জেনেছেন। 'হ' কারে শিব, 'র' কারে শক্তি, শিবশক্তির মিলন অর্থাৎ উদয় অস্ত যার নেই। তিনি তো আত্মা, শিক্ষা গুরু ভগবান হরি। মালা অখণ্ডে লয়, অবিচ্ছেদ্য ভাব। বিনা সুতোয় মালা গাঁথলে কেউ ছিঁড়তে পারে না। এ 'রাম' নামই ইন্দ্রিয়ের বেগ সামাল দিয়ে তাঁকে অতীন্দ্রিয়ের অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে ; ইন্দ্রিয়গুলি সে অবস্থায় শান্ত হয়ে যায়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতাই তাঁর স্থির বুদ্ধি, স্থির মন, স্থির ইন্দ্রিয় হয়ে তাঁর কর্মসঙ্গী হয়েছিল। তিনি অহংবোধ হতে মুক্ত হয়ে জীবনকে পরিচালিত করেছিলেন বলে এত বড় বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এ রহস্য না জানা থাকলে তাঁকে জানা যাবে না।

মহাশক্তির সন্ধান

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সেই মহাশক্তিতেই ব্যক্ত। মাতৃ গর্ভে প্রবেশের সঙ্গে হৃদযন্ত্রের কাজ সুরু হয় আর বিরাম হয় প্রাণশক্তির প্রস্থানে। এ ক্রিয়া নামের সঙ্গে অভিন্ন। মন রয়েছে বলেই মানুষ কিন্তু মনতো মান বা পরিমাণ সে সীমাতে বদ্ধ। বুদ্ধি এ মনেরই রকমভেদ। তাই নাম মনের কাজ নয়। সত্যের স্পর্শ প্রাণই বা আত্মাই করেন। নাম যখন সে প্রাণের অনুকূল হয় তখন সে হয়ে পড়ে মঞ্জরী আর বুদ্ধি হয় চিন্ময়। আর সে অবস্থায় প্রাণও থাকে না তা আনন্দময় হয়। শ্রীশ্রীরামঠাকুরই এ কথা বলেছেন। গান্ধীজি এ মহাশক্তিরই সাথে যোগযুক্ত হয়েছিলেন ; তাঁর জীবনব্যাপী সাধনাতে তাই তো ধরা পড়েছে।

গান্ধীজি বলেছেন : 'আমার অগ্রগতির পথে সময় সময় আমি সত্য অর্থাৎ ভগবানের আভাস পেয়েছি এবং প্রতি দিনই আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে, তিনিই একমাত্র সত্য, আর সবকিছুই অসত্য।....আমার আরও বিশ্বাস হয়েছে যে, আমার পক্ষে যা সম্ভব একটি শিশুর পক্ষেও তা সম্ভব। কারণ ভগবানের সান্নিধ্য লাভের উপায় যেমন সহজ তেমনি দুরূহ। আত্মম্ভরী বা অহংবোধসম্পন্ন লোকের কাছে সে উপায় অসাধ্য আর একটি নিষ্পাপ শিশুর কাছে সহজসাধ্য। সত্য সন্ধানীর ধূলিকণা অপেক্ষাও দীন হওয়া আবশ্যক। জগতের লোক পা দিয়ে ধূলিকণাকে দলে যায় কিন্তু সত্যাগ্রহী বা সত্যসন্ধকে এরূপ দীন হতে হবে যাতে ধূলিকণাও তাকে দলে যেতে পারে। কেবল তখনই সত্যের আভাস মিলবে'।

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'আমরা অপূর্ণ জীবরা সব বিষয়ে কল্পনা করতে পারি এবং সে কল্পনার অপূর্ণতা ভগবানে আরোপ করি। আমরা ভগবানের অনুকরণ করতে পারি কিন্তু তিনি কখনো আমাদের অনুকরণ করেন না। কালের দ্বারা তাঁকে খণ্ডিত করে আমরা যেন তাঁকে না দেখি। তাঁর কাছে কাল অনন্ত, আমাদের কাছে কাল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎরূপেই আছে। একশত বছরের মনুষ্যজীবন অনন্তকালের কাছে একটি বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর'।

গান্ধীজির জীবনের মূল সুর এ কথাতে ফুটে উঠেছে। তিনি আমাদের ঋষিদের মতই জেনেছেন মন খণ্ডিত এবং খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে। আর আত্মা বা প্রাণ অখণ্ড। তাই উপনিষদের শিক্ষা পেয়েছেন জীবনে। সে আত্মা মহতো মহীয়ান আবার অনোরনীয়ান্। সে আত্মাকে দেখলে দ্রষ্টার হৃদয় গ্রন্থি বা মন বিনষ্ট হয় ; সর্বসংশয় ছিন্ন হয় ও কর্মক্ষয় হয়। ভগবান বা পরমাত্মা অকল্প বলে কোন কল্পনা করতে নেই, কারণ তাতে নাম বিনাম হয়ে যায়। নামের শক্তি বিলোপ পায়। তাই তো গান্ধীজির কর্তৃত্ব-অভিমান শূন্য হয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত ভার সত্য বা ভগবানের উপর রেখে ভগবানের কাজই করে গিয়েছেন। গান্ধীজি জেনেছেন 'তিনি যেমন ঘটে, তেমনি আকাশে'। 'যো রাম দশরথ কি বেটা, ও হি রাম ঘট ঘটমে লেটা। ও হি রাম জগৎ পশেরা, ও হি রাম সবকে নেয়ারা'। 'আকাশের ন্যায় চিত্ত স্থির করবার চেষ্টাকেই ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ বলে জেনেছেন'। গীতাকে মায়ের মত জেনেছেন, তাই তো গীতার বাণী —'নিত্যঃ সর্বদা একরূপ, সর্বগতঃ—সর্বব্যাপি, স্থাণু স্থিরভাব, অচল—পূর্বরূপ অপরিত্যাগী, সনাতন—অনাদি চিরন্তন। অব্যক্ত—চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত —মনের অবিষয়, অবিকার্য—সর্বপ্রকার বিকার রহিত'—বলেই তো ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। নাম নামী অভিন্ন, নামই ভগবান। তিনি জীবকে আকর্ষণ করেন, উদ্ধার করেন। তাই তো কৃষ্ণ। ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা।

ব্যষ্টি জীবে আছে দেহ, প্রাণ, মন ও প্রজ্ঞা। বিশেষ স্তরের প্রাবল্যে চরিত্রের পার্থক্য ঘটে, কিন্তু পূর্ণ যোগী যুগপৎ দেহে শূদ্র, প্রাণে বৈশ্য, মনে ক্ষত্রিয় এবং প্রজ্ঞায় ব্রাহ্মণ। পূর্ণ যোগী প্রজ্ঞায় বাসুদেব, মনোবলে বলরাম সংকর্ষণ, প্রাণের বলে প্রদ্যুম্ন, দেহের বলে অনিরুদ্ধ, বেদের মন্ত্রে জড়দেহের অধিপতি অগ্নিকে প্রাণের অধিপতি প্রাণবায়ুর কাছে হবি পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। এ প্রাণবায়ুকে ইন্দ্রিয়াধিপতি বা মনপুরুষের কাছে নিবেদন পৌঁছে দিতে

বলা হয়েছে। আর ইন্দ্রের পিছনে আবার প্রজ্ঞাপতি মিত্র বরুণকে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ যোগীরা দেহকে প্রাণের অধীনে ন্যস্ত করাকে সোওপত্তি-যোগ বলেন, প্রাণকে মনের অধীনে ন্যস্ত করাকে সক্কিদাগামী যোগ, মনকে প্রজ্ঞার অধীনে ন্যস্ত করাকে বলেন অনাগামীযোগ, আর প্রজ্ঞাকে সচ্চিদানন্দের অধীনস্থ করাকে বলেন অর্হৎযোগ। এটি হলেই নির্বাণ ব্রহ্মবিহার। ইসলামী যোগে দেহের ক্ষেত্রে বলা হয় নাচ্ছুৎ, প্রাণের ক্ষেত্রে বলা হয়—লান্যুৎ, মনের ক্ষেত্রে বলা হয় জবরুৎ, প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বলা হয় মালকুৎ। এইটি হলেই ঈশ্বরের সঙ্গে তৌহিদ হাউৎ যোগ।

গান্ধীজি অনাসক্ত হয়ে কাজ করেছিলেন। আসক্তি নিয়ে ধর্ম করলে তো তিনি ধর্ম বণিক। সে অবস্থায় ধর্ম পণ্যদ্রব্য হয়ে যায়। সে হীন হয়ে পড়ে বলে যুধিষ্ঠিরের সেই বিখ্যাত উক্তিতেই রয়েছে। তাই গান্ধীজি আসক্তিহীন ভাবে প্রার্থনা করবার জন্য আবেদন করতেন এবং আজীবন পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের পথের সন্ধান করে গিয়েছেন। গান্ধীজির এ রূপই সত্যিকারের রূপ। মানুষের সেবা করতে গিয়েই তিনি রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক নেতা। তাইতো গান্ধীজি বলতে পেরেছিলেন 'সত্যের জন্য আমি দেশের স্বাধীনতার দাবীকে ত্যাগ করতে পারি।' আবার গান্ধীজিই বলেছেন : 'সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' তিনি আরও বলেছেন : 'সত্য ও অহিংসা আমার দুটি হৃৎপিণ্ড। আমি এ ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমি প্রতিক্ষণেই স্বচ্ছতরভাবে অহিংসার অপরিমেয় শক্তি ও মানুষের সঙ্কীর্ণতা দেখছি। অপরিসীম অনুকম্পা সত্ত্বেও অরণ্যবাসী মানুষও সম্পূর্ণভাবে হিংসামুক্ত হতে পাচ্ছেন না। প্রতি নিঃশ্বাসেই কিছু হিংসা করছেন, এ দেহই একটি হত্যাগৃহ, মোক্ষ ও স্বর্গীয় শান্তিও দেহমুক্ত না হলে হচ্ছে না। এ জন্যই মোক্ষ ব্যতিত সমস্ত আনন্দই অনিত্য ও অসম্পূর্ণ।' রোগ যন্ত্রণায় কাতর বাছুরের বেদনায় বাপু শুধু কাতর নন, তাকে ইনজেকসন দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলেন। এ বোধ নিষ্ঠুর মনে হতে পারে কিন্তু তলিয়ে দেখলে গভীর অনুকম্পার পরিচয় মিলে। হিংসা অহিংসার বিচারও সেদিক হতে যথায় বাহান্ন, তথায় তেপান্নের মত হয়ে দোষমুক্ত হয়।

গান্ধীজি গীতাকে মায়ের মত জেনেছেন। গীতা মানুষের ধর্ম, মানুষের আদর্শ ও জাতির চরম উত্তরণের পথে দেবজীবন লাভের পথ দেখিয়েছে। দিব্য

জীবন লাভ করে কর্ম ও কর্মী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। গীতা এ পথে পৌঁছবার জন্য ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে, লাভালাভ জয়পরাজয় সমান জ্ঞান করে, ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হিসাবে সব কর্ম করবার জন্য বলেছেন। তারপর শুধু ফল অধিকার নয়, কর্ম অধিকারও ত্যাগ করতে হবে। আত্মা সকল অবস্থায় অচল, অক্ষয়, নিষ্ক্রিয় ; সংসারে যা হচ্ছে তা প্রকৃতির কাজ।

আত্মবেদন

মানুষ নিজকে কর্তা মনে করে ও সে সব কিছুই করছে ভাবে। কিন্তু ইহা অজ্ঞান, অহঙ্কার ; বস্তুতঃ আত্মা বা পুরুষ কিছুই করেন না, তিনি স্রষ্টা, উদাসীন, প্রকৃতির গুণেই সব কর্ম চলছে। এ জ্ঞানলাভ করে অহঙ্কার হতে মুক্ত হতে হবে, এটাই অকর্তা ভাব। ইহাই জ্ঞানযোগ। এখানে পৌঁছে ভগবানের জন্য সব কর্ম করা হচ্ছে বলে বোধিতে আনতে হবে। সে অবস্থায় কর্মযোগীর আর অহঙ্কার থাকে না। তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকৃতি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। ভগবান সর্বত্র সম প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে বিলাস করে থাকেন। গুণের আবর্তেই সুখ দুঃখ আসে। এখানেই আত্মবেদন। তখনই তিনি আত্মজ্ঞ। তাঁর মন প্রাণে লয় হয়েছে। সুখ দুঃখ একই আত্মার স্বরূপ। তখন তিনি নিত্যের সঙ্গী। আত্মবেত্তার হৃদয় গ্রন্থি শূন্য বলে মুক্ত। কর্মযোগী গান্ধীজি জ্ঞানযোগের এ স্তরে পৌঁছে চলেছেন এবং তাঁর সে চলার বিরাম চক্রের বাইরে।

শেষ স্তরে পৌঁছে দেখা গেল এ প্রকৃতিও স্বতন্ত্র নয়। তিনিও পুরুষোত্তম ভগবানেরই প্রকৃতি। তিনি পুরুষোত্তমেরই অংশ। সে অবস্থা শরণাগত অবস্থা। বিবর্তনের পথে ভূ থেকে ভূমায়, ভূ থেকে সত্যে তাঁর স্থিতি। পুরুষোত্তম বা সত্যের মতই মুক্ত। তাঁর সাথে মিশে যে কর্মের স্বাদ—নিত্য লীলার আস্বাদ, তাই তো গীতার ভক্তিযোগ। সেখানে পৌঁছেই তো গান্ধীজি পেয়েছেন :

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যমি মাশুচঃ॥

প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের একটু পূর্বে গান্ধীজি 'অনাসক্তি যোগ'

নাম দিয়ে গীতা ভাষ্য ও গীতার অনুবাদ করে যান, সেখানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবানের সত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর শরণাগতকে এ অভয় দিয়েছেন। এই শরণাগত যে গান্ধীজি তা আপন জীবনে আর লুকানো নেই। আজীবন তিনি 'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়'—আমাকে অসত্য হতে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যাও, এ প্রার্থনা করেছেন। 'আল্লাহ ও আলিয়ুও ল্লাজীনা আমানু ইয়ুখার জুহম্ মিনা জুলুমাতে এলান্নুরে'—যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে তিনি তাঁদের রক্ষক, তিনি তাঁদের অন্ধকার হতে জ্যোতিতে নিয়ে যান—এ আশ্বাস পেয়েছেন। এই জ্যোতির দেবতাকে নমস্কার।

ঋষি বঙ্কিমের 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে'—সৎকোটি, চিৎকোটি, আনন্দকোটি, প্রজ্ঞানকোটি, মনোময়কোটি, প্রাণময়কোটি এবং অন্নময় জড়কোটি—এ সপ্তকোটি—সপ্তলোক—সাতটি স্তরের মধ্য দিয়ে এই নিবর্তন ও বিবর্তনের পর্ব চলছে। এই সপ্তকোটিতে মহাশক্তির করাল কণ্ঠ নিনাদিত। 'দ্বিসপ্তকোটি ভূজৈ ধৃত খর করবালে'—এতো বিবর্তন, আমাদের মধ্যে নিবর্তিত সেই মহাশক্তি আবার তার দুই ভুজের খর খড়্গে নীচের সীমাবদ্ধতা ছিন্ন করে একে একে সপ্তকোটিতে উত্তীর্ণ হতে চলেছেন। সেখানেই তো শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তম, অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষ। ইসলামী ভাষায় তারা বয়তল মকমুর, বয়তল মুহরম এবং বয়তল মুকদ্দস। যিশুর ভাষায় হোলিঘোষ্ট অথবা পবিত্র আত্মা, গর্ডাদি ফাদার কিম্বা স্বর্গস্থ পিতা, গর্ডদিমান বা অমৃতের পুত্র জীব।

এ নিবর্তন ও বিবর্তনের পথে গান্ধীর সত্যলোক উত্তরণ। তাই তাঁকে প্রণাম। আমরা দেখেছি—নিবর্তন ও বিবর্তনের এই পথেই চতুর্দশ ভুবনের অতিক্রমণ। আরও দেখলাম সে শক্তি—'মা যা ছিলেন', নিবর্তনে—'মা যা হয়েছেন', আবার স্বস্বরূপে বিবর্তনে—'মা যা হবেন'। প্রত্যক্ষ করলাম—ঈশ্বর, জগৎ, জীব—বিশ্বাতীত, বিশ্ব ও ব্যক্তি—স্বরাট, সমষ্টি ও ব্যষ্টি। পেলাম মাতৃ-এষণায় মুগ্ধ মহাত্মাকে। উন্নততর মানুষ সৃষ্টিই গান্ধীজির চিন্তায় চর্যায় দেখেছিলাম। মানুষের জন্য কি গভীর প্রেম। তাই 'হরিজন' হয়েছেন। সর্বজীবের প্রেমে মুগ্ধ গান্ধী, অহিংসবাদী আর সত্যাশ্রয়ী বা সত্যাগ্রহী—সত্যনারায়ণকে সত্যপীরকে পেয়েছেন। সত্য লোকের পথ দেখেছেন, তাই তো মহাত্মাজি মানবতাবাদের সুরে সুবাসিত মহামানব।